প্রিয়নবী

হযরত মুহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

আল্লামা ডঃ মুহাম্মদ ইনায়েতুল্লা সুবহানী

বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স

প্রিয়নবী

হযরত মুহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

আল্লামা ডঃ মুহাম্মদ ইনায়েতুল্লা সুবহানী

অনুবাদ

মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস

পরিবেশনায়

বাগদাদ লাইব্রেরী

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা

কে

উপহার দিলাম
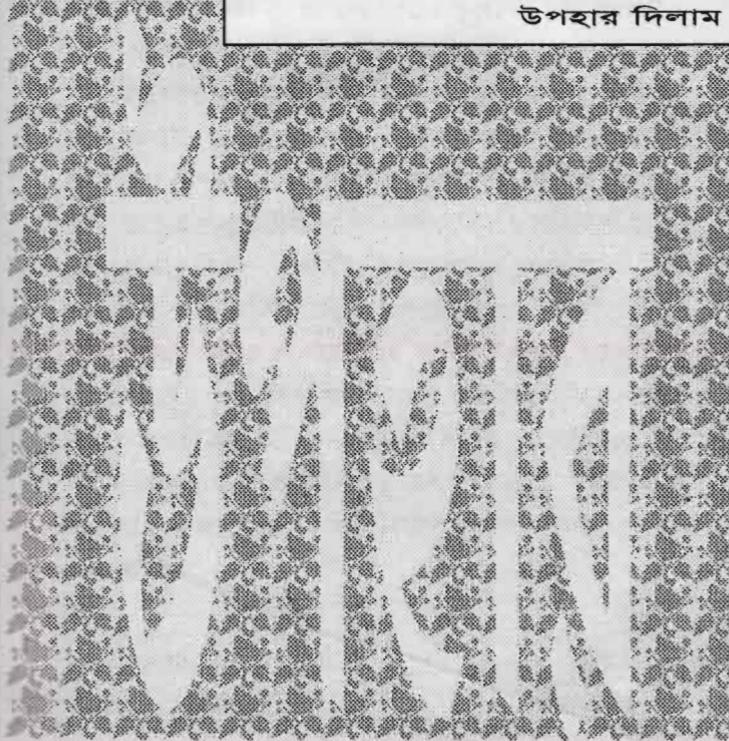
উৎসর্গ

প্রিয়নবী হযরত মুহম্মদ মুস্তাফা সৃষ্টি-শ্রেষ্ঠ-নবী।
নবীকুল-শিরোমণি-নবীকুল চূড়ামণি ত্রিভুবনে যিনি।।
নামাঙ্কিত গ্রন্থখানি উৎসর্গিত করিলাম মাতৃপিতৃজনে।
অহিদা খাতুন মাতা তছিমউদ্দীন পিতা; জনক-জননী।।
তাদের উদ্দেশে পুত্র শ্রদ্ধাঅবনতচিতে দীন-অতি-দীন।
উৎসর্গিত করে গ্রন্থ সুপরম শ্রদ্ধাভরে জালালউদ্দীন।।

প্রকাশকের নিবেদন

আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে মিসরের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ প্রিয়নবী হযরত মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আরবি ভাষায় চৌদ্দ খণ্ডের একখানি 'জীবনী বিশ্বকোষ' প্রকাশ করেন। এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ঐ বিভাগের মহানির্দেশক মুহম্মদ আহমদ বরানিক। এই বিশ্বকোষের অন্যতম সম্পাদক ভারতীয় আলেম মুহম্মদ আব্দুল হাই সাহেবের একান্ত আগ্রহে এ গ্রন্থটির উর্দূ অনুবাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন ভারতের অন্য একজন বিখ্যাত আলেম আল্লামা ডক্টর মুহম্মদ ইনায়েতুল্লাহ সুবহানী। ডক্টর সুবহানী এ কাজ সম্পন্ন করার পর ঐ চৌদ্দ খণ্ডের সীরাত-গ্রন্থ অবলম্বনে উর্দূভাষায় অতি সংক্ষেপে চৌদ্দটি অধ্যায়ে "মুহম্মদে আরাবী (সাঃ)" নামে রচনা করেন বর্তমান গ্রন্থটি। এ গ্রন্থটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং দেশ-বিদেশের একাধিক ভাষায় তার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। উভয় বঙ্গে সুপরিচিত খ্যাতিমান সাংবাদিক ও সাহিত্যিক মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ সম্পন্ন করেন এবং তা সাথে সাথে ঢাকার একটি প্রখ্যাত বাংলা দৈনিক পত্রিকার ইসলামী সাময়িকীতে তা বৎসরাধিক কাল ধরে প্রকাশ করেন। এই মহান গ্রন্থটি আমারও মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং আমি তা প্রকাশ করতে আগ্রহী হয়ে উঠি। অনুবাদকের সার্বিক সহযোগিতায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে তা প্রকাশ করাও সম্ভব হল। গ্রন্থটি পাঠক সমাজে সমাদৃত হলে আমাদের সামগ্রিক উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে বলে মনে করি।

বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০ বিনীত
নভেম্বর—১৯৯৯ প্রকাশক

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

ভূমিকা

এক.

ইসলামের মহান নবী হযরত মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব শুধু ইসলামের ইতিহাসে নয়; সমগ্র মানবজাতি ও মানব সভ্যতার ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই জগতের বুকে আসমানী কিতাব আগমনের ধারা যেমন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তেমনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর তরফ হতে নবী ও রসূল প্রেরণের ধারা একেবারেই সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর আগমনের পরে পৃথিবীতে আর কোন ধর্মগ্রন্থ আসবে না; তাঁর আগমনের পরে পৃথিবীতে আর কোন কালেও আর কোন নবী-রসূল প্রেরিত হবেন না। সেজন্য তিনি আখেরি নবী, সেজন্য তিনি শেষ নবী। আর তাঁর উপর অবতীর্ণ মহাগ্রন্থ কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব। তাই সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উপর অবতীর্ণ মহাগ্রন্থ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তাঁর সমমর্যাদার নবী ও রসূল যেমন পৃথিবীতে অতীতেও আসেননি, তেমনি পরেও আসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আর সন্দেহ নেই যে, পবিত্র কুরআনের সমকক্ষ মহাগ্রন্থ পৃথিবীতে অতীতেও আসেনি, পরেও আসবে না; আসার প্রশ্নই ওঠে না। কেননা, তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে জগতে নবুয়ত ও রিসালতের ধারা একেবারেই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তাই তাঁর পরে আর কোনো নবীরও প্রশ্ন ওঠে না তেমনি নতুন কোনো ধর্ম বা ধর্মমতেরও প্রশ্ন ওঠে না। তাঁর বাইরে নবুয়ত ও রিসালতের দাবি কেউই করতে পারে না। যদি কেউ করে, সে ইসলাম থেকে খারিজ, বিপথগামী, সর্বধ্বংসী, অভিশপ্ত, মুরতাদ। তার সঙ্গে ইসলাম ও মুসলমানের কোন সম্পর্ক নেই– থাকতে পারে না। ইসলামের নবী সেই মহান নবী, যাঁর আগমনে শুধু নবুয়ত আর রিসালতের ধারাই সম্পূর্ণ হয়নি, তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই জগতে যুগে যুগে যত ধর্মগ্রন্থ এসেছে, সেসব ধর্মগ্রন্থে মহানবী মুহম্মদের (সাঃ) নাম পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে; এবং যে মহানবীর আগমনের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল– অর্থাৎ যুগ-যুগান্তব্যাপী মানুষ যে মহানবীর আগমনের প্রতীক্ষায় দিন অতিবাহিত করেছে, মহানবীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সেই প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে। যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষ যে জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, মণীষা, মেধা ও মুক্তির সাধনা করে এসেছে, মহানবীতে এসে তা পূর্ণতা লাভ করেছে। মানুষের যুগ-যুগান্তের ন্যায়, সততা, পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা, মনুষ্যত্ব তথা মানবীয় গুণাবলীর সামগ্রিক সাধনা তাঁর মধ্যে এসে পূর্ণতা লাভ করেছিল। মনুষ্যত্ব, মানবতা তথা মানবীয় উৎকর্ষতা যে কত উচ্চ, কত শ্রেষ্ঠ, কত সুন্দর ও কত মহৎ হতে পারে, তার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত তিনিই। তাঁর জীবন ও সাধনার মধ্যে বিধৃত, প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বিত হয়েছে মানুষের যুগ-যুগান্তের মনুষ্যত্বের সাধনা।

আরবি ভাষায় আল-ইনসান আল-কামিল বলে একটা কথা আছে– ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'Full man' বা বাংলায় যাকে বলা যায় 'পূর্ণ মানব'; সেই 'পূর্ণ মানব' হলেন

মহানবী মুহম্মদ মুস্তফা (সাঃ)। যার মধ্যে মনুষ্যত্বের যুগ-যুগান্তের সাধনা পূর্ণতা লাভ করেছিল।

নিজের জীবন ও সাধনার বলে তিনি হয়েছিলেন শ্রেষ্ঠতম মানব। পারিবারিক জীবনে তিনি হয়েছিলেন জীবনসঙ্গিনীদের কাছে শ্রেষ্ঠতম স্বামী, সন্তানদের কাছে হয়েছিলেন শ্রেষ্ঠতম পিতা ও অভিভাবক। পারিবারিক জীবনের বাইরে তিনি হয়েছিলেন চিরসত্যের অনুসারী, ন্যায়, সুন্দর, সত্য ও পবিত্রতার প্রতীক 'আল-আমীন' বা মহান সত্যবাদী। এর বাইরে তাঁর অনুচরদের কাছে তিনি হয়েছেন শ্রেষ্ঠতম বন্ধু, শ্রেষ্ঠতম নেতা, শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক, শ্রেষ্ঠতম পথ-প্রদর্শক। পাপী-তাপী, দীন-দরিদ্র, হতভাগা-ইয়াতিম তথা সমাজের পতিত মানুষদের জন্যে তিনি হয়েছেন চরম ও পরমতম আশ্রয়স্থল। সমরক্ষেত্রে হয়েছেন শ্রেষ্ঠতম সমর নায়ক, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে হয়েছেন শ্রেষ্ঠতম রাষ্ট্রনায়ক। কূটনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ কূটনীতিক ও সারা বিশ্বের একচ্ছত্র নেতৃত্ব দেয়ার মতো সুযোগ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।

আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাঁর যে অবদান তা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। তাঁর অতীতের আহলে কিতাবের নবী-রসূলদের আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনা ও আধ্যাত্মিক-সাধনার ধারা তাঁর মধ্যে এসে পূর্ণতা লাভ করেছিল। ইহকাল ও পরকালের মধ্যে স্বচ্ছ ও সুন্দর আধ্যাত্মিক যোগসূত্র তিনিই স্থাপন করেছিলেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি একান্ত নির্ভরশীলতা, তাঁর মধ্যে বিলীন হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা তিনিই করে গিয়েছেন। তাঁর সামগ্রিক চিন্তা-চেতনাজাত আধ্যাত্মিক সাধনা পূর্ণতা লাভ করেছিল তাঁর 'মীরাজ' গমনের মধ্য দিয়ে। স্বয়ং খোদাতালার সান্নিধ্যে-'ধনুকের জ্যা' পরিমাণ দূরত্বে অবস্থানের মধ্য দিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথন– এসব প্রমাণ করে যে, তাঁর সীমাহীন সাধনা সার্বিক উৎকর্ষতার কতটা উচ্চস্তরে তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, তিনি সকল যুগের, সকল কালের সকল মানুষের জন্যে কত বড় দৃষ্টান্ত, কত বড় আদর্শ আর কত উচ্চ তাঁর ব্যক্তিত্ব। এই গুণ ও ব্যক্তিত্ব লাভের ফলেই তিনি সকল যুগের সকল কালের মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক আদর্শে পরিণত হয়েছেন। আর এর দ্বারা বোঝা যায় যে, তাঁর আগমনের পূর্বেকার ধর্মগ্রন্থগুলোতে তাঁর নামটি গভীর তৃপ্তি ও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে কেন বারবার উচ্চারিত হয়েছে।

এই উৎকর্ষতার কারণেই তিনি হয়েছেন সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যেকার এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র। আধ্যাত্মিক সাধনার বলে পারলৌকিক জগতের সূক্ষ্ম খবরাখবর তাঁর পক্ষে সন্দেহাতীতভাবে জানা তাই সম্ভব হয়েছে। আর মানবীয় ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের চূড়ান্ত শিখরে উন্নীত হয়েছিলেন বলেই হাশর ময়দানে তিনি হবেন সমস্ত নবীদের নেতা। আর তিনিই হবেন আল্লাহর দরবারে সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান সুপারিশকারী। সেই মহামানবের প্রশংসা-কীর্তন করে শেষ করা যায় না। তাঁর সামগ্রিক উৎকর্ষতার পরিচয় কোনদিনও লিখে শেষ করা যাবে না। কাল কিয়ামত পর্যন্ত যুগ-যুগান্তের মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হবে তাঁর প্রশংসাবাণী। সেই মহামানবের প্রতি লক্ষ কোটি দুরূদ, লক্ষ কোটি সালাম।

দুই.

বিশ্বধর্ম ইসলামের সর্বশেষ সংস্কারক ও প্রচারক মহানবী মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ। তিনি সকল কালের, সকল যুগের; এক কথায়, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। এ শুধু তত্ত্ব বা বিশ্বাসের কথা নয়, তা যুক্তি-তর্ক-তত্ত্ব-তথ্যসমৃদ্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য। এ সত্য শুধু বিশ্বাসের নয়; তা যুগ-যুগান্তের গবেষণালব্ধ সত্যদর্শী সত্য তত্ত্ব। বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনার দাবি রাখে।

প্রথমেই আসা যাক 'ত্রিকালদর্শী' প্রশ্নে। এই ত্রিকাল কী, তা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। এক কথায়– অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত– এই হল তিনকাল, বা ত্রিকাল; আর এই তিনকাল বা ত্রিকাল যিনি দর্শন করেছেন– তিনি ত্রিকালদর্শী। মহানবী মুহম্মদ (সাঃ) এই তিনকালই দর্শন করেছেন। তাই তিনি ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ। মহানবী মুহম্মদ (সাঃ) তার আবির্ভাবের পূর্বেও তাঁর অতীতকে দেখেছিলেন– শুধু তাই নয়, তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে অতীতকালের সত্যপন্থী, সত্যদর্শী ও সত্যানুসন্ধানীদের তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। তাই দেখা যায়, তাঁর সশরীরে পৃথিবীর্তে আগমনের বহুকাল পূর্বে যেসব ধর্মগ্রন্থ পৃথিবীতে এসেছে এবং যারা সেসব সত্যধর্মের প্রচারক ছিলেন, তাঁরা তাঁদের গভীর আধ্যাত্মিক চেতনায় মহানবীর (সাঃ) অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সে পবিত্র নাম মুখে তাঁরা উচ্চারণ করেছেন, সে নামে তাঁরা ইহ ও পরকালে মুক্তির সন্ধান পেয়েছেন। মহান নবী মূসা (আঃ) এবং ঈসা (আঃ)ও তাঁর সে পবিত্র মধুনামে আবেগাপ্লুত হয়ে সে নামে মুক্তির মন্ত্র খুঁজেছেন, সর্বোপরি, তাঁর উম্মতের মর্যাদা পেতে চেয়েছেন। তাওরাত এবং ইঞ্জিলে সে পবিত্র নাম অতীব শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে এবং তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর আরো বিভিন্ন প্রান্তে প্রচারিত ধর্মগ্রন্থগুলোতে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে সে পবিত্র নাম। মহানবী মুহম্মদের (সাঃ) পৃথিবীতে সশরীরে আগমনের বহুকাল পূর্বে ভারত-উপমহাদেশে প্রচারিত ধর্মগ্রন্থাবলীতে— যেমন বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, দীঘা নিকায়া, ত্রিপিটক এমন কি চীনের কনফুৎসিয়ে, ইরানের জুরথুস্ত্র প্রমুখ মহাপুরুষদের প্রচারিত ধর্মগ্রন্থাবলীতে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হয়েছে সে পবিত্র নাম। সে সকল মহাপুরুষেরা সে পবিত্র নামে ইহকালে যেমনি তেমনি নিজেরা মুক্তি চেয়েছেন, মানব জাতিকেও মুক্তির বাণী শুনিয়েছেন। সে হিসেবে বলা চলে যে, তিনি তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেরও শ্রেষ্ঠ মহামানব। সে নামের সঙ্গে মিলিয়ে পবিত্র কলেমা পাঠ করে আদি মানব আদম (আঃ) যেমন মুক্তি পেয়েছেন, তেমনি সে পবিত্র নাম উচ্চারণ করে আরো বহু নবী রসূল ইহ-পরকালে চেয়েছেন মুক্তি। সে হিসেবে তিনি তাঁর আবির্ভাব-পূর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব—মহানবী, বিশ্বনবী।

তারপর, সব নবীদের শেষে আবির্ভূত হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, সৃষ্টিশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ প্রতিশ্রুত-পয়গাম্বর মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইয়ে ওয়াসাল্লাম। তাঁর জীবনচরিত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষ যে সত্যের সন্ধান করেছে, মানুষ যে জ্ঞান সাধনা করেছে, সর্বোপরি, যুগ-যুগান্তের মানুষের সত্য-সাধনা, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, মনীষা, মেধা, প্রজ্ঞা– এক কথায় মানবতা ও মনুষ্যত্বের যুগ-যুগান্তের

সাধনা তাঁর মধ্যে এসে পূর্ণতা ও সিদ্ধি লাভ করেছিল। তাই দেখা যায়, অতীতকালের ন্যায় তাঁর সমকালও সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছিল; সমগ্র আরব-আজম লুটিয়ে পড়েছিল তাঁর পায়ে। তাঁর পরিপূর্ণ বিকশিত ব্যক্তিত্বের প্রথম স্বীকৃতি এসেছিল 'হেরা' গুহায় আসমান হতে জিব্রাঈল মারফত প্রথম 'ওহী' অবতরণের মধ্য দিয়ে। চল্লিশ বছর বয়সে যে পরিপূর্ণ ও বিকশিত ব্যক্তিত্বের ওপর জগতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের প্রথম আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল, পর্যায়ক্রমে পরবর্তী তেইশ বছর যাবত তার ধারা অব্যাহত থাকে এবং তাঁর দ্বীন পূর্ণতা লাভ করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ পবিত্র কুরআনকে পরিপূর্ণরূপে ধারণ করার মতো জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ব্যক্তিত্ব তাঁকে দান করেছিলেন। সেই কুরআনী প্রজ্ঞার মাধ্যমে তিনি দেখেছিলেন তাঁর আবির্ভাবপূর্ব অতীত, সশরীরে বিচরণাধীন বর্তমান ও লোকোত্তর ভবিষ্যত। যে ভবিষ্যতের ধারা তার সমকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। অর্থাৎ তিনি অতীত, বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যতের দ্রষ্টা– অনন্ত কালের নবী– পথ-প্রদর্শক। এ দৃষ্টিশক্তি তাঁর কুরআনী প্রজ্ঞার অংশ; আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে তা তাঁকে একান্তভাবে দান করেছিলেন। এসব বিবেচনায় তিনি ত্রিকালদর্শী, প্রাজ্ঞ, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব।

তিন.

বাস্তবিকই মহানবী মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব মানবজাতি ও মানব সভ্যতার ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। তাঁর আবির্ভাবে নবুয়ত ও রিসালতের ধারা একদিকে যেমন পূর্ণতা লাভ করেছিল, তেমনি মানুষের যুগ-যুগান্তের সত্য সাধনার ধারা পূর্ণতা লাভ করেছিল। একদিকে যেমন মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্ব পরিপূর্ণরূপে বিঘোষিত হয়েছিল, তেমনি মানুষের যুগ-যুগান্তের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তাঁর মধ্যে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছিল।

মানবজীবনের এমন কোনো দিক নেই, যা তাঁকে স্পর্শ করেনি; এমন কোন অনুভূতি নেই যা তিনি অনুভব করেননি। কি ব্যবহারিক, কি আধ্যাত্মিক, কি ইহলৌকিক, কি পারলৌকিক সমস্ত কিছুই তাঁর জীবন ও সাধনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল। তাঁর উপরে অবতীর্ণ হয়েছিল যে মহাপবিত্র কুরআন, তা সকল কালের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। জগতের সকল কালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কুরআন। তিনি ছিলেন সেই কুরআনের প্রতিবিম্ব আর তাঁর জীবন ছিল কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ তরজমা ও তাফসীর। তাঁর বাণী পবিত্র কুরআনেরই চিরবিকশিত অর্থ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা। জীবন ও জগতের সমস্ত দিককেই তা আলোকিত করেছিল। পবিত্র কুরআনের পরেই তাঁর বাণী তাই জগতের সকল কালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণীরূপে অজর-অমর- অব্যয়–অক্ষয় হয়ে আছে। মাত্র তেষট্টি বছরের আয়ুষ্কালের মধ্যে তিনি জীবন ও জগতের সকল ক্ষেত্রে যে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করে গিয়েছেন, তা চিরকালের বিস্ময়। বিস্ময়াবিভূত মানুষ যুগ-যুগান্তব্যাপী এ রহস্য উদঘাটনের চেষ্টায় নিজেদের নিয়োজিত করে সে বিস্ময়ের জগতে নব নব মাত্রা যোগ করেছেন। মহানবী (সাঃ)-এর বাণী জগতের মানুষের জন্য হয়েছে জীবনের দিক নির্দেশনা। পবিত্র কুরআনের পরে নবীর সুন্নত এর কোন বিকল্প

নেই। মহাপ্রলয়কালাবধি তার কোন বিকল্প সৃষ্টি হবে না। তাঁর বিস্ময়কর জীবনের ওপর যুগ-যুগান্তর ধরে আলোচনা-পর্যালোচনা-গবেষণা অব্যাহত থাকবে– তা কোন কালেও শেষ হবে না। বিগত দেড় হাজার বছর যাবৎ তাঁকে নিয়ে যে কত গবেষণা -আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। সেসব গবেষকদের গবেষণাগ্রন্থ থেকে শুধু উদ্ধৃতি চয়ন যে করলে কত খণ্ডের বই সংকলিত হবে তা কল্পনাতীত। জগত সভায় এমন কোনো মনীষী আসেননি যিনি তাঁকে নিয়ে ভাবেননি, এমন কোনো জ্ঞানীগুণীজন আসেননি, তাঁকে নিয়ে যার চিন্তা-চেতনার জগৎ আলোড়িত হয়নি। এটাই স্বাভাবিক; কারণ তাঁর মতো পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী মহামানব– যিনি জীবন ও জগতের সর্বক্ষেত্রে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁকে নিয়ে জগদ্বিখ্যাত মেধাবী ব্যক্তিদের চিন্তা-চেতনা আলোড়িত হবে না— তা তো হতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে, জগতের বুকে মহানবী মুহম্মদের (সাঃ) আবির্ভাব এক পরম বিস্ময়কর ব্যাপার। তা যেমন বিস্ময়কর, তেমনই মোহনীয়। পাশ্চাত্য জগতের প্রখ্যাত মনীষী টমাস কার্লাইলের চিন্তাধারায় উদ্ভাসিত হয়েছে মহানবী মুহম্মদ (সাঃ)-এর আলোকিত একটি দিক– "এক স্ফুলিংগের মতোই মহানবী মুহম্মদ (সা)-এর আবির্ভাব ঘটেছিল। মরুভূমির প্রতিটি বালুকণা সেই স্ফুলিংগে বিস্ফোরিত হয়েছিল। বিস্ফোরণের অগ্নিকণা ছড়িয়ে পড়েছিল মক্কা থেকে গ্রানাডা পর্যন্ত। আমি মনে করি, মহামানব সর্বদা স্বর্গীয় জ্যোতি নিয়েই আবির্ভূত হন আর গোটা মানবজাতি তাঁর পরশে আলোকিত হয়ে ওঠে।"

মহানবী মুহম্মদ মুস্তফা (সাঃ) হলেন সেই আলোকিত মহাপুরুষ যার আগমনে সমগ্র আরব আজম আলোকিত হয়ে উঠেছিল। অন্ধকার মুখ লুকিয়েছিল। জয় হয়েছিল হকের। তা সহজে হয়নি। হয়েছিল এক কর্মবীরের অক্লান্ত পরিশ্রমের বলে। এ কর্মবীরের অক্লান্ত পরিশ্রম, সাধনা আর অসাধারণ পুণ্যবলে জগতের বুকে বাতিলের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হক; আর অজ্ঞ, অশিক্ষিত মেষপালক এক জাতি হয়ে উঠেছিল বিজ্ঞ, সুশিক্ষিত, সুশৃঙ্খল ও দুনিয়ার শাসক। তাঁরই অসাধারণ পুণ্য ও কর্মবলে জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হক, অর্ধেক পৃথিবী জুড়ে কায়েম হয়েছে হকের রাজত্ব। তা সম্ভব হয়েছিল এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কালজয়ী ব্যক্তিত্ব ও কর্মপ্রতিভার বলে। পাশ্চাত্য মনীষী লা মারটিনের চিন্তাধারায় এ সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তাঁর ভাষায়– "তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক, একজন সফল বাগ্মী, ধর্ম প্রচারক, আইনবিদ, যোদ্ধা, সর্বোপরি সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন বিধান ইসলাম-এর প্রবর্তক। তিনি প্রচার করেছেন এমন এক অতুলনীয় ধর্ম যা কোনোরকম মূর্তিপূজার ধার ধারে না। যত দিক দিয়েই বিচার করি না কেন, আমরা অত্যন্ত সঙ্গত কারণে বলতে পারি যে, তার চাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ আর কেউ নেই।"

ত্রিকালদর্শী মহামানব, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহম্মদ (সাঃ) প্রচারিত জীবনবিধান জগতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনবিধান। বিশ্বমানব তাঁর সে জীবন বিধানের কথা যুগ যুগ ধরে পর্যালোচনা করেছে আর বিস্ময়ে হতবাক হয়েছে।

চার.

মহানবী মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচারিত ও সুসংস্কৃত জীবন ব্যবস্থা যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনব্যবস্থা সে কথা শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপার নয়; তা যুক্তিতর্ক তত্ত্বতথ্যের আলোকে যুগ-যুগান্তের আলোচনা -পর্যালোচনা ও গবেষণার দ্বারা সপ্রমাণিত। তা কূপমণ্ডুকের কূপমণ্ডুক আস্ফালন নয়; অকালকুষ্মাণ্ডের অন্তঃসারশূন্য খালিপাত্রের আওয়াজ নয়; ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে ধ্বংস করার ঘৃণ্য চক্রান্তকারিদের চক্রান্ত, ভণ্ড নবীদের ঘৃণিত ভণ্ডামি, মিথ্যাশ্রয়ীদের ছল-চাতুরি ও কপটতার ঊর্ধ্বে পরিপূর্ণভাবে পরিমার্জিত পরিপাটি এক পবিত্র জীবনব্যবস্থা যে ইসলাম– কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। মূর্খ-অকালকুষ্মাণ্ড-কুপণ্ডুক-ভণ্ড-প্রতারক -মিথ্যাবাদীর ভ্রান্তিবিলাসিতায় নয়; ইসলামী জীবনব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে জগদ্বিখ্যাত জ্ঞানীগুণীজনদের নির্মোহ পর্যালোচনায়। বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ মনীষী জর্জ বার্নাড শ'র কালজয়ী চিন্তাধারায় ইসলামের আলোকিত এ মহান দিক অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে উদ্ভাসিত। তাঁর ভাষায়– "আমার বিবেচনায় একমাত্র ইসলামই মানবজাতির পরিবর্তনশীল অবস্থায় সকল সমস্যার সামঞ্জস্য বিধান করতে সর্বযুগে সমভাবে উপযোগী। আমার বিশ্বাস যদি মুহম্মদের (সাঃ) মতো বর্তমান জগতে একজন একনায়ক থাকতেন তাহলে এমন উপায়ে জগতের সমস্যাবলীর সমাধান করতে সমর্থ হতেন যার ফলে পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় সুখ-শান্তি বিরাজ করত।"

এ মনীষী অন্যত্র বলেছেন-"ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা সকল যুগের ও সকল মানুষের ধর্ম অর্থাৎ বিশ্বজনীন ধর্মরূপে গণ্য হতে পারে।"

কমিউনিজম (সাম্যবাদ) ও ক্যাপিটালিজম (পুঁজিবাদ)-এর তুলনামূলক আলোচনা, সমালোচনা ও পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে তিনি পবিত্র ইসলামী জীবনবাদের তুলনামূলক ও নির্মোহ পর্যালোচনা করে স্পষ্টভাষায় বলেছেন– "যতদিন জগতে হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর মত ডিকটেটরশীপের রাজমুকুট পরিহিত মহামানবের আবির্ভাব না হবে ততদিন উৎপীড়ক কমিউনিজম, উচ্চহারে সুদখোর ক্যাপিট্যালিজম, তরবারির ঝনঝন গর্জনকারী নাৎসীজম, স্বাধীনতার হত্যাকারী ফ্যাসিজম, চরম অহংকারী সোস্যালিজম এবং উচ্চৈঃস্বরে গর্জনকারী ইন্টারন্যাশনালিজম মানব জীবনের সমাধান করতে পারবে না।" প্রাজ্ঞ মনীষী জর্জ বার্নাড শ'র এ পর্যালোচনা যে কত সত্য সমগ্র বিংশ শতাব্দীব্যাপী সমগ্র বিশ্বের আর্থ– সামাজিক-রাজনৈতিক আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট ও সত্য হয়ে ওঠে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি সময়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আস্ফালন, মুসোলিনীর ফ্যাসিজম, হিটলারের নাৎসীজম, সোস্যালিজম, ক্যাপিট্যালিজমের আস্ফালন ও সেই সঙ্গে পরপর দু'টি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল স্মৃতি বুকে ধারণ করে বিংশ শতাব্দী আজ অতিক্রান্ত হতে চলেছে- এর মধ্যে বিশ্বের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে বিশ্ববাসী ফ্যাসিজম- নাৎসীজম-কমিউনিজম-সোস্যালিজমের কবর হতে দেখেছে, কিন্তু ইসলাম বেঁচে আছে স্বমহিমায় পরম শান্তির আশ্বাস বুকে নিয়ে। জায়নবাদ প্রভাবিত ঘৃণা ক্যাপিটালিজম ইসলামকে হা করে গ্রাস করতে উদ্যত হয় মাঝে

মাঝে; কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, ইসলাম নয়, ধ্বংস হয়েছে ইসলামের শত্রুরা। ইসলামের নয়, কবর হয়েছে ইসলামের শত্রুদের। তবুও শত্রুরা লেগে আছে ইসলামের পিছনে। কিন্তু এসব মিথ্যাশ্রয়ীদের মোকাবিলায় শেষ কথা বলবে মহাকাল।

বিশ্ববিখ্যাত মনীষীদের কালজয়ী চিন্তাচেতনায় ইসলামের মহিমান্বিত রূপচিত্র যুগ যুগ ধরে অঙ্কিত হয়ে চলেছে পৃথিবীর বুকে। পৃথিবীতে ইসলাম এসেছে মানবতা, মনুষ্যত্ব ও মুক্তির বাণী নিয়ে। পার্সিয়ান ডাক্তার এমএন ধল্লার উপলব্ধিতে তা স্পষ্টঃ "ইসলাম একমাত্র ধর্ম যা জন্ম ও বর্ণবৈষম্যের সকল বাধা বিদূরিত করেছে।" ইসলামের আবেদন সর্বজনীন, বিশ্বজনীন। ভারতের ইসলামী সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুহম্মদ ইকবালের যুগান্তকারী চিন্তা-চেতনায় তা উদ্ভাসিত – "আমার মতে ফ্যাসিজম কিংবা বর্তমান যুগের অপর কোনো ইজম এর কোনোটারই আদৌ কোনো মূল্য নেই। আমার আকীদা মতে, ইসলামই একমাত্র বাস্তব সত্য, যা সারা বিশ্বের মানবগোষ্ঠীর জন্যে প্রত্যেক দৃষ্টিকোণ হতে মুক্তির উপায় ও কারণ হতে পারে।" প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম একটি সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন এক পূর্ণাঙ্গ জীবনবাদ। যার সম্পর্ক ইহকাল ও পরকালের পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ সাধনের মধ্যে নিহিত। মহাকবি গ্যেটের সুগভীর মর্মোপলব্ধি– "যদি ইসলামের অর্থ ঈশ্বরে আত্মনিবেদন হয়, তবে আমরা সকলে ইসলামে বাঁচি এবং ইসলামেই মরি।"

মহানবী মুহম্মদ (সাঃ) ত্রিকালদর্শী সর্বশ্রেষ্ঠ ও সৃষ্টিশ্রেষ্ঠ মহামানব। তাঁর প্রচারিত জীবনব্যবস্থা তাই সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনব্যবস্থা। তার সমকক্ষ কিছুই নেই, হবে না কোনকালেও। তাই সত্যিই আমরা ইসলামে বাঁচি এবং ইসলামেই মরি।

পাঁচ.

আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ পূর্বে মিসরের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ বিভাগের মহানির্দেশক জনাব মুহম্মদ আহমদ বরানিকের তত্ত্বাবধানে আখেরি নবী হযরত মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী বিশ্বকোষ চৌদ্দখণ্ডে সংকলিত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। এই জীবনী বিশ্বকোষের অন্যতম সম্পাদক মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেবের ইচ্ছাক্রমে এই বিশ্বকোষকে উর্দূ ভাষায় রূপান্তরিত করার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন ভারতের বিখ্যাত আলেম ডক্টর মুহম্মদ ইনায়েতুল্লাহ সুবহানী। ডক্টর সুবহানী সাহেব উক্ত আরবি-গ্রন্থমালাকে অবলম্বন করে উর্দূ ভাষায় 'মুহম্মদে আরাবী (সাঃ)' নামে চৌদ্দ অধ্যায়ে বিভক্ত করে একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রস্তুত করেন— যে গ্রন্থটি ভারতে ব্যাপক প্রচার এবং প্রসার লাভ করে এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়।

এই জনপ্রিয় মহান গ্রন্থটি আমি হিন্দী ভাষায় পাঠ করে অভিভূত হয়ে যাই। এ জীবনে বিভিন্ন ভাষায় মহানবী মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একাধিক পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, কিন্তু এত সংক্ষেপে, এমন মধুর ও সর্বজনবোধ্য ভাষায় এরকম জীবনীগ্রন্থ খুব বেশি রচিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এ গ্রন্থে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সাল্লাম থেকে শুরু করে মহানবীর (সাঃ) তিরোভাব পর্যন্ত তৌহিদী ধর্ম ও মহানবীর জীবনেতিহাস অতি সংক্ষেপে অথচ এমন বিস্তারিতভাবে

লেখা হয়েছে যে, তা অধ্যয়ন করে পরম পরিতৃপ্তি লাভ না করে পারা যায় না। এ মহান গ্রন্থ পাঠ করে আমার সমস্ত সত্তা এক স্বর্গীয় পরিতৃপ্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সেই স্বর্গীয় প্রেরণার বলে সেই মহান গ্রন্থটি অনুবাদ করে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের খেদমতে পেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এ জন্য আল্লাহর দরবারে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

এই মহান গ্রন্থের মূল ভাব ও ভাষা অত্যন্ত ওজস্বিনী ও হৃদয়গ্রাহী। আর তাতে মহানবীর (সাঃ) জীবন ও সাধনার কথা এমন অন্তরঙ্গভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তা পড়তে পড়তে মনে হয় পবিত্র মহানবী (সাঃ) ও তাঁর পারিপার্শ্বিক বাতাবরণ ও তাঁর সাথে সম্পর্কিত মানুষগুলোকে অন্তর্চক্ষু দিয়ে স্পষ্টভাবে অবলোকন করছি। এই গ্রন্থ অনুবাদ করতে করতে আমি ভাববিহ্বল হয়ে পড়তাম আর কখনো কখনো আমার আঁখিদ্বয় অশ্রুসজল হয়ে উঠত। আমি আমার অনুবাদে মূল গ্রন্থের ভাষা ও ভাব-সৌন্দর্য প্রাণপণে অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করেছি। এটা ব্যক্তিগতভাবে আমি একজন অনুবাদকের মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করে থাকি।

প্রসঙ্গত এখানে একটা কথা উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। আমি তখন ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'আজকের কাগজ' পত্রিকার শুক্রবারীয় সাপ্তাহিক 'ইসলামী দিগন্ত'-র পরিচালক-সম্পাদক। আমি এ গ্রন্থের সম্পূর্ণ কাজটাই 'আজকের কাগজ' পত্রিকা অফিসে বসে সম্পন্ন করি এবং এটি ধারাবাহিকভাবে 'ইসলামী দিগন্ত'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। গ্রন্থের অনুবাদ সম্পন্ন করতে প্রায় চার মাস সময় লাগে এবং এটি পরপর ষাট সপ্তাহে আটান্নটি সংখ্যায় সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ লাভ করে। ঐ সময় কালে অত্যন্ত শান্তচিত্তে অত্যন্ত আত্মিক পরিতৃপ্তির মধ্যে আমি এ কাজ সম্পন্ন করি। ঐ সময়ের মধ্যে এ কাজ সম্পন্ন না করলে অনিশ্চিত জীবন-জীবিকার এ জীবনে তা সম্পন্ন করা আদৌ সম্ভব হত কি-না তাই বা কে জানে? সে যাই হোক, এ অনুবাদ সম্পন্ন করে আমি যে স্বর্গীয় আনন্দ ও আত্মার শান্তি পেয়েছি, এমন তৃপ্তি ও শান্তি জীবনে আর কখনো পাই নি।

এবার মূল গ্রন্থের লেখক আল্লামা ডক্টর মুহম্মদ ইনায়েতুল্লাহ সুবহানী সম্পর্কে কিছু বলা একান্ত প্রয়োজন। ইনি উপমহাদেশের কত বড় আলেম এবং পণ্ডিত তা তাঁর কর্ম-পরিচয় থেকে অনুধাবন করা সম্ভব। এই মহান আল্লামা মিসরীয় শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক আরবি ভাষায় চৌদ্দ খণ্ডে সংকলিত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত সীরাত গ্রন্থটির সম্পূর্ণ উর্দূ অনুবাদ সম্পন্ন করেন এবং সেই চৌদ্দ খণ্ড গ্রন্থকে অবলম্বন করে চৌদ্দটি অধ্যায়ে উর্দূ ভাষায় 'মুহম্মদে আরাবী (সাঃ)' প্রণয়ন করেন। এই বিরাট কর্মের আনজামদাতা মহান পণ্ডিত আল্লামা সুবহানীকে আমি সশ্রদ্ধ সালাম জানাই এবং সেই মহাত্মার দোয়া কামনা করি। তাঁর সম্পর্কে অনুসন্ধান করে জানা গেল, এই জ্ঞানবৃদ্ধ মানুষটি এখন ভারতের উত্তর প্রদেশের রামপুর শহরে অবস্থিত বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রের আচার্য। আমি তাঁর শতাধিক আয়ু কামনা করি।

অবশেষে ধন্যবাদ জানাই 'বাড কম্প্রিন্ট অ্যান্ড পাবলিকেশন্স'-এর কর্ণধার জনাব শিহাবউদ্দীন সাহেবকে। তিনি এই গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের পরম ধন্যবাদার্হ হয়ে গেলেন।

অসংখ্য সালাম ও রহমত বর্ষিত হোক সেই পাক-পবিত্র মহানবীর (সাঃ) উপর যিনি আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবীরূপে নিজের জীবন ও সাধনা দিয়ে জগতের বুকে মনুষ্যত্ব ও মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন— সেই সাথে রেখে গিয়েছেন মানবজাতির চিরকালের মহাসনদ পবিত্র কুরআন ও নিজের জীবন ও সাধনার নির্যাস সুন্নাহ যা তাঁর অনুসারীদের চিরকালের পাথেয়। যা আঁকড়ে থাকলে পৃথিবীতে কেউ তাদের বিপথগামী করতে পারবে না; ইহ-পরকালে কেউ তাদের পরাজিত ও পরাভূত করতে পারবে না। জীবনে চলার পথে এ গ্রন্থও হোক তাঁর অনুসারীদের অন্যতম সাথী, পথ-প্রদর্শক, বন্ধু ও আলোকবর্তিকা।

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ বিনীত
তারিখ—১৩-০৯-১৯৯৯ইং **মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস**

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

সুপ্রভাত

—আরবে পৌত্তলিকতার শুরু

—পৌত্তলিকতার উৎপত্তি

—পৌত্তলিকতার বিভিন্ন পর্যায়

—মক্কার প্রথম প্রতিমা কিভাবে এসেছিল?

—অন্ধকার যুগের বিখ্যাত দেবতা

—রিসালাতের পরম্পরাগত ধারা

—দ্বিতীয়বার জমজম কূপের খননকাজ

—আবদুল মুত্তালিবের মান্নত

—আবদুল্লাহ্‌র জীবনরক্ষা

—আমিনার সাথে আবদুল্লাহ্‌র বিবাহ

—আবদুল্লাহ্‌র বেদনাদায়ক অকাল মৃত্যু

—মরুসূর্যের শুভোদয়

—আমিনার পুত্র হালিমার কোলে

—দাইমা হালিমার গৃহে অনবরত করুণা বর্ষণ

—মা আমিনার মৃত্যু

—আমিনার পুত্র দাদার তত্ত্বাবধানে।

প্রথম অধ্যায়

সুপ্রভাত

সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আরম্ভ— যিনি অসীম দয়ালু, অতীব কৃপাবান।

হজরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম প্রচারিত ধর্মমত আরবদেশে খুব বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। দেখতে দেখতে সারা দেশে আবার পৌত্তলিকতা ছড়িয়ে পড়ল। লোকেরা আল্লাহর সাথে সাথে মূর্তিপূজাও সমানে চালিয়ে যেতে লাগল। তাদের মনে এ ধারণাও বদ্ধমূল হল যে, মূর্তিপূজার মাধ্যমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে তাঁকে পাওয়া সম্ভব। তারা এ-ও বিশ্বাস করতে লাগল যে, এ সব মূর্তি আল্লাহরই প্রতিনিধি এবং তাঁদের সুপারিশ ব্যতীত মুক্তি পাওয়া যাবে না। তারা এ-ও মনে করত যে, পূজার্চনার মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্ট করতে পারলে বিপদাপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। সে জন্য বিপদে পড়লে তারা মূর্তির কাছেই আশ্রয় চাইতে লাগল, তাদের কাছেই ফরিয়াদ করতে লাগল আর মুক্তির জন্য একমাত্র তাদেরকেই ডাকতে লাগল।

হজরত ইব্রাহীম(আঃ) বিশুদ্ধ তৌহিদবাদ (একেশ্বরবাদ) প্রচার করেছিলেন। তিনি আজীবন মূর্তিপূজার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করে গিয়েছিলেন অথচ তাঁর অবর্তমানে সেই আরববাসী পুনরায় মূর্তিপূজার মধ্যে ডুবে গেল। কিন্তু এর মধ্যে আবার অল্পসংখ্যক এমন মানুষও ছিলেন যাঁরা ইব্রাহীমী দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। এভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এ সময়ের মধ্যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ কত মূর্তি পয়দা করল, আর কত মূর্তি স্মৃতির অতলে হারিয়ে গেল তার ইয়ত্তা নেই।

এই শিরক বা অংশীবাদ কীভাবে এলো ? কীভাবে মূর্তিপূজার প্রচলন হল ? প্রকৃতপক্ষে, হজরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হজরত ইসমাঈলের প্রতি আরববাসীদের অপরিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। কাবা শরীফ এ দুজনই নির্মাণ করেছিলেন। সে জন্য কাবা শরীফের প্রতি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এ শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালোবাসার কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। এ কাবা শরীফের আশেপাশে যত পাথর ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, এ কাবা শরীফের নিকটবর্তী হওয়ার সুবাদে ঐ পাথরগুলিও শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সম্মান পেতে লাগল।

এর ফলে, যখন তারা মক্কা শহরের বাইরে যেত, তা রুজি-রোজগারের কারণেই হোক বা ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণেই হোক, অতিভক্তিবশত দু'একটা পাথরও সাথে করে নিয়ে যেতে লাগল। তাদের মধ্যে এরকম ধারণা জন্মেছিল যে, এ পাথর সাথে থাকলে তাদের যাত্রা শুভ হবে আর আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হবে।

তা শুধু এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকল না। মক্কা থেকে দূরবর্তী স্থানে বসবাসরত লোকেরাও কাবা শরীফের আশপাশ থেকে পাথর বয়ে নিয়ে যেতে লাগল; শুধু তাই নয়, সেসব পাথর নিজ নিজ এলাকায় নিয়ে বসিয়ে কাবা শরীফের মতো তাকে তওয়াফ (পরিক্রমা) করতে লাগল। সেই সাথে কাবা শরীফে সুরক্ষিত 'হাজরে আসওয়াদ'[১] -এর মতো তাকে চুম্বন করতে লাগল।

এর ফলে, সেই পৌত্তলিকতা আরবদেশে আবারো ফিরে এল। অথচ হজরত ইব্রাহীম আজীবন এ পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধেই জীবনপণ সংগ্রাম করে গিয়েছিলেন।

এ ছাড়া আরো একটি ব্যাপার ছিল। যে কারণে এ ধারণা আরো বদ্ধমূল হয়েছিল। যখন আগ্নেয়গিরি হতে অগ্ন্যুদগীরণ ঘটত, তখন সেই জ্বলন্ত লাভার সাথে যেসব পাথর বেরিয়ে আসত, সেই পাথর সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল যে, ওসব আকাশের তারা। আকাশ থেকে সেসব তারা খসে খসে মাটিতে পড়ছে। এ ধারণার ফলে সেই পাথরকেও তারা পবিত্রজ্ঞানে পূজা করতে লাগল। এরও কারণ ছিল। আরবের কোন কোন গোত্রের লোক আকাশের উজ্জ্বল তারকারাজিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করত। আকাশের উজ্জ্বল তারকাদের তারা মনে করত আল্লাহর মহিমারই আলোকিত প্রকাশ। তারা মনে করত, এসব তারকারাজি আল্লাহরই শক্তির প্রকাশ। তারাও শক্তিমান।

মনে করত অগ্ন্যুদগীরিত পাথর আকাশের তারকারাজিরই খসে পড়া অংশ, সেজন্য সেসব পাথরকে তারা পবিত্রজ্ঞানে পূজা করতে লাগল।

পুরুষানুক্রমে চলে আসা এ বিশ্বাস তাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গেল। রঙীন ও সুদৃশ্য কোনো রঙীন পাথর হলে তারা তাকে আরো গভীরভাবে পূজা-অর্চনা করত।

পাথরের উপর ভক্তি-শ্রদ্ধা-বিশ্বাস এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেল যে, সেই পাথর কুঁদে তারা তাদের নিজেদের স্বপ্ন-কল্পনা আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নিজেদের মনের মতো মূর্তি গড়ে নিতে লাগল। সেইসাথে নিজেদের মনমতো নামকরণও করে নিতে লাগল। এভাবে তৈরি করা

মূর্তিগুলোকে তারা তাদের পছন্দ মতো জায়গায় স্থাপন করে তাদের পূজা করতে লাগল। ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাকে পূজার অর্ঘ্য দিতে লাগল। মূর্তির কাছে মান্নত করতে লাগল। তাদেরই হাতে গড়া মূর্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তারাই ধারণা করতে লাগল যে, এ মূর্তিই আল্লাহর প্রতিনিধিরূপে তাঁর কাছে সুপারিশ করে তার আকাঙ্ক্ষা পুরো করে দেবে। বেহেশ্‌তে যাওয়ার কাজ সম্পন্ন করে দেবে ; পরন্তু ইহ-পরকালে তাকে নাজাত বা মুক্তি দেবে।

---

১. কাবা শরীফে সুরক্ষিত কালো পাথর। এটি বেহেশতের পাথর বলে বিশ্বাস করা হয়।

মক্কার কাবা প্রাঙ্গনে সর্বপ্রথম যে মূর্তিটি এনে বসানো হয়েছিল, তা ছিল 'হুবুল' দেবতার মূর্তি। আমর বিন লহী নামে এক ব্যক্তি এটি এনেছিল। এই ব্যক্তি কোন একটি জায়গায় যাওয়ার পথে রাস্তায় দেখতে পায় যে, কিছু লোক মূর্তিপূজা করছে। এটি তার কাছে বেশ আকর্ষণীয় মনে হল। সে বলল–তোমরা আমাকেও একটি মূর্তি দাও। এটি আমি আমার দেশে নিয়ে যাব। আমরাও তার পূজা করব। ঐ লোকেরা তার এ আগ্রহে খুশি হয়ে তাকে একটি মূর্তি দেয়। সে ঐ মূর্তি নিয়ে মক্কায় চলে এলো।

এর পরে দেখতে দেখতে কাবা ঘরে আরো অনেক মূর্তি এলো। সে সবের মধ্যে 'ইসাফ' ও 'নাঈলা' নামক দুটি মূর্তি ছিল। এ দুটিকে জমজম কূপের উপর বসানো হল। তারপর আরো নাম-না-জানা বহু মূর্তি সেখানে বসানো হয়।

শুধু তাই নয়। আরবের ভিন্ন ভিন্ন গোত্রে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি পূজার প্রচলন হয়ে পড়েছিল। অসংখ্য মূর্তি সর্বত্রই দেখা যেত। উদাহরণত কয়েকটা দেবতার নাম করা যায় যারা ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের সম্মানিত দেবতারূপে পূজিত হত।

উজ্জা ঃ এ ছিল কুরাইশদের সবচেয়ে বড় দেবতা।

লাত ঃ তায়েফের সকীফ গোত্রের প্রধান দেবতা ছিল।

মানাত ঃ মদীনার খাজরাজ ও আউস নামক দু বিখ্যাত গোত্রের প্রধান দেবতা ছিল।

এ-ছাড়াও দেশের বিভিন্ন জায়গায় আরো অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি ছিল।

কাবা ছিল সেই পবিত্র গৃহ যা হজরত ইব্রাহীম ও হজরত ইসমাঈল নিজেদের পবিত্র হাতে নির্মাণ করেছিলেন। বড় সাধ ও আশায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাঁরা এ গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। কেন ? তাঁদের একটাই উদ্দেশ্যে ছিল তা হবে তৌহিদবাদী (একেশ্বরবাদী) ধর্মের মূলকেন্দ্র। তা হবে মহাপ্রভুর একান্ত নিজস্ব গৃহ। কিন্তু তাঁর কওম (সম্প্রদায়) বিপথগামী হল। একেশ্বরবাদীদের গৃহ অংশীবাদী ও দেবতাদের গৃহে পরিণত হল। একেশ্বরবাদীদের কেন্দ্রভূমিতে বহুত্ববাদের স্রোত বয়ে গেল। লোকেরা ইব্রাহীমের (আঃ) দ্বীন-ধর্মের মূল শিক্ষা ভুলে গেল। তারা একথাও একসময় ভুলে গেল যে, এই পবিত্র কাবাগৃহ একদা একেশ্বরবাদী উপাসনার কেন্দ্রভূমিরূপে গড়ে উঠেছিল।

সেখানে এক আল্লাহর উপাসনার আওয়াজই ধ্বনিত হয়েছিল, অথচ সেই পবিত্র গৃহ আজ অসংখ্য দেবতার মন্দিরে পরিণত হয়েছে, তাদের চিন্তাধারা এমনই ঘোলাটে ও আচ্ছন্ন হয়ে গেল যে, তারা মূর্তিপূজা ছাড়া আর কোনো কিছুর মধ্যে মুক্তির পথ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হল। যে পিতা একসময় মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন এখন তাঁরই সন্তানেরা মূর্তিপূজার পৃষ্ঠপোষক ও সংরক্ষক হয়ে গেল।

২

যুগ-যুগান্তর ধরে মক্কায় কত মতবাদ এলো আর কত মতবাদ হারিয়ে গেল তার ইয়ত্তা নেই। কত জাতি এলো আর কালের প্রবাহে হারিয়ে গেল মহাকাল তার সব কথা ইতিহাসে লিখে রাখেনি। কত জাতি ক্ষমতাসীন হল আর কত জাতি পরাজিত হয়ে চিরকালের জন্য জগতের বুক থেকে হারিয়ে গেল তার হিসেব নেই। কালের প্রবাহে এক সময় মক্কার সর্বময় কর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন জনৈক কুসাই। তিনি সর্বময় কর্তারূপে মক্কার শাসক হয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন কিলাব এর পুত্র। হজরত ইসমাঈলের বংশের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল।

মক্কার কুরাইশ বংশের সাথেও ছিল সুগভীর আত্মিক সম্পর্ক। তাঁরা ছিলেন তাঁর সহযোগী, বন্ধু ও আত্মীয়।

তখনো পর্যন্ত মক্কাভূমিতে কোনো অট্টালিকা গড়ে ওঠেনি। কাবা শরীফের পবিত্র ভূমিতে বাড়ি-ঘর নির্মাণের মতো সাহসও কারো ছিল না। শুধু তাই নয়, আশপাশের এলাকার কোনো অট্টালিকা বায়তুল্লাহ্ বা কাবা শরীফের চেয়ে উঁচু হওয়া তো দূরের কথা তার সমউচ্চতা সম্পন্ন হওয়ারও কোনো উপায় ছিল না।

কুসাই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি কাবার জমীনে অট্টালিকা নির্মাণ করার মতো দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। তিনি একটি ভবন নির্মাণ করে তার নামকরণ করেন 'দার-উন্-নাবা' বা মন্ত্রণালয়। সেখানে তিনি মক্কার ধনী লোকেদের আমন্ত্রণ জানাতেন। আহ্বায়ক রূপে তাঁদের সাথে তিনি নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সহ নানা সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করতেন। অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তিনি তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। সেখানে মামলা মোকদ্দমারও ফায়সালা হত। বিয়ে-সাদীর মামলাও সেখানে নিষ্পত্তি হত।

এবার কুসাই কুরাইশদেরও বাড়ি-ঘর নির্মাণের হুকুম দিলেন। এভাবে কাবা শরীফকে কেন্দ্র করে আশেপাশে বাড়ি-ঘর নির্মিত হল কিন্তু মধ্যস্থলে অনেক জায়গা খালি রাখা হল যাতে কাবা শরীফ তাওয়াফকারীদের কোনো অসুবিধা না হয়।

কুসাই তাঁর আমলে অনেক বড় বড় কাজ আঞ্জাম দিয়েছিলেন যা আরবের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। মশআরে হারাম তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে হজ্জের সময়ে আলো জ্বালিয়ে রাখা হত। সেখানে তিনি সমস্ত কুরাইশ সরদারকে একত্রিত করে সবার উদ্দেশে বললেন ঃ

"ভ্রাতৃবৃন্দ! পবিত্র কাবা শরীফ জিয়ারতের জন্য দেশ-বিদেশ থেকে কত মানুষের যে আগমন ঘটে, তা লেখাজোখা নেই। শত শত এমন কি হাজার হাজার মাইল দূর থেকেও হাজীরা হজ্জ করতে আসেন। ভ্রাতৃগণ! তারা তোমাদেরই মেহমান। তাই তাদের সেবা-সুশ্রূষা করা ও তাদের দেখ-শুনা করা তোমাদেরই দায়িত্ব।"

এ উদ্দেশ্যে তিনি দুটি বিভাগ স্থাপন করলেন ঃ

১. 'সিকায়া'ঃ এ বিভাগের কাজ ছিল আগত হাজীদের খাবার পানির ব্যবস্থা করা। জমজম কূপ মাটির নীচে চাপা পড়ে যাবার কারণে পানির অভাব ছিল। সে অভাব দূরীকরণের জন্য দূর-দূরান্ত হতে পানি বয়ে আনতে হত। নবীজ (খেজুরের মিষ্টি পানি) ইত্যাদির ব্যবস্থাও তাদের দায়িত্বে অর্পিত ছিল। যা ছিল আরবদের একটি অতি প্রিয় পানীয়।

২. 'রিফাদা' ঃ এই বিভাগের দায়িত্ব ছিল মক্কা ও মিনায় মৃত হাজীদের সৎকার করা।

কাবা শরীফের সাথে সম্পর্কিত একটি বিভাগও স্থাপন করা হয়। এর নামকরণ করা হয়েছিল 'হিজাওয়া'। এই বিভাগের দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছে কাবা শরীফের চাবি রাখা হত। কাবা শরীফ সম্পর্কিত সমস্ত কাজের দায়িত্ব তাঁর উপরেই অর্পিত থাকত। কাবা শরীফের ভিতরে যেতে চাইলে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিতে হত। তার অনুমতি ব্যতিরেকে কাবা শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যেত না।

এই তিনটি বিভাগের দায়িত্ব আরবদের কাছে অত্যন্ত সম্মানজনক কাজ বলে বিবেচিত হত। ঐ বিভাগত্রয়ের মধ্যে যে কোন একটির কাজের দায়িত্বকে তারা বাদশাহী পাওয়ার সমকক্ষ বলে বিবেচনা করত। সে কারণে কুসাই ঐ বিভাগত্রয়ের সমস্ত দায়িত্ব তাঁর নিজের হাতেই রেখেছিলেন।

হজ্জ ও কাবা শরীফের সাথে সম্পর্কিত বিভাগ ছাড়াও আরো কয়েকটি বিভাগ কুসাই নিজের দায়িত্বেই রেখেছিলেন। এ পদগুলোতেও তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল

বার্ধক্যবশত সমস্ত দায়-দায়িত্ব পালন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ায় সে দায়িত্ব তিনি আব্দুদ্দারকে অর্পণ করেন। তিনি ছিলেন কুসাইয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

এরপর আব্দুদ্দারের পুত্রদের উপর এসব দায়িত্ব এসে পড়ে।

কুসাইয়ের আরেক পুত্রের নাম ছিল আবদে মানাফ। তাঁর পুত্রেরা যোগ্যতা ও প্রভাব প্রতিপত্তিতে আব্দুদ্দারের পুত্রদের ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁরা ঐ সকল পদ তাঁদের চাচাত ভাইদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

এর ফলে, প্রচণ্ড দ্বন্দ্বসংঘাতের সূচনা হল। আব্দুদ্দারের পুত্ররা এসব বিভাগের দায়িত্ব ত্যাগ করতে অস্বীকার করায় সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। কিন্তু সংঘাত এড়ানোর লক্ষে পরামর্শ সভা বসল। সে সভায় সমস্ত দায়দায়িত্ব দু'পক্ষকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেয়া হল।

এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক আব্দে মানাফ এর ভাগে 'সিকায়া' ও 'রিফাদা'র দায়িত্ব এসে গেল।

আব্‌দে মানাফের এক পুত্রের নাম ছিল হাশিম। তিনি ছিলেন ভাইদের মধ্যে সবার বড়। তাঁর গোষ্ঠীর মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ভালবাসার পাত্র। ধন-সম্পদেরও কমতি ছিল না তাঁর। সেজন্য ঐ দু পদই তিনি লাভ করলেন।

হাশিম খুবই দয়ালু ও দীনদরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। দাদার আমল থেকে চলে আসা হাজীদের প্রতি সমস্ত দায়-দায়িত্ব তিনি সুনামের সাথে পালন করতে লাগলেন। শুধু হাজীদের নয় ; মক্কার দীনদরিদ্র মানুষেরাও তাঁর দুয়ারে নিরাশ হত না। তিনি মক্কার দীনদরিদ্র মানুষদের দারিদ্র্য বিমোচনের চিন্তাও করতে লাগলেন। তার পরিণামস্বরূপ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, মক্কার ব্যবসায়ীরা বছরে দু'বার বিদেশে বাণিজ্য করতে যাবে— একবার শীতকালে ও একবার গ্রীষ্মকালে। গ্রীষ্মকালে বাণিজ্য কাফেলা যাবে শাম (সিরিয়া) দেশে ও শীতকালে যাবে ইয়ামান দেশে।

রোম সম্রাটের সাথে তাঁর দেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি পাওয়া গেল। হাবশী সম্রাট নাজ্জাশীও তাঁর দেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি দান করলেন।

আরবের রাস্তাঘাট ছিল খুবই বিপজ্জনক। পদে পদে দস্যু-ডাকাতির ভয় ছিল। হাশিম ব্যবসায়ী পণ্য নিরাপদে বিদেশে নিয়ে যাবার কথা চিন্তা করে সুদীর্ঘ পথে বসবাসরত বিভিন্ন গোত্রের সরদারদের সাথে সমঝোতা-চুক্তি করলেন– "কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা যখন ঐ পথ অতিক্রম করবে তখন যেন তাদের যথাযথ নিরাপত্তা দেয়া হয়। এর বিনিময়ে কুরাইশরা তাদের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করবেন এবং প্রয়োজনীয় লেনদেন ও যোগাযোগ বজায় রাখবেন।" এর ফলে, আরবে লুটতরাজ অব্যাহত থাকলেও কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা নিরাপদে যাতায়াত করত।

এভাবে তিনি বিভিন্ন গোত্র ও দেশের সাথে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সমঝোতা গড়ে তুললেন। এভাবে কুরাইশরা খুবই লাভবান হতে থাকল আর সেই সাথে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও বেড়ে চলল।

এভাবে চলতে চলতে মক্কায় এক সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। হাশিম দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের ডাল-রুটির ব্যবস্থা করলেন। এরফলে, দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের কাছে তিনি সার্থকনামা হয়ে উঠলেন। তাঁর খ্যাতি-প্রতিপত্তি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল।

৩

একবার হাশিম বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে সিরিয়ায় যান। তাঁর সাথে ছিল কুরাইশ ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য কাফেলা। ফেরার পথে ইয়াসরিব (মদীনা) হয়ে আসছিলেন। ইয়াসরিবের কিছু ব্যবসায়ীও ঐ দলে ছিল। ইয়াসরিবের এক মহিলা তাদের বাণিজ্যে পাঠিয়েছিল।

কাফেলা ইয়াসরিবে পৌঁছালে সেই তরুণী ব্যবসায়ীদের কাছে এসে তাঁর বাণিজ্যের খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন। তিনি তাঁদের কাছে জানতে চাচ্ছেন 'কেমন বেচাকেনা' হয়েছে 'কেমন লাভালাভ হয়েছে' ইত্যাদি। তরুণীর এসব কথাবর্তা শুনে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, সে খুব বুদ্ধিমতী, হুশিয়ার, ভাল ব্যবসায়ী ও হিসেবী মহিলা। হাশিম তার এ বুদ্ধিমত্তা দেখে মনে মনে তার খুব প্রশংসা করলেন। সেই মহিলার চেহারায় বুদ্ধিমত্তা, সততা, জ্ঞানগম্মি ও ভদ্রতার সুস্পষ্ট পরিচয় দেখে হাশিম মুগ্ধচিত্তে তাঁর পানে তাকাতে লাগলেন।

তিনি সেই ব্যবসায়ীদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'মেয়েটি কে ?'

উত্তর এলোঃ 'মেয়েটির নাম সালমা। পিতার নাম আমর। খাজরাজ গোত্রেরই শাখা বনু নাজ্জার। তিনি সেই গোত্রের কন্যা।'

জিজ্ঞেস করলেনঃ 'মেয়েটির বিয়ে-সাদী হয়েছে ?'

জবাব এলোঃ 'না। তিনি এক সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। সে জন্য তিনি এমন একজন পাত্রকে বিয়ে করতে চান যিনি বিয়ের পরে তাঁকে স্বাধীনভাবে থাকতে দেবেন। তিনি স্বাধীন থাকতে খুবই পছন্দ করেন।'

হাশিম বললেন ঃ 'সে আমাকে পছন্দ করে কি না দেখ।'

জিজ্ঞাসিত হয়ে জবাব এলো তিনি রাজি। কেননা, হাশিম সম্পর্কে তাঁর ভালমতো জানা আছে। মেয়েটির একথাও জানা ছিল যে, হাশিম কোন বংশের সন্তান এবং তাঁর সামাজিক মর্যাদা কেমন ?

হাশিমের সাথে শুভক্ষণে তাঁর শুভ পরিণয় হয়ে গেল। তারপর তারা মক্কায় চলে এলেন। সেখানে প্রায় এক যুগ অবস্থানের পর তিনি ইয়াসরিব ফিরে গেলেন। সেখানে তাঁর এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তার নাম রাখা হয় শওবা।

এরপর আরো কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল।

গ্রীষ্মকালে আবার একটি বাণিজ্য-কাফেলা প্রেরিত হল, সেই সাথে হাশিমও গেলেন। সিরিয়ার একটি স্থানের নাম গাজা। সেখানে পৌঁছানোর পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। এবার সমস্ত পদ মুত্তালিবের অধীনস্থ হয়ে গেল। কেননা, তিনি ছিলেন তাঁর ভাই।

শওবা ছিলেন মুত্তালিবের ভাইপো। তিনি ইয়াসরিবে মায়ের কাছেই রয়ে গেলেন। এবার মুত্তালিব তাঁর খোঁজ-খবর নিলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি তাঁকে মক্কায় নিয়ে আসবেন। কারণ, ইয়াসরিব হল শওবার মাতুলালয়। তাঁর পিত্রালয় হল মক্কা। মুত্তালিব তাঁকে নিয়ে আসার জন্য ইয়াসরিব চলে গেলেন।

ভাবী সালমার সাথে সাক্ষাৎ করে তিনি বললেন ঃ 'আমার ভাইপো বড় হয়েছে। শক্তপোক্তও হয়ে উঠেছে সে। সেজন্য তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাই। তুমি জানো যে, আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু মর্যাদার মানুষ।

বংশমর্যাদায়ও আমরা সবার উপরে। আমাদের সেই সম্ভ্রান্ত পরিবারে সে সুখে শান্তিতে থাকবে। নইলে, সে এখানে খুবই কষ্ট পাবে।'

সালমা বললেন ঃ 'তার বিহনে আমি বাঁচব কেমনে ? কিন্তু আমি এটাও চাইনা যে, সে তার সম্মানিত আত্মীয়-পরিজন থেকে দূরে থাকুক। তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ, সে কী বলে ?'

জিজ্ঞাসিত হলে শওবা চাচা মুত্তালিবকে বললঃ 'মায়ের অনুমতি ছাড়া আমি যেতে পারব না।'

সালমা মুত্তালিবের পীড়াপীড়িতে নিজের সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণাকে পাথর চাপা দিয়ে কলিজার টুকরো সন্তানকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। মুত্তালিব সালমার বাড়িতে তিন দিন অবস্থানের পর চতুর্থ দিনের মাথায় শওবাকে নিয়ে মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। শওবা তখন আট বছরের বালক।

দুজনে একই উটের পিঠে সওয়ার হলেন। মুত্তালিব আগে শওবা পিছে। মক্কায় পৌঁছালে লোকেরা মনে করল এ বালক মুত্তালিবের ক্রীতদাস। কোন স্থান থেকে তাকে কিনে নিয়ে এসেছেন। কাছে আসতেই লোকজন শোরগোল তুলল। সমস্বরে বলল ঃ 'ঐ দেখ মুত্তালিব গোলাম কিনে এনেছেন, তোমরা মুত্তালিবের গোলাম দেখেছো ? দেখ, মুত্তালিবের গোলাম দেখ।'

মুত্তালিব এসব শোরগোল শুনে বললেন–'কুরাইশবৃন্দ! তোমরা তো আজব লোক!! এ আমার ভাইপো। আমার বড় ভাই হাশিমের পুত্র। ইয়াসরিবে মামার বাড়িতে ছিল। সেখান থেকে তাকে নিয়ে এসেছি।'

কিন্তু মুত্তালিবের কথায় তেমন কাজ হল না। লোকমুখে ছড়িয়ে গেল যে, সে মুত্তালিবের গোলাম। আসল নাম চাপা পড়ে গেল। মা নাম রেখেছিলেন শওবা। কিন্তু সে নামে তাকে আর কেউ চিনল না। সেই থেকে তিনি হয়ে গেলেন আবদুল মুত্তালিব অর্থাৎ মুত্তালিবের গোলাম!

৪

মুত্তালিবের মৃত্যুর সময় আবদুল মুত্তালিব একজন দায়িত্বশীল যুবক হয়ে উঠেছিলেন। চাচার অবর্তমানে তাঁর যাবতীয় কাজ-কর্ম পূর্ণরূপে সম্পন্ন করার মতো যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। চাচার অবর্তমানে তিনি তাঁর সমস্ত কার্যভার নিজহাতে তুলে নিলেন। 'সিকায়া' ও 'রিফাদা'র পূর্ণ দায়িত্ব তিনি আঞ্জাম দিতে লাগলেন।

মক্কার জনবসতিপূর্ণ এলাকায় কোনো কূপ ছিল না। দু'একটা যা ছিল তা ছিল মক্কা থেকে বেশ দূরে। তা-ও তা ছিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সেখান থেকে পানি বয়ে এনে কাবা শরীফের কাছে নির্মিত হাউজগুলোতে তা সংরক্ষণ করা হত। প্রত্যেক দিন হাউজ ভর্তি করা হত। প্রত্যেক দিন হাউজ ভর্তি করা আর তা

সাফাই করা ছিল খুবই সমস্যা। এর ফলে, নানা অসুবিধা দেখা দিত। আবদুল মুত্তালিব এ সমস্যা দূরিকরণের উপায় খুঁজতে লাগলেন।

মক্কার জমজম কূপ সম্পর্কে প্রসিদ্ধি ছিল যে, তার পানি খুবই সুস্বাদু এবং সে কূপ কখনো শুকাত না। তা ছিল পানির অফুরন্ত উৎস। এতে কোনো রকমের অসুবিধা বা সমস্যা দেখা দিত না। একথা আবদুল মুত্তালিবের স্মরণে আসামাত্র তিনি তার খোঁজ-খবর নিতে শুরু করলেন।

লোকদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ

'জমজম কূপ কোন স্থানে আর কার দায়িত্বে ছিল ?'

জবাব এলো ঃ 'প্রথমে তা ছিল জুরহাম গোত্রের অধীন।

তাদের শেষ রাজাও ছিল জুরহাম গোত্রের লোক। তাদের শেষ রাজা ছিল জুরহামী। তারা যখন জমজম কূপ রক্ষণাবেক্ষণে শিথিলতা দেখাতে থাকে তখন খুজাআ গোত্রের লোকেরা তা অধিকার করার চেষ্টা করতে থাকে। এই বনু খুজাআ গোত্র ছিল জুরহাম গোত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী। তারা জুরহামদের উৎখাত করার চেষ্টা করল। ফলে, যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল। জুরহাম গোত্র পরাজিত হয়ে এখান থেকে চলে যায়। যাওয়ার আগে কাবা শরীফে প্রদত্ত সমস্ত সহায়-সম্পদ ঐ জমজম কূপে ফেলে দিয়ে তারা তার উৎসমুখ বন্ধ করে সমতলভূমির সমান করে দিয়ে তারা চলে যায়।

আবদুল মুত্তালিব বললেন ঃ 'যতদিন পর্যন্ত মাটি খুঁড়ে আমি ঐ জমজম কূপের সন্ধান না পাব, ততদিন আমার শান্তি নেই।' এক রাতে তিনি চিন্তিত চিত্তে ঘুমিয়ে ছিলেন। সেই ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে আওয়াজ পেলেন— 'জমজম কূপ খনন কর।'

এই গায়েবী আওয়াজ অনবরত আসতে লাগল। এর ফলে, তাঁর শক্তি ও সাহস বেড়ে গেল।

তারপর খননকাজ শুরু হল। কিন্তু এ কাজ মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। কঠোর পরিশ্রমের সাথে খনন চলল।

তারপর এক সময় শ্রম সার্থক হল। পুরাতন কূপের বুক চিরে কুলকুল করে পানি বেরিয়ে এল।

জমজম কূপের মধ্যে মুজাজের তরবারিগুলিও পাওয়া গেল। তা কাবা ঘরের দরজায় লটকে রাখা হল। বিনিময়ে অনেক নজরানা এলো। এই নজরানার মধ্যে দুটি সোনার তৈরি হরিণও ছিল।

আবদুল মুত্তালিব সেই তরবারিগুলো দিয়ে কাবা ঘরের দরজা নির্মাণ করলেন এবং কাবার শোভাবর্ধনের জন্য সোনার হরিণ দুটি দরজায় লটকে দিলেন।

জমজম কূপ খননের সাফল্যে আবদুল মুত্তালিব অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সমস্ত তনমনপ্রাণ আনন্দ ও খুশিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সে সময় পর্যন্ত তাঁর একটাই মাত্র পুত্রসন্তান জন্মলাভ করেছিল। তিনি তার নাম রেখেছিলেন হারিস। জমজমকূপের সাফল্যে অভিভূত কৃতজ্ঞচিত্ত আবদুল মুত্তালিব আল্লাহর কাছে মান্নত করলেন ঃ 'হে আল্লাহ! তুমি যদি আমাকে দশটি পুত্রসন্তান দান কর এবং তারা যদি সুস্থভাবে সহী সালামতে বেঁচে থেকে আমার কাজে আসে তাহলে একটি পুত্র আমি তোমার উদ্দেশে কুরবানি করে দেবো।'

আবদুল মুত্তালিবের এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল। আল্লাহ তাঁকে দশটি পুত্রসন্তান দান করলেন। সবাই যুবক হয়ে উঠল। সবাই তাঁর কাজে এলো।

এবার তাঁর মান্নত পুরো করার পালা। আবদুল মুত্তালিব তাঁর পুত্রদের ডেকে এ কাহিনী বর্ণনা করলেন। ছেলেরা বললেন ঃ 'আব্বাজান! আমরা সবাই মনে প্রাণে আপনার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রস্তুত। যাকে ইচ্ছা তাকেই কুরবানি করুন।'

স্নেহময় পিতা বললেন ঃ 'আচ্ছা, আলাদা আলাদা তীরে তোমাদের নিজ নিজ নাম লিখে আন।'

সবাই তাই করে পিতার কাছে হাজির হলেন।

আবদুল মুত্তালিব সেই তীরগুলো নিয়ে কাবা শরীফ সমীপে উপস্থিত হলেন। সেখানে ফাল নির্ণয়কারীর (গণক) সাথে কথা বলে তার হাতে সেই তীরগুলো দিয়ে বললেন–আপনি বলে দিন কাবার মূর্তিদের সর্দার 'হুবুল' দেবতার কোন নামটি পছন্দ ?

সে যুগে মক্কায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার পূর্বে তীরের মাধ্যমে গণৎকারের কাছ থেকে ফলাফল নির্ণয়ের পরামর্শ নেয়ার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। মহন্ত অথবা পুরোহিত বিশেষ নিয়মে দেবতাদের সামনে সেই তীর ওলট-পালট করতেন। যখনই কোনো তীর দেবতার মুখ বরাবর হত তখনই তাকে দেবতার পছন্দ বলে বিবেচনা করে সেই অনুযায়ী কাজ করা হত।

মহন্ত আবদুল মুত্তালিবের তীর এই নিয়মে হুবুলের কাছে পরীক্ষা করলে দেখা গেল, কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ্‌র নাম উঠল।

আবদুল্লাহ ছিলেন মুত্তালিবের সবচেয়ে আদরের সন্তান। ভাইদেরও সকলের প্রিয় ছিলেন আবদুল্লাহ। কিন্তু এখন উপায় ? আবদুল মুত্তালিব খুবই চিন্তিত হলেন। কিন্তু 'হুবুল' দেবতার পছন্দের পুত্র আবদুল্লাহকে কুরবানি করা ছাড়া আর কোনো উপায় খুঁজে পেলেন না।

নিরুপায় আবদুল মুত্তালিব বড় আদরের কনিষ্ঠ সন্তান আবদুল্লাহ্‌র হাত ধরে জমজম কুপের কাছে নিয়ে এলেন। সেখানেই ছিল বলিকাঠ। কারো কোনো

কুরবানি করার প্রয়োজন হলে সেখানে নিয়েই তা করা হত। আবদুল মুত্তালিব কর্তৃক পুত্র আবদুল্লাহর কুরবানির খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল সারা মক্কা নগরে। শোনামাত্রই লোকজন বলিদান-কেন্দ্রের দিকে পড়িমরি করে ছুটে আসতে লাগল। দেখতে দেখতে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেল সেখানে। তখন সম্মিলিত জনতার মুখে একটাই বাক্য উচ্চারিত হতে লাগল–'না না আবদুল মুত্তালিব! কখনোই এ কাজ কোরো না। কোনো অবস্থাতেই আবদুল্লাকে বলি দিয়ো না।'

আবদুল মুত্তালিব এক অদ্ভুত দুরবস্থার মধ্যে পড়ে গেলেন। বললেন ঃ 'আমি তো মান্নত পুরো করছি। মান্নত তো অবশ্যই পুরো করতে হবে ! এ ছাড়া আমি কি করব ?'

জবাব এলো ঃ 'প্রাণের বিনিময়মূল্য দিতে রাজি আছি। উট কুরবানি করলেও যদি মান্নত পুরো হয় তাহলেও প্রস্তুত আছি।'

লোকজন দীর্ঘক্ষণ ধরে চিন্তা করতে লাগল। আপসরফা করার চেষ্টায় সবাই হয়রান হয়ে গেলেন কী মূল্য নির্ধারণ করা যায় ?

অবশেষে সিদ্ধান্ত হল ইয়াসরিবের কাছে একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী আছেন। এ বিষয়ে তাঁর পরামর্শ মোতাবেক কাজ করা যেতে পারে। সমস্যা সমাধানে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। চলো, আমরা তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করি।

সে ছিল এক মহিলা জ্যোতিষী। লোকজন তার কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল। সবকিছু শোনার পর জ্যোতিষী প্রশ্ন করল–'কোনো কয়েদী কিংবা কোনো অপরাধীকে মুক্ত করার জন্য কী পরিমাণ প্রাণমূল্য নির্ধারণ করা হয় ?'

লোকেরা বলল ঃ 'দশ উট।'

জ্যোতিষী বলল ঃ 'দশ উট ও আবদুল্লাহর নামে লটারি করো। যদি উটের নামে কাগজ উঠে আসে তাহলে ঠিক আছে ; যদি না ওঠে তাহলে তার সংখ্যা হবে কুড়িটি উট। পুনরায় আবদুল্লাহর নাম উঠলে আরো দশ উট বাড়িয়ে দাও। এভাবে বাড়াতে থাকো। এরই মধ্যেই প্রভু সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।'

লোকেরা তাই-ই করল। দশ উট ও আবদুল্লাহর নামে লটারি চড়ালে আবদুল্লাহর নাম উঠল, দশ বাড়ানো হল। আবার আবদুল্লাহর নাম উঠল, আবার দশ বাড়ানো হল। আবার চড়ানো হল আবার আব্দুল্লাহর নাম বার বার বেরুতে লাগল। এদিকে আবদুল মুত্তালিব মশগুল হয়ে আল্লাহর উদ্দেশে দু'হাত তুলে দোয়া করতে লাগলেন–'হে আল্লাহ! প্রাণের বিনিময়ে প্রাণমূল্য কবুল করে নাও। আবদুল্লাহর প্রাণ দান কর প্রভু!' বাড়তে বাড়তে একশ' উটের নাম উঠল। এদিকে তাঁর দোয়া সার্থক হল ওদিকে আবদুল্লাহর বদলে উটেরও নাম উঠল। লোক আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল। সবাই মিলে আব্দুল মুত্তালিবকে মুবারকবাদ জানাতে লাগল–'অভিনন্দন আবদুল মুত্তালিব! অভিনন্দন। আল্লাহ তোমার পুত্রের প্রাণমূল্য কবুল করে নিয়েছেন।'

কিন্তু তবুও আবদুল মুত্তালিব নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। আরো দু'বার লটারি চড়ালেন যাতে কোনো সন্দেহ না থাকে। আল্লাহ্‌র কী ইচ্ছা তা স্পষ্ট হয়ে যাক। নাঃ ঠিক আছে। দু'বারই উট উঠল। আর কোনো সন্দেহ রইল না। পুরোমাত্রায় নিশ্চিত হয়ে তিনি একশ' উট কুরবানি দিলেন। এভাবে আল্লাহ আবদুল্লাহ্‌র জীবন কবুল করে নিলেন।

৫

আবদুল্লাহ ছিলেন উজ্জ্বল মুখশ্রীসম্পন্ন অতি সুন্দর উদীয়মান এক যুবক। তাঁর সারা অঙ্গে যেন চাঁদের সৌন্দর্য ঝরে পড়ত। মুখটা ছিল চাঁদের মত সুন্দর ও আলোকিত। তাঁর সৌন্দর্যে মানুষ বিমোহিত হয়ে যেত। তিনি ছিলেন অগণিত তরুণীর স্বপ্নের পুরুষ।

তাঁর মান্নতের ঘটনা ছিল ঘরে ঘরে চর্চার বিষয়। এর ফলে, তাঁর মানমর্যাদা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। অনেক তরুণী তাঁকে বিয়ে করে জীবন সার্থক করার কথাও প্রকাশ করলেন। চেষ্টাও কম হল না। কিন্তু এ সৌভাগ্য লাভ করা কী যা তা ব্যাপার ? সে সৌভাগ্যের অধিকারিণী তো একজনই হবেন!

তাঁর পুত্রের মা কে হবেন তা-ও ছিল খোদা-নির্দিষ্ট। তাঁর বিয়ে হবে আমিনা নাম্নী এক বিদূষী তরুণীর সাথে। তিনি ছিলেন কুরাইশকুলের এক সম্মানিত নারী। তিনি বনী জোহরা গোত্রের এক সরদারের কন্যা ছিলেন।

পিতা আবদুল মুত্তালিব তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্‌র জন্য বিয়ের পয়গাম পাঠালেন। আমিনার পরিবার তা এক পরম সৌভাগ্যজ্ঞানে গ্রহণ করলেন। শুভক্ষণে শুভ পরিণয় সম্পন্ন হল। সে যুগে রেওয়াজ ছিল বিয়ের পরে বর শ্বশুরবাড়িতে তিনদিন থাকবেন। আবদুল্লাহ্‌ও থাকলেন। তারপর বাড়ি ফিরলেন। নববধূও সেইসাথে গৃহে পদার্পণ করলেন। সে সময় আবদুল্লাহ্‌র বয়স ছিল সতেরো বছরের কাছাকাছি।

বিয়ের পর কিছুদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এরপর মক্কার ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য-কাফেলা নিয়ে আবার সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেল। সেই সাথে আবদুল্লাহ্‌ও গেলেন। ফেরার পথে তিনি মদীনায় গেলেন। এখানে তাঁর পিতার নানার বাড়িও। এখানে তিনি কিছুদিনের জন্য রয়ে গেলেন। দুর্ভাগ্যবশত এখানে তিনি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হ'লেন। তাঁর সঙ্গীসাথীরা তাঁকে রেখে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেল। সেখানে পৌঁছে তাঁর পিতাকে তারা আবদুল্লাহ্‌র অসুখের খবর জানিয়ে দিলেন।

আবদুল মুত্তালিব তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্রের পীড়ার খবর শুনে খুবই উদ্বিগ্ন চিত্তে জ্যেষ্ঠ পুত্র হারিসকে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য হারিস তাকে সেবা-সুশ্রুষা করে সুস্থ করে তুলে বাড়ি নিয়ে আসবেন। কিন্তু বড়ই আফসোস ---! হারিস

মদীনায় গিয়ে আবদুল্লাহ্‌কে আর পেলেন না। আর তাঁকে মক্কায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হল না। কিছুদিন আগেই আবদুল্লাহর ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছিল। প্রিয়পুত্রকে দেখে পিতা আবদুল মুত্তালিব আর চোখ জুড়াতে পারলেন না। পুত্রবধূ আমিনা তাঁর প্রিয়তম স্বামীকে চিরকালের জন্য হারালেন। দুঃসহ শোকসংবাদে সকলেই আহত হয়ে পড়লেন। কিন্তু কী করা যাবে ? সবাইকে শোকসাগরে ভাসিয়ে আবদুল্লাহ চিরকালের জন্য জীবনের পরপারে পাড়ি দিলেন।

মাটির দেহ মাটিতেই মিশে গিয়েছে। স্নেহময় পিতা, পরম বিশ্বাসী জীবনসঙ্গিনী, মাতৃ-পিতৃভূমি মক্কা– সবাইকে পিছনে রেখে চিরকালেন জন্য চলে গেলেন আবদুল্লাহ। প্রাণপ্রিয় ভাইকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে হারিস তাঁর পিতার কাছে মৃত্যুসংবাদ বয়ে নিয়ে এলেন।

কে জানত যে, এই যাত্রাই হবে তাঁর জীবনের সর্বশেষ যাত্রা? যেখানে তাঁকে বাঁচানোর উপায় খুঁজতে ভাই হারিস মদীনায় রওয়ানা দিলেন সেখানে মৃত্যুর ফিরিশতা তাঁর জন্য মৃত্যুর অমৃত পেয়ালা নিয়ে উপস্থিত হলেন। মদীনা— যেখান থেকে লোকেরা আবদুল্লাহ্‌র শান্তিময় জীবনের শুভেচ্ছাবার্তা বয়ে নিয়ে এসেছিলেন, সেখান থেকেই তারা তাঁর দুঃখজনক মৃত্যুখবর বয়ে নিয়ে এলেন।

এ খবর ছিল বড়ই মর্মপীড়াদায়ক। নব-যুবক পুত্রের অকাল মৃত্যু! তাও আবার আবদুল্লাহর মতো যুবক! এ খবর যে-ই শুনল সেই শোকাহত হল। আবদুল্লাহ তো নতুন জীবন পেয়েছিলেন। লটারিতে তাঁর জীবন রক্ষা পাওয়ার জন্য ছোট বড় সকলেই খুশি হয়েছিলেন। আবার তাঁর হঠাৎ মৃত্যুতে সে খুশি শোকের সাগরে ভেসে গেল। সমস্ত মক্কাভূমি স্তব্ধ হয়ে গেল। সর্বত্রই শোকের ছায়া নেমে এল।

বৃদ্ধ আবদুল মুত্তালিবের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। শোকে -দুঃখে-বেদনায় তার তন-মন-প্রাণ যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল! এখন এ শোকে ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া আর কী উপায় ?

আর আমিনা ? তাঁর সে দুঃখ কী ভাষায় প্রকাশ করা যায় ? মরুদ্যানের মতো সুন্দর সজীব প্রাণবন্ত জীবন মরুভূমির মতো বিরান হয়ে গেল! তাঁর জীবনাকাশ যেন নিরাশার কালো মেঘে ছেয়ে গেল। জীবনের সব স্বপ্ন যেন মাটিতে মিশে গেল। সমস্ত স্বপ্ন-সাধ, আশা-আকাঙ্ক্ষা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। মনের আশা মনের মধ্যেই চিরকালের জন্য হারিয়ে গেল। কাল যে মেয়েটি ছিলেন কুরাইশ সুন্দরীদের ঈর্ষার পাত্র, আজ তিনি হয়ে গেলেন সবার করুণার পাত্র! যে শির একদা সবার মধ্যে সম্মান ও মর্যাদায় হয়ে উঠেছিল পরম সমুন্নত, শোক ও দুঃখভারে সেই শির আজ বড়ই আনত।

আব্দুল্লাহর ইন্তেকালের সময় আমিনা ছিলেন গর্ভবতী। আল্লাহর কী অসীম কুদরত! কিছুদিন আগে হুবুল দেবতার উদ্দেশে যখন তাকে বলি দেওয়া হচ্ছিল তখন তাঁকে তিনিই রক্ষা করেছিলেন। সে সময়ে তাঁর কাছে আল্লাহর এক মহান আমানত সুরক্ষিত ছিল। তা ছিল মানবতার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। যতদিন পর্যন্ত তা তাঁর কাছে সুরক্ষিত ছিল ততদিন তাঁর জীবনও সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু তা পরে আমিনাকে সোপর্দ করা হল।

আবদুল্লাহ্‌র কাছ থেকে আমানত আমিনার কাছে সুরক্ষিত হওয়ার পর আল্লাহ আবদুল্লাহকে সে দায় থেকে মুক্ত করে তাঁকে উঠিয়ে নিলেন। এখন আর কোনো ফিদ্ইয়া বা প্রাণমূল্যের প্রয়োজন ছিল না। ললাটের লিখন ছিল সুনির্দিষ্ট, সুলিখিত। তার অন্যথা হওয়ার উপায় ছিল না।

৬

১২ ই রবিউল আউয়াল সোমবার আমিনার কোল আলো করে এক শিশু জন্মগ্রহণ করল।

সোনার টুকরো শিশু। চাঁদের সৌন্দর্যও তার কাছে হার মানে। আমিনা তাঁর শ্বশুর আবদুল মুত্তালিবকে এ সুসংবাদ পাঠালেন। এ খবর শুনে আবদুল মুত্তালিব ছুটে এলেন। নবজাত শিশুকে দেখে তাঁর হৃদয়-মন-প্রাণ স্বর্গীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তাই বা হবে না কেন ? এ যে আবদুল্লাহ্‌র পুত্র!

পরমানন্দে তিনি সেই শিশুপুত্রকে বুকে তুলে নিলেন। কপালে-মুখে চুমো খেলেন। তারপর তাঁকে নিয়ে কাবা শরীফে গিয়ে পৌঁছালেন। তাঁকে নিয়ে কাবা শরীফ তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করলেন এবং নাম রাখলেন মুহম্মদ (সাঃ)।*

'মুহম্মদ' শব্দের অর্থ প্রশংসনীয়। সবাই যাকে পছন্দ করে, সবাই যাকে ভালো বলে।

জন্মের সপ্তম দিনে আবদুল মুত্তালিব উট কুরবানি করে সকল কুরাইশকে দাওয়াত (নিমন্ত্রণ) করলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নিমন্ত্রিতদের মধ্য থেকে একজন বললেন–'আবদুল মুত্তালিব! কী মনে করে আপনার নাতির নাম মুহম্মদ রাখলেন ? বংশগত কোন নাম রাখলেন না কেন ?'

তিনি বললেন–'আমি চাই স্বর্গমর্ত্য জুড়ে সর্বত্রই তার প্রশংসা হোক। এমন কী স্বয়ং স্রষ্টাও তার প্রশংসা করুন।'

সম্ভ্রান্ত কুরাইশকুলের রীতি ছিল মায়েরা তাঁদের সন্তানদের নিজেরা দুধ খাইয়ে মানুষ করতেন না। গ্রামাঞ্চল থেকে দাইরা এসে শিশু-সন্তানদের নিয়ে

---

* *এই নাম উচ্চারণ ও শ্রবণের সাথে সাথে পবিত্র দুরূদ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়া অবশ্যকর্তব্য।*

গিয়ে নিজেদের দুধ খাইয়ে তাদের বড় করে তাদের মায়েদের কোলে আবার ফিরিয়ে দিয়ে যেতেন। আবার তারা নতুন বাচ্চা নিয়ে যেতেন। যুগ যুগ ধরে এই রীতিনীতি প্রথা সে সমাজে প্রচলিত ছিল। এর ফলে, বাচ্চারা খুব মোটা-সোটা ও স্বাস্থ্যবান হত। তাছাড়া, শিশুরা ভালমতো আরবি ভাষাও রপ্ত করে নিত। দাইদের বাচ্চা নিতে আসার মওসুম অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। মুহম্মদের জন্মের সময় কোন দাই পাওয়া যায়নি। আবদুল্লাহর এক ভাইয়ের নাম ছিল আবু লাহাব। সুওয়াইবা নামে তার এক দাসী ছিল। দু'তিন দিন যাবৎ আমিনা তাঁর কোলের সন্তানকে দুধ খাইয়ে তাঁকে সুওয়াইবার দায়িত্বে অর্পণ করেন। কথা ছিল যতদিন দাই পাওয়া না যাবে ততদিন সুওয়াইবা তাঁকে দুধ খাওয়াবেন।

সুওয়াইবার কিছুদিন দুধ পান করানোর মধ্যেই বনী সা'দ গোত্রের দাইরা মক্কায় এসে গেল।

দাইয়েরা শিশুর সন্ধানে ফিরতে লাগল। তারা ঘরে ঘরে গিয়ে বাচ্চার মায়েদের সেবা-সুশ্রূষা করত। যে মায়ের যে দাইকে পছন্দ হত সে মা সেই দাইয়ের হাতে তাঁর শিশু সন্তানকে অর্পণ করতেন।

সব মায়েরাই পছন্দমতো দাইদের কাছে তাঁদের সন্তানদের অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন। বাকি রইল শুধু একটি মাত্র দাই। তাকে কেউ পছন্দ করল না ; কেননা, সে ছিল কিছুটা কমজোর ও দুর্বল। গরীবও ছিল যথেষ্ট। তিনি ছিলেন আবু জুয়াইবের কন্যা হালিমা।

সবশেষে একটি মাত্র বাচ্চাই রয়ে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন আবদুল্লাহর পুত্র মুহম্মদ (সাঃ)।

মুহম্মদ (সাঃ) ছিলেন পিতৃহীন এক এতীম শিশু। সে জন্য তারা তাঁকে নেওয়ার ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখায়নি। তাঁকে লালন-পালনের মধ্যেও তারা কোন লাভ দেখেনি। মনে করেছিল তাঁকে দুধ খাওয়ানো বেকার। তারা ভাবল, এ রকম এতীম বাচ্চা নিয়ে কী লাভ ? তার দাদা এর বিনিময়ে আমাদের কী দেবেন ? তার মা-ই বা আমাদের কী দিতে পারেন ?

এবার ঘরে ফেরার পালা। দাইয়েরা যার সেই ঘরে ফিরে চলল। তাদের সবার কোলে একটা করে বাচ্চা। সেজন্য স্বাভাবতই তারা খুব খুশি।

হালিমার স্বামী তাঁর সাথেই ছিলেন। হালিমা তাঁকে বললেন–'আল্লাহর কসম আমার ভীষণ দুঃখ পাচ্ছে। সমস্ত দাইয়েরা কোল ভরে বাচ্চা নিয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছে আর আমার কোল এখনো খালি। আমি যাই, ঐ এতীম বাচ্চাটাকেই নিয়ে আসি। খালি হাতে ফেরার চেয়ে একটা এতীম বাচ্চা নিয়ে ফেরাই ভালো।'

স্বামী বললেন ঃ 'যাও, নিয়ে এসো! এতে আর অসুবিধা কী ? হয়তো আল্লাহ আমাদের ওতেই অনুগ্রহ করবেন।'

হালিমা বাচ্চা নিতে আমিনার কাছে গিয়ে পৌঁছালেন। আমিনার মনেও বড় দুঃখ ছিল যে, তাঁর অন্যান্য বান্ধবীদের বাচ্চাদের দাইয়েরা হাতে হাতে নিয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর কলিজার টুকরো সন্তানটির খোঁজ খবর কেউ নিল না। হালিমা তাঁর সন্তানকে নিলে আমিনা খুব খুশি হলেন। আনন্দে তাঁর মনপ্রাণ ভরে উঠল।

হালিমা শিশু মুহম্মদকে বুকে ধরে তাঁর শুকনো স্তন মুখে ধরলেন। তাতে নামমাত্র দুধ ছিল।

কিন্তু ---- কী আশ্চর্য ব্যাপার যে, তাতে মুখ দেওয়ার সাথে সাথে দুধের স্রোত জারি হয়ে গেল। দুধে বুক ভরে উঠল। দুধের স্রোতে বাচ্চার মুখ ভিজে যেতে লাগল। এসব দৃষ্টে হালিমার বিস্ময়ের অবধি রইল না।

মুহম্মদ (সাঃ)-এর পেট ভরার পর হালিমা তাঁর নিজের বাচ্চাকেও প্রাণ ভরে দুধ খাওয়ালেন। অথচ ইতিপূর্বে তাঁর নিজের সন্তানেরই পেট ভরত না। দুধ খেয়ে সে কখনই সুতৃপ্ত হত না। বুকের মধ্যে মুখ ঘষে আরো বেশি দুধ পাওয়ার চেষ্টা করত।

হালিমার এক গাভীন উট ছিল। একেবারেই হাল্কা-পাতলা, দুর্বল। খিদে পেলে হালিমার স্বামী তাকে দোহন করতে শুরু করলেন। বিস্ময়কর ব্যাপার। যে বাঁট সদা-সর্বদা শুকনো থাকত, তা দুধে ভরে গেল। তা থেকে টপ টপ করে দুধ পড়তে লাগল। হালিমার স্বামী তা পান করলেন। হালিমা নিজেও পান করলেন। প্রাণ ভরে পান করলেন। পরম পরিতৃপ্তিতে তন-মন-প্রাণ ভরে উঠল। রাত হলে আগে দুই বাচ্চাকে শুইয়ে দিয়ে তারপর দুজন শুয়ে পড়লেন। পরিপূর্ণ ও পরিতৃপ্ত নিদ্রায় দু'জনে বেঘোর হয়ে গেলেন।

সকাল হলে হালিমার স্বামী বললেন ঃ 'হালিমা! আল্লাহর কসম, তুমি এক পবিত্র সন্তান পেয়েছ। তোমার কী মনে হয় ?'

হালিমা বললেন–'আল্লাহর কসম, আমারও তাই মনে হয়।' দাইদের কাফেলা ঘরে ফিরে চলল। হালিমার গাধা সকলের আগে আগে হেঁটে চলল। সাথের দাইয়েরা তা দেখে বলল–'আহা রে, ও জুয়াইবের মেয়ে, একটু দাঁড়াও না, আমাদেরও সাথে করে নাও। আরে, ও তো সেই গাধাটি, যাতে চড়ে তুমি এসেছিলে। সে তো রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে থেমে যাচ্ছিল। বার বার তুমি পিছিয়ে পড়ছিলে!'

হালিমা পরমানন্দে বললেন ঃ হাঁ, হাঁ, আল্লাহর কসম, এ তো সেই গাধাটিই।

সাথীরা বললেন ঃ 'আল্লাহর কসম, এ তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার!'

৭

হালিমার বাড়িতে এখন অনবরত অনুগ্রহ বর্ষিত হতে লাগল। সমস্ত কিছুতেই বরকতের প্রকাশ ঘটতে লাগল। বাড়ির পোষা প্রাণীরা মোটাতাজা হয়ে উঠল। গাভীন প্রাণীর স্তন দুধে ভরে উঠল।

দেখতে দেখতে দু'বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। আমিনার পুত্র হালিমার দুধ পান করে বেড়ে উঠতে লাগল। শীমা নামে হালিমার এক কন্যা ছিল। শীমা তাকে কোলে নিয়ে আদর করে। উদার উন্মুক্ত মরু প্রান্তরের খোলা হাওয়ায় বেড়ে ওঠে মুক্ত স্বাধীন জীবন। শিশু মুহম্মদ বেড়ে উঠতে লাগলেন। সুন্দর স্বাস্থ্যবান ও পাকাপোক্ত হয়ে বেড়ে উঠছেন তিনি।

দুধ খাওয়ার দিন শেষ হয়ে এলো। এবার মায়ের ছেলের মায়ের কোলে ফেরার পালা। ঘরের ছেরে ঘর আলো করে ঘরের শোভা বর্ধন করবেন।

কিন্তু প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা এ বরকতময় শিশুপুত্রের বিচ্ছেদ হালিমা সহ্য করবেন কীভাবে ? এ শিশু তো দয়ার প্রতিমূর্তি, সুখের সাধন আর সৌভাগ্যের প্রতীক। কোনো প্রকারেই তাঁকে ত্যাগ করার জন্য তিনি প্রস্তুত নন। তাঁর ইচ্ছা যে, এ পুণ্যাত্মা শিশুর কল্যাণে তাঁর গরীবের সংসারে বরকতের ধারা অব্যাহত থাকুক!

তিনি শিশু মুহম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে তাঁর মায়ের কাছে চললেন। তাঁর মনের ইচ্ছা যে, তাঁর মায়ের অনুমতিতে শিশু মুহম্মদ (সাঃ)-কে তাঁর কাছে আরো কিছুদিন রাখবেন।

আমিনার কাছে এসে বললেন ঃ 'আমার ভয় হয় যে, মক্কায় এ খারাপ আবহাওয়ায় মুহম্মদকে রেখে দিলে তাঁর কোন ক্ষতি হতে পারে। সে কথা বিবেচনা করে তাকে আরো কিছুদিন আমার কাছে রাখার অনুমতি দিন। আরো একটু বড় হোক। তারপর আমি তাকে ঠিক সময়ে দিয়ে যাব।' হালিমা আমিনার কাছে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। বার বার একই কথা বলতে লাগলেন। তাঁকে বোঝাতে লাগলেন। মক্কার খারাপ আবহাওয়ার দোহাই দিতে লাগলেন।

অবশেষে আমিনা রাজি হলেন। যারপরনাই খুশিতে হালিমার মনপ্রাণ ভরে উঠল। তিনি শিশু মুহম্মদকে নিয়ে আবার বাড়ি পানে রওয়ানা হলেন।

মুহম্মদ (সাঃ) আবার সেই দিগন্ত বিস্তৃত প্রকৃতির কোলে ফিরে এলেন। সেই খোলা মাঠ, প্রান্তর, মরুভূমি, বালির পাহাড়, স্বচ্ছ পাথরের টুকরো। সেই প্রান্তরে সাথীদের সাথে তিনি খেলা করেন। এসব স্বচ্ছ পাথর ছিল তাঁর প্রিয় খেলার সামগ্রী। তাই নিয়ে তিনি খেলেন। অপটু পায়ে দৌড়-ঝাঁপ করেন।

দেখতে দেখতে মুহম্মদ (সাঃ) এর বয়স পাঁচ বছর পূর্ণ হয়ে গেল।

মুহম্মদ (সাঃ) এর আবার মায়ের কাছে ফিরে যাবার সময় হল। হালিমার সাথে আবার বিচ্ছেদের সময় এসে গেল।

মুহম্মদের প্রতি হালিমার অপরিসীম স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। নিজের কলিজার টুকরো সন্তানের চেয়ে তা কিছুমাত্র কম ছিল না। তিনি হয়ে উঠেছিলেন তাঁর নয়নের পুত্তলি ও কলিজার টুকরো। হালিমাকেও তিনি মায়ের মতো দেখতে

অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর প্রতি গড়ে উঠেছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। নবী (সাঃ) হওয়ার পরও হালিমা যখন তাঁর কাছে আসতেন, তখন তিনি শিশুর মতো সরল ও সশ্রদ্ধ চিত্তে বলতেন–'আমার মা এসেছেন, আমার মা এসেছেন।' মা বলতে তিনি যেন পাগল হয়ে যেতেন।

মুহম্মদ (সাঃ) কে ত্যাগ করা হালিমার জন্য ছিল এক মর্মপীড়াদায়ক ব্যাপার। কিন্তু তা হলেও কী হবে ? বাস্তবকে তো মেনে নিতে হবে। বাড়ি তো তাঁকে পৌঁছে দিতেই হবে। আর রাখা তো সম্ভব ছিল না।

আরো একটা ব্যাপার ঘটেছিল, যে কারণে তিনি তাঁকে নিজের কাছে রাখতে সাহস পাচ্ছিলেন না। দ্রুত মায়ের কাছে পৌঁছে দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

একদিন তিনি বসে ছিলেন। সাথে মুহম্মদ (সাঃ) ও ছিলেন। সে সময় হাবশার কয়েকজন খ্রিস্টান সন্ন্যাসী সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। শিশু মুহম্মদ (সাঃ) কে দেখতে পাওয়া মাত্রই তারা দাঁড়িয়ে গেল। কাছে এসে তারা তাঁকে খুব মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগল। এক এক করে খোঁজ নিতে শুরু করল। তারা হালিমাকে জিজ্ঞেসও করল–'এ বাচ্চা কার ?'

তারপর তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল–'নাও, এ বাচ্চাকে আমরা নিয়ে যাই। এর মধ্যে মহাপুরুষের লক্ষণ স্পষ্ট। কালে সে একজন মহাপুরুষ হবে। আমরা বুঝতে পেরেছি এ ভবিষ্যতে কী হবে।'

হালিমা তাদের মতলব বুঝতে পারলেন। তাদের মনোভাব আর চক্রান্ত দেখে তিনি ঘবড়ে গেলেন। চিন্তা করলেন, যদি তারা কেড়ে নেয় ? যদি এসে তারা কেড়ে নিয়ে চলে যায় তাহলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে! তিনি আর বিলম্ব না করেই তাঁকে লুকিয়ে নিয়ে অতি দ্রুত সেখান থেকে চলে গেলেন।

তিনি কলিজার টুকরো বাচ্চাকে নিয়ে তাদের সামনে থেকে পালিয়ে যেতে পারবেন আশাও করতে পারেননি। তিনি ভীষণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমিনার সন্তান তিনি আমিনার কাছে পৌঁছে দিলেন। যাঁর ধন তাঁর কাছে সমর্পণ করেই তারপর তিনি শান্তি পেলেন।

৮

দাদার অভিভাবকত্বে ও মায়ের স্নেহমমতায় বেড়ে উঠতে লাগলেন শিশু মুহম্মদ। দু'জনেরই অপরিসীম স্নেহ মমতা ছিল মুহম্মদের প্রতি। দু'জনেই তাঁকে চোখে চোখে রাখেন। সর্বদাই তাঁর প্রতি নজর রাখেন। ইতিমধ্যেই তাঁর বয়স ছয় বছর পূর্ণ হল। এবার তাঁর মায়ের মনে ইচ্ছা জাগল মদীনায় গিয়ে স্বামী আবদুল্লাহর কবরটি দেখে আসতে। এবার তিনি মদীনায় চললেন। সাথে মুহম্মদকেও নিলেন। উম্মে আয়মান নামে তাঁর স্বামীর এক দাসী ছিল। সঙ্গে সেও

গেল। মদীনায় বনু নাজ্জার নামে এক বিখ্যাত গোত্র ছিল। মুহম্মদের দাদার মাতুলকুল ছিল ঐ কুলের সাথে সম্পর্কিত। আমিনা মদীনায় সেখানেই গিয়ে উঠলেন।

আমিনা মদীনায় পৌঁছে তাঁর কলিজার টুকরো সন্তানকে সেই ঘরটি দেখালেন যেখানে তাঁর পিতা আবদুল্লাহ মৃত্যু বরণ করেছিলেন। সে জায়গাও দেখালেন যেখানে তিনি পরম শান্তিতে নিদ্রা যেতেন।

নিষ্পাপ বালক মুহম্মদ (সাঃ) আজই সর্বপ্রথম অনুভব করলেন যে, তিনি এক পিতৃহীন এতিম বালক। পিতৃশোকে আজই তিনি জীবনে সর্বপ্রথম মুহ্যমান হলেন। বাপ হারানোর ব্যথা তিনি আজ প্রথম অনুভব করলেন।

মদীনায় এক মাস কাল অবস্থানের পর শিশুপুত্র মুহম্মদকে নিয়ে আমিনা মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

আমিনা পথিমধ্যে তাঁর স্বামীর সতোই গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হুজাইফা থেকে তেইশ মাইল দূরে আবওয়া নামক গ্রামে পৌঁছে তাঁর অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়ল। তাঁর ব্যাধি নিরাময়ের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। সেখানেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। ঐ স্থানেই তাঁকে সমাহিত করা হল। ভাগ্যের কী লিখন! আবদুল্লাহ্‌রও যেমন, আমিনারও তেমন পরদেশে পরবাসে মৃত্যু হল। একই ভাবেই তাঁদের কাফন-দাফন হল। নিজের গোত্র ও মাতৃভূমি কোথায় আর তাঁরা সমাহিত হলেন কোথায়।

তিনি আগে ছিলেন পিতৃহীন এতীম, এখন হলেন মাতৃ-পিতৃহীন এতীম। মা যতদিন ছিলেন ততদিন এতীম হওয়ার বেদনা অত তীব্রভাবে অনুভব করেননি। এবার মা-ও চলে গেলেন। এ শোক, এ ব্যথা রাখার জায়গা কোথায় ? বাপের কবর দেখেতে গিয়েছিলেন; ফেরার পথে মায়ের কবরও হতে দেখলেন।

এখন তিনি একা। মা ছিলেন, তখনো এতীম হওয়ার দুঃখ ছিল। এবার মা হারানোর সাথে সাথে তিনি একেবারেই একা হয়ে গেলেন। শোকের পরে শোক, দুঃখের পরে দুঃখ।

উম্মে আয়মান তাকে সাথে নিয়ে মক্কায় ফিরে এলেন। মাতৃ-পিতৃহারা বালক মুহম্মদ আজ বড়ই দুঃখাহত, বড়ই শোকাহত। এই দুঃখজনক ঘটনায় বৃদ্ধ আবদুল মুত্তালিব ভেঙে পড়লেন। মাতৃ-পিতৃহীন বালকের করুণ মুখ দেখে তাঁর প্রতি দরদ আর স্নেহ-ভালবাসায় তাঁর হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠল। তাঁর প্রতি স্নেহ-মায়ামমতা আগের চেয়ে বহুগুণ বেড়ে গেল। এবার তিনি আগের চেয়ে অনেক বেশি আদর-যত্ন করতে লাগলেন। স্নেহ-মমতায় তাঁর প্রাণ ভরে দিতে লাগলেন। সদাসর্বদাই তাঁর প্রতি লক্ষ্য রাখতে লাগলেন। বৃদ্ধ আবদুল মুত্তালিব মুহম্মদের প্রতি ভালোবাসায় শেষ পর্যন্ত পুত্রশোক ভুলে গেলেন।

আবদুল মুত্তালিব ছিলেন কুরাইশ কুলের নেতা। তিনি যখন কাবা ঘরের ছত্রছায়াতলে বসতেন তখন তাঁর আসন থেকে পুত্রেরা সম্মানবশত তাঁর চেয়ে কিছু দূরে অবস্থান করতেন। কিন্তু মুহম্মদ এলে তিনি তাঁকে কাছে ডেকে নিতেন। তিনি তাঁর আসনে তাঁকে বসিয়ে স্নেহভরে তাঁর গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেন। কিন্তু আফসোস! আবদুল মুত্তালিবও আর বেশিদিন স্নেহডোরে তাঁকে বেঁধে রাখতে পারলেন না। মুহম্মদ (সাঃ) এর যখন আট বছর বয়স তখন দাদা আবদুল মুত্তালিবও মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। দাদার মৃত্যুর পর তিনি আবারো শোকাহত হলেন। জন্মদাতা জনক ও স্নেহময়ী জননীকে হারানোর পর পরম স্নেহভরে যে দাদা তাঁকে এতদিন আগলে রেখেছিলেন, এবার সেই দাদাও চলে গেলেন। তিনি আবারো এতীম হলেন।

দাদা হারানোর শোক মা-বাপ হারানের শোকের চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। এখন তিনি আগের চেয়ে বেশি বোধশক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠেছেন। তাঁর চিন্তা-চেতনায়ও আগের চেয়ে বেশি গভীরতা এসেছে। স্নেহ-ভালবাসার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনেক বেশি বুঝতে শিখেছেন। করুণা ও স্নেহ-ভালোবাসার মূল্যও বুঝতে শিখেছেন। সেজন্য স্বজন হারানোর বেদনাও গভীরভাবে অনুভব করতে শিখেছেন। তাঁর হৃদয়সাগরে যেন শোকের তুফান বইতে লাগল।

চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা বইতে লাগল। শোক ও বেদনায় হৃদয়-মন-প্রাণ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। শোকে যেন বুক ভেঙে গেল। ইতিমধ্যেই দাদার প্রাণহীন দেহ অন্ধকার কবরে শুইয়ে দেয়া হল। মাতা ও পিতার ন্যায় স্নেহময় দাদাকেও চিরকালের জন্য বিদায় দিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফুটন্ত আলো

—আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যু, আবু তালিবের উত্তরাধিকার

—প্রথম সিরিয়া ভ্রমণ

—হযরত মুহম্মদের (সাঃ) আকর্ষণীয় লক্ষণসমূহ

—দ্বিতীয়বার সিরিয়া ভ্রমণ

—খাদিজার সাথে বিবাহ

—পবিত্র রূপ

—খাদিজার সাথে দাম্পত্য জীবন

—কাবাগৃহের নয়ানির্মাণ

—পরোক্ষ সহযোগিতা

—হানাহানির মুখে কুরাইশ সম্প্রদায়

—হযরত মুহম্মদের (সাঃ) আদর্শ চরিত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ফুটন্ত আলো

"(মুহম্মদ!) তিনি কি তোমাকে এতীমরূপে পাননি ? তারপর তিনি তোমাকে ঠিকানা প্রদান করলেন এবং তোমাকে সত্য পথ প্রদর্শন করলেন।"
—কুরআন।

এটাই তো প্রকৃত সত্য।

জনক-জননীর মৃত্যুর পরে মুহম্মদ আল্লাহর করুণার দৃষ্টি হতে বঞ্চিত হননি। তাঁর অনুগ্রহে তিনি এমন এক দাদা পেয়েছিলেন যিনি ছিলেন মাতা-পিতার মতোই স্নেহশীল। তারপর তিনি এমন এক চাচা পেলেন যিনি তাঁকে মাতা-পিতার অভাব অনুভব করতে দেননি।

দাদা আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর আবু তালিব তাঁকে পুত্রস্নেহজ্ঞানে তাঁর দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ইনি ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের পুত্র এবং মুহম্মদের চাচা। আবদুল মুত্তালিব তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে তাঁর দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে অসিয়ত করে গিয়েছিলেন—"মুহম্মদের প্রতি লক্ষ্য রেখো। তাঁর প্রতি সর্বপ্রকার দায়িত্ব পালনে কোন রকমের ত্রুটি রেখো না।"

আবদুল মুত্তালিবের আরো কয়েকজন স্ত্রী ছিলেন। তাঁদের ছিল দশ পুত্র। সেই ভাইদের মধ্যে আবু তালিব ছিলেন সবার বড়। ধন-সম্পদও আর সবার চেয়ে তাঁর বেশি ছিল। তিনি ছিলেন সকলের চেয়ে সাহসী। সততা ও ভদ্রতায়ও কেউ তাঁর চেয়ে বেশি ছিল না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মিষ্ট স্বভাবের অধিকারী। তাছাড়া আবু তালিব ও আবদুল্লাহ্ ছিলেন একই মায়ের সন্তান। অন্য ভাইয়েরা ছিলেন অন্য সব সৎ মায়েদের সন্তান। এসব কারণে আবদুল মুত্তালিব মুহম্মদ (সাঃ) এর দায়িত্বভার আবু তালিবের উপরে অর্পণ করে যান।

আবদুল মুত্তালিবের ন্যায় আবু তালিবও মুহম্মদ (সাঃ)-কে আপন দায়িত্বে আগলে রাখতেন। ভাইপোকে নিজের কাছ রাখতেন। কাছে নিয়ে ঘুমোতেন। কোথাও গেলে সাথে করে নিয়ে যেতেন। তাঁকে রক্ষার জন্য তিনি না তাঁর সন্তানদের, না তাঁর নিজের জীবনের কোন রকম পরোয়া করতেন। তাঁর প্রতি আবু তালিবের এই জীবন নিংড়ানো স্নেহের কী কারণ ছিল ? তিনি সদাসর্বদাই মুহম্মদ (সাঃ)-কে নিজের কাছে কাছে রাখতেন। তিনি গভীরভাবে লক্ষ্য করতেন যে, মুহম্মদ (সাঃ) ঈমানদারী, ভদ্রতা, সততা ও পবিত্রতার মূর্তিমান রূপ। তাঁর প্রতিটি বাক্যেই প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ লক্ষ্য করতেন। তাঁর প্রতিটি কাজকর্মই ছিল সততা ও নিষ্ঠার সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ

চাচার তত্ত্বাবধানে তাঁর জীবনের চারটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। তারুণ্যে পদার্পণ করলেন। তাঁর বুদ্ধিতে আলোর দীপ্তি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তাঁর আত্মিক শক্তি ও কর্মক্ষমতা ব্যাপকতা লাভ করতে লাগল।

বারো বছর বয়স পূর্ণ হল। সেই সাথে তাঁর শারীরিক বৃদ্ধি তাঁর মধ্যে বোধের ব্যাপকতা সঞ্চার করল। তাঁর কথাবার্তা ও আচার-আচরণে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ ঘটতে লাগল। তিনি ছিলেন মহান আত্মা বিশিষ্ট সুউচ্চ চরিত্রের অধিকারী। তাঁর ব্যক্তিত্বের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তাঁর চিত্ত মহৎ চেতনা ও সংবেদনশীলতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

বয়স তাঁর কতই বা হয়েছে ? বয়ঃপ্রাপ্তও হননি। অথচ তাঁর ব্যক্তিত্বের সর্বত্রই তারকার উজ্জ্বল দীপ্তি বিচ্ছুরিত হতে লাগল। বিভিন্ন পরামর্শ সভায় তাঁর মতামত লোকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে গ্রহণ করতে লাগল। সর্বত্রই তাঁর ব্যক্তিত্বের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এ সব দেখে আবু তালিবও চমৎকৃত হয়ে পড়তে লাগলেন। তিনি বিমুগ্ধদৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন সবকিছু। এখন মুহম্মদ তাঁর দৃষ্টিতে আর অল্পবয়স্ক কোন ব্যক্তি নন। তাঁর বিবেচনায় মুহম্মদ এখন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি যে কোন ব্যাপারে এখন তাঁর সাথে যুক্তি-পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেন। ঠিক যেন পাকা পরামর্শদাতা ও বিচক্ষণ অভিভাবক।

সে সময়ে মুহম্মদ (সাঃ)-এর বয়স যখন বারো বছর তখন আবু তালিব সিরিয়ায় বাণিজ্য করতে যাওয়ার জন্য মনস্থির করলেন। এ ছিল অতি কঠিন ও দীর্ঘ সফর। সেজন্য মুহম্মদকে সাথে করে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। কিন্তু বাণিজ্য যাত্রা শুরু হলে মুহম্মদ (সাঃ)-ও যেতে চাইলেন। আবু তালিব ভাবলেন সফর কঠিন হলেও মুহম্মদ তো বুদ্ধিমান বালক। এসব চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁকে সফরে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

কাফেলা রওনয়ানা হল। মুহম্মদও সাথী হলেন। রাস্তায় সমস্ত কিছু গভীর মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। যা কিছু শোনেন, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন এবং সমস্ত কিছুই নিজের স্মৃতিতে জমা করে নিতে লাগলেন।

কাফেলা বিভিন্ন এলাকা অতিক্রম করল। ছোট বড় বহু নগরে অবস্থান করল।

সব শেষে বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া রাজ্যে প্রবেশ করে সেখানকার বিখ্যাত নগর বুসরায় বাণিজ্য তাঁবু ফেলল।

'বুসরা'য় বুহাইরা নামে একজন খ্রিস্টান সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁর গির্জার কাছে ছায়াঘেরা সুন্দর একটা জায়গা ছিল। কুরাইশ ব্যবসায়ীরা সিরিয়ায় যাওয়া-আসার পথে বুসরার ঐখানেই তাঁবু ফেলতেন। সেখানে কিছুদিন বিশ্রাম করতেন এবং আড়ৎদার ও ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ গড়ে তুলতেন।

এ কাফেলা এখানেই তাঁবু ফেলল। ব্যবসায়ীরা যার সেই কাজে-কর্মে মনোযোগ দিলেন। পরিশ্রম শেষে ক্লান্ত ব্যক্তিরা কেউ বিশ্রাম নিতে লাগল, কেউবা ক্ষুধার্ত হয়ে আহারে বসে গেল। কেউ নিজের ব্যবসায়ী সামগ্রী ঠিক ঠিক সাজিয়ে নিতে লাগলেন আবার কেউবা নতুন নতুন ব্যবসায়ীর সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলার কাজে মনোযোগ দিতে লাগলেন।

তখনো খুব বেশী সময় অতিবাহিত হয়নি। লোকজন এভাবেই নিজ নিজ কাজ-কর্মে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় খ্রিস্টান সন্ন্যাসী বুহাইরার ওখান থেকে এক লোক এসে বললঃ 'আপনারা সাধু বুহাইরার ওখানে চলুন। উনি আপনাদের সকলের জন্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে আপনাদের দাওয়াত দিয়েছেন।'

লোকেরা এ কথা শুনে এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। কৌতুহলবশত লোকেরা বলাবলি করতে লাগল– 'এর আগেও তো আমরা কয়েকবার এ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেছি কিন্তু বুহাইরা তো আর কখনো আমাদের নিমন্ত্রণ করেননি ? হঠাৎ তাঁর এ মেহেরবানি হল কেন ?'

তারপর কী আর করা ? নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে সবাই বুহাইরার নিমন্ত্রণখানায় রওয়ানা হয়ে গেলেন। কেবলমাত্র একজন রয়ে গেলেন, তিনি মুহম্মদ (সাঃ)। বালক বলে তিনি রয়ে গেলেন।

বুহাইরা সবাইকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং বললেন ঃ 'ভাইসব! আমার খুবই ইচ্ছা যে, আপনারা সবাই আমার সাথে খাওয়া-দাওয়ায় অংশ নিন। কেউ যেন বাকি না থাকে।'

কাফেলার লোকেরা বলল ঃ 'আমরা সবাই এসে গেছি। তবে আমাদের সাথে এক বালক ছিল কেবলমাত্র তাকেই রেখে এসেছি।'

বুহাইরা বললেন ঃ 'না। বালক তো কী হয়েছে ? তাকেও নিয়ে আসুন। তিনিও আমাদের সাথেই খাবেন।'

নিমন্ত্রিতরা কিছুটা হয়রানি বোধ করতে লাগলেন। তাঁরা ভাবলেন যে, একে তো নিয়মবিরুদ্ধ দাওয়াত, তাতে আবার জেদ কেউ যেন বাকি না থাকে। তারা বললেন ঃ 'বুহাইরা! কী ব্যাপার যে, হঠাৎ আজ আপনি আমাদের নিমন্ত্রণ জানালেন ? আগে তো কখনো এমন করেননি ?

বুহাইরা বললেন ঃ 'আপনারা আমার অতিথি। আমার নিকটবর্তী জায়গাতেই আপনারা অবস্থান করছেন, সেজন্য আপনাদের প্রতি আমার দায়িত্ব আছে একথা আমার মনে রাখা উচিত। সেজন্য আমি চাই যে, আপনাদের একটু সৎকার হয়ে যাক। এ ছাড়া কী হতে পারে ?'

কাফেলা বলল— 'আল্লাহর কসম! এর পিছনে অন্য কোনো কারণ ছাড়া এ কাজ হতে পারে না।'

আহ্বানকারী ব্যক্তি আবু তালিবের শিবিরে গিয়ে মুহম্মদ (সাঃ)-কে নিয়ে এলেন। ততক্ষণে বুহাইরা অভ্যাগতদের নিয়ে অপেক্ষায় ছিলেন। মুহম্মদকে দেখেই বুহাইরার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে গভীরভাবে তিনি তাঁকে দেখতে লাগলেন।

বুহাইরা মুহম্মদের কাছে এসে বললেন ঃ 'লাত ও উজ্জার কসম! যা কিছু প্রশ্ন করি যেন ঠিক ঠিক উত্তর দেয়া হয়।'

মুহম্মদ ঃ 'লাত-উজ্জার কসম খাবেন না।'

বুহাইরা ঃ 'আচ্ছা, আল্লাহর কসম! যেন ঠিক ঠিক জবাব দেয়া হয়।'

মুহম্মদ ঃ 'কী জানতে চান, বলুন ?"

বুহাইরা তাঁকে তাঁর সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন করতে লাগলেন। কিছু প্রশ্ন ছিল তাঁর মানসিক অবস্থা ও শারীরীক অবস্থা বিষয়ে। আর কিছু তাঁর আচার-আচরণ ও স্বভাব-প্রকৃতি বিষয়ে। তিনি তাঁর সবকটি প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দিলেন। ইতিমধ্যেই আবু তালিব মুহম্মদকে নিতে এলেন। বুহাইরা আবু তালিবকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'এ ছেলে আপনার কে হন ?'

আবু তালিব ঃ 'আমার পুত্র।'

বুহাইরা ঃ 'না। ইনি আপনার পুত্র নন। এঁর পিতা বেঁচে আছেন, তা হতে পারে না।'

তাঁর সম্পর্কে বুহাইরার এ নিশ্চিত অবহিতিতে আবু তালিব বিস্মিত হয়ে গেলেন। বললেন ঃ

'হাঁ, ইনি আমার ভাইপো।'

বুহাইরা ঃ 'এঁর পিতা ?'

আবুতালিব ঃ 'ইনি মাতৃগর্ভে থাকতেই এঁর পিতার ইন্তেকাল হয়ে যায়।'

বুহেরা ঃ 'আপনি ঠিক বলেছেন। এখন আপনার ভাইপোকে বাড়ি নিয়ে যান। আর সমসময়েই তাঁকে ইহুদিদের থেকে দূরে রাখবেন। আল্লাহর কসম! তাঁকে দেখে ইহুদিরা যদি চিনতে পারে তাহলে তারা তাঁকে মেরে ফেলবে। আপনার ভাইপো ভবিষ্যতে একজন মহাপুরুষ হবেন।'

বুহাইরার চেহারায় খুশির ঝলক বয়ে গেল। আনন্দিত চিত্তে মনে মনে বললেনঃ 'আমার ধারণা একেবারেই সঠিক!'

২

আবু তালিব মুহম্মদকে নিয়ে মক্কায় ফিরে এলেন। বুহাইরা যা কিছু বলেছিলেন, তিনি তার সবকথাই স্মরণে রেখেছিলেন। মুহম্মদ সম্পর্কে বুহাইরার ভবিষ্যদ্বাণী সদাসর্বদাই তাঁর চিন্তা-চেতনাকে জাগ্রত রাখলেন। এটাই ছিল মুহম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে দেশের বাইরে তাঁর প্রথম বাণিজ্য-সফর।

দীর্ঘ সফরে যাওয়া-আসার পথে মুহম্মদ (সাঃ) যা কিছু দেখেছিলেন, যা কিছু ঘটেছিল তার সবটাই তিনি তাঁর স্মৃতিতে জাগরুক রাখলেন। লোকেরা যা কিছু শুনেছিল তা তাদের দৈনন্দির চর্চার বিষয় হয়ে গেল।

সেই দীর্ঘ যাত্রাপথে তিনি বড় বড় মরুভূমি ও অসংখ্য উঁচু উঁচু পাহাড় দেখেছিলেন। ঘন সবুজ মরুদ্যান ও অগণিত বাগ-বাগিচা দেখেছিলেন। দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ সুদীর্ঘ উঁচু-নীচু পথও অতিক্রম করেছিলেন। বিভিন্ন নগর ও অসংখ্য লোকালয়ও অতিক্রম করেছিলেন। বিভিন্ন লোকের সাথে তাঁর যেসব কথাবার্তা হয়েছিল গভীর মনোযোগ সহকারে সেসব কথা তিনি শুনে রেখেছিলেন।

সেসব লোকেদের মধ্যে এমন লোকদেরকে তিনি দেখেছিলেন যারা কুরাইশেদের ন্যায় পৌত্তলিক ছিল। এমন লোকেদের তিনি দেখেছিলেন যারা আসমানী কিতাবের শিক্ষা ও ধর্ম মেনে চলত। তিনি কিছু অগ্নিপূজকেরও সন্ধান পান। তিনি এমন লোকেদের সাথেও পরিচিত হন যাদের পূজার্চনা ও ধর্মীয় ধ্যান ধারণা নিজেদের হাতে গড়া পাথর-প্রতিমাকে ঘিরে আবর্তিত হত। একদল নকল ইহুদিকেও তিনি দেখতে পান যারা ইহুদি ধর্মের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে সহজ সরল মানুষদের ঠকিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত এবং আসমানী গ্রন্থের মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করে, নিত্য-নূতন নিয়ম-কানুন তৈরি করে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করত। তিনি এমন খ্রিস্টান জনসাধারণকেও দেখেন যারা পাদ্রীদের অন্ধভাবে অনুকরণ করত। অথচ পাদ্রীরা তাদের কাছে ধর্মের মূল শিক্ষা গোপন রাখত।

এই অন্ধকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগণকে কিভাবে ন্যায় ও সত্য-সুন্দরের পথ দেখানো যায়–সেকথা তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি দিনরাত তাদের কল্যাণের চিন্তায় ডুবে রইলেন। সাথে সাথে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। এদের কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল ? কারা সতের আর কারা অসত্যের, কারা আলোর আর কারা অন্ধকারের পথ অনুসরণ করছে ? প্রকৃত সত্য কোথায় ? আর তা কী?

কম বয়সী কিন্তু তীক্ষ্ণ ধীশক্তিসম্পন্ন বালক মুহম্মদ (সাঃ) চিন্তা করতে লাগলেন, কীভাবে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া যাবে ? তাদের হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হোক, অন্ধকার বিদূরিত হোক, সত্যের আলো প্রস্ফুটিত হোক।

বাল্যকাল মানুষের খেলা-তামাশার কাল। কিন্তু সেসব মুহম্মদকে আকর্ষণ করে না। তিনি তা থেকে বহু দূরে দূরে অবস্থান করেন। বাজে কথার প্রতি তিনি কোন রকমের আকর্ষণ অনুভব করেন না। সর্বদাই তিনি সত্যের পথের অনুসন্ধানে রত থাকেন। এ চিন্তাধারার মধ্যে তিনি সদাসর্বদাই সত্য ও আলোর পথের প্রত্যাশীরূপে দিন অতিবাহিত করেন। অন্তরে গভীর আকাঙ্ক্ষা সত্যের সন্ধান তিনি পাবেনই।

বাড়ির ও পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে উকাজ, মাজিনা ও যুলমাজাযের মেলায়ও যেতেন। এসব ছিল তৎকালীন আরবের বিখ্যাত মেলা। মক্কা নগরীর আশেপাশেই বসত। আবার এগুলো লাগত হুরমাতের মাসগুলোতে, সে সকল মাসে যুদ্ধ ও খুনোখুনি হারাম ছিল। চলমান যুদ্ধ থেমে যেতো। প্রতিশোধের আগুন নির্বাপিত হয়ে যেত। আরবের চারটি মাসকে বলা হত হুরমাতের মাস। জীকাদা, জিলহিজ্জা, মুহররম ও রজব মাসে এসব হারাম ছিল। এই মেলাগুলোতে সমস্ত রকমের জিনিসপত্র বিক্রি হত। বিদেশ থেকেও নানা রকমের পণ্যসামগ্রী আসত ও বিক্রি হত। এ ছাড়াও সেখানে বসত কবি-সম্মেলন। জমে উঠত কবির লড়াই। বক্তারা নিজেদের বক্তৃতায় জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির চমক দেখাতেন। সম্মেলনে আগত প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের হৃদয়-মন উজাড় করে দিয়ে বক্তব্য রাখতেন। সেখানে ঘটত কল্পনার অবাধ বিস্তার। ধর্মীয় বক্তারা নিজ-নিজ ধর্মের বিশ্বাস ও মহিমা প্রচার করতেন। প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের মতামত ও ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করতেন। সেখানে কারো পক্ষ হতে কারো জন্য কোন রকমের ভয়ডর থাকত না। যে কোন ব্যক্তি নির্দ্বিধায় তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারত। কারণ তা ছিল হুরমাতের মাসের অনুষ্ঠান।

এ মেলা লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠত। দূর-দূরান্ত হতে বিভিন্ন জায়গার লোকজন আসত। তা হয়ে উঠত মিলনমেলা স্বরূপ। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের এক সুযোগ ঘটত এসব মেলায়। পরস্পরের আকিদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, মতবিনিময় ও পরস্পরের মধ্যে বোঝা-পড়ার একটা সুযোগ ঘটত এখানে। এর ফলে, তাদের মধ্যে সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কেও বোঝাপড়ার একটা অবকাশ ঘটত। কে সত্যপথে ও কে ভুলপথে আছে সে সম্পর্কেও তাদের মধ্যে ধারণা জাগার একটা সুযোগ ঘটত।

এসব তাঁর চোখের সামনেই ঘটত। তিনি একান্তে অবস্থানের সময় এসব কথাবার্তা নিয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হতেন। যেসব কথা তাঁর বিবেচনায় সঙ্গত মনে হত, তা তিনি নিজের মনের মধ্যে গেঁথে নিতেন আর যা ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বিবেচিত হত তা মন থেকে বাদ দিয়ে দিতেন আর তা থেকে অনেক দূরে দূরে অবস্থান করতেন।

বারো বছর বয়সে তিনি বকরি চরানোর কাজে নেমে পড়েন। তৎকালীন সম্ভ্রান্ত আরব সমাজে তা ছিল এক সম্মানজনক পেশা। এ কাজ তাঁর চিন্তাধারার পথের এক বিরাট সহায়ক হয়ে উঠল। এ ছিল তাঁর বড়ই পছন্দের কাজ। সেসব ছিল কিছুটা নিজের বাড়ির আর কিছুটা ছিল পাড়া-প্রতিবেশীর। সেসব বকরিদের নিয়ে তিনি দূরের ময়দানে চলে যেতেন। টিলায় ভরা সবুজ প্রান্তরে মনের আনন্দে চরে বেড়াত সেসব বকরির দল। সে উন্মুক্ত প্রান্তরে স্বাধীনভাবে চরে বেড়াত

বকরির দল। মাথার উপর সুন্দর সুনীল আকাশ, দিগন্ত-বিস্তৃত মরুদ্যান ও মরুভূমি তাঁর মনে এক গভীর শান্তিময় ভাবদ্যোতনা সৃষ্টি করত। তাঁর আত্মা শান্ত ও প্রশান্ত হয়ে উঠত। দিগন্ত বিস্তৃত খোলা ময়দান আর আল্লাহর দুনিয়াটা তাঁর সামনে খুলে রাখা বিশাল এক মহাগ্রন্থের ন্যায় মনে হত। তিনি তা গভীরভাবে অধ্যয়ন ও অনুধাবন করার চেষ্টা করতেন।

এভাবে বাল্যকাল অতিক্রম করে তিনি যৌবনে পদার্পণ করলেন। অন্যান্য বালকদের ন্যায় খেলাধুলা, হাসিতামাশা, আড্ডা ইয়ার্কি ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তায় নিজেকে তিনি কোনদিন ডুবিয়ে রাখেননি। বয়স অল্প কিন্তু ভাবুক ও চিন্তাশীল ব্যক্তির ন্যায় জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন। তিনি হয়ে উঠলেন ভদ্রতা, উদারতা, বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার এক মূর্তিমান রূপ।

সেই সময়কার কথা। বয়স তখন নিতান্তই কম। কাবা ঘরের দেওয়াল নির্মাণ করা হচ্ছিল। অন্য বাচ্চারা কাঁধে চাদর চাপিয়ে পাথর বহন করছিল। কিন্তু তিনি নিজের চাদরটা মজবুত করে বেঁধে নিলেন। চাচা বললেন ঃ 'দেখ! বাচ্চারা কাঁধে চাদর চড়িয়ে কিভাবে আনন্দের সাথে কাজ করছে। তুমিও ঐভাবে নাও। তাহলে কাঁধে লাগবে না।' চাচার এ কথা শুনে তিনি মনে মনে খুবই হাসলেন।

মক্কার একটা সাধারণ রেওয়াজ ছিল যে, তাঁরা সন্ধ্যার পরে বাড়ির ছেড়ে বিশেষ কোন স্থানে সমবেত হয়ে রঙ্গ-রসিকতার আসর বসাতেন। আকর্ষণীয় বিষয়বস্তুর সমন্বয়ে জমে উঠত সে আসর। নয়া নয়া কাহিনী শোনা ও শোনানো ছিল সে আসরের অন্যতম আকর্ষণ। সাধারণত, এ বিষয়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রথমে কাহিনী শোনানো শুরু করতেন। সে কাহিনী বলার ঢংও ছিল বেশ আকর্ষণীয়। লোকেরা সারারাত ধরে তা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনত। এ ছিল তাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তাঁর এক সাথী তাঁকে একদিন বললেন ঃ 'মুহম্মদ! চলো, তুমিও একদিন এ আসরে চল।'

তখন ছিল তার উঠন্ত বয়স। সাথীর পীড়াপীড়িতে তিনি একদিন সে আসরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এ ছিল তাঁর বকরি চরানো সাথী। তিনি বললেন ঃ 'আজ রাতে আমার বকরিদের তুমি দেখাশোনা করো।' তিনি সত্যি সত্যি সে মনোরঞ্জক অনুষ্ঠানের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আসর থেকে দূরে রাস্তাতে কোন একটি বাড়ি থেকে গানবাজনার আওয়াজ তিনি শুনতে পেলেন। তিনি সেখানে বসেই শুনতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে এলো ঘুম। সেখানেই তিনি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের মধ্যেই রাত কেটে গিয়েছিল। চোখ মেলতেই দেখলেন বেলা উঠে গেছে। বেলা চড়তেই তিনি তাঁর সাথীর কাছে চলে গেলেন।

তাঁকে দেখেই সাথী বলল– 'বল মুহম্মদ, রাত কেমন কাটালে?' তিঁনি বললেন– 'কী বলব ? যাচ্ছিলাম। পথে যেতে যেতে কানে ভেসে এলো এক মনোহর গীত। আওয়াজও ছিল ভারি মনোরম। ভাবলাম, এখানে দাঁড়িয়ে একটু

শুনি একটু পরেই না হয় যাব। বসে শুনতে শুনতেই ঘুম এসে গেল। ঘুমিয়ে পড়লাম, ঘুম ভাঙতেই দেখি সকাল হয়ে গেছে।'

পরদিন রাতেও সাথী তাঁকে একই অনুরোধ করল। বলল ঃ 'দেখ, আজ আর এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়।' তিনি আবার চললেন। যেতে যেতে পথেই আবার কানে ভেসে এলো রসভরা গীত! কণ্ঠস্বরও ছিল বেশ মনোরম। মনে হল যেন এ আওয়াজ আকাশ থেকে ভেসে আসছে। তিনি বসে গেলেন এবং আগের রাতের মতোই গান শুনতে শুনতে সেখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

চল্লিশ বছরের বয়ঃকালের মধ্যে তিনি মাত্র দু'বার এরকম ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু এ বিপর্যয় থেকে আল্লাহই তাঁকে রক্ষা করলেন। কেননা, আল্লাহর দৃষ্টিতে এসব বাজে ব্যাপারের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে ছিল তাঁর স্থান। তিনি ছিলেন খোদ খোদাতা'লারই আমানত। একথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি যে, তিনি এসব কাজ করতে পারেন যা তাঁর সততা, পবিত্রতা, আমানতদারিতা ও সচ্চরিত্রতার উপর সামান্যতম কালিমাও লেপন করতে পারে।

তিনি ছিলেন লজ্জা, সারল্য ও সততার মূর্তিমান রূপ। পবিত্রতা ও শুদ্ধতার প্রতীক। সততার জন্য সমাজে তিনি অক্ষয় খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। ঈমানদারি ও আমানতদারিতে তিনি নিজেই ছিলেন নিজের উপমা।

তাঁর পবিত্রতা, সচ্চরিত্রতা, সততা ও নানাবিধ গুণের কারণে মক্কাবাসীরা তাঁকে যে 'আল আমীন' (আমানতদার) উপাধি দিয়েছিলেন তাতে বিন্দুমাত্র অতিশয়তা ছিল না। তিনি ছিলেন এ বিশেষণেরই সুউপযুক্ত। আর নিজেই ছিলেন নিজের একমাত্র দৃষ্টান্ত।

তরুণ বয়সে তিনি তীর-চালনা শিখেন। যুব বয়সে সামরিক শিক্ষা লাভ করেন। ফিজার যুদ্ধে চাচাদের তিনি সমস্ত রকমের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন। কুরাইশ ও হাওয়াজিন গোত্রের মধ্যে এ ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এটি ছিল অত্যন্ত ভয়ানক ও রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধ। কয়েক বছর ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল। আরববাসী এমন ভয়ংকর যুদ্ধ আর কখনো দেখেনি। এ যুদ্ধে তিনিও অংশ নিয়েছিলেন কিন্তু কখনো কাউকে আঘাত করেননি।

এ যুদ্ধে অগণিত লোক নিহত হয়েছিল। ঘরে ঘরে শোকের মাতম উঠেছিল। তিনি সমঝোতার আহ্বান জানিয়ে এ যুদ্ধ বন্ধ করার আহ্বান জানালেন। অবশেষে, দু'পক্ষই সমঝোতার চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। এ সমঝোতা ইতিহাসে 'হিলফুলফুজুল' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। এ সমঝোতা চুক্তিতে তিনিও শরীক হয়েছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ষোল বছর।

যুদ্ধাবসান শেষে মক্কাবাসী আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে এলো। আবার খেলাধুলা, রং-তামাশা, গান-বাজনা আর লাজলজ্জাহীন জীবনযাত্রায় ফিরে গেল মক্কাবাসী। জুয়া ও শরাবের আসর আবার জোরদার হয়ে উঠল, ভোগবিলাস আর

আনন্দমাহফিলের গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে গেল তারা। আর মুহম্মদ (সাঃ) ? তিনি ভেড়া ও ছাগল নিয়ে আগের মতোই মুক্ত জীবনে ফিরে গেলেন। সেখানকার মুক্তবাতাস আর দিগন্ত বিস্তৃত আরবদেশ তাঁর চোখে স্বপ্নকল্পনার অ ন বুলিয়ে দিতে লাগল। তাঁর দুটি চোখ ভেড়া ও বকরিদের প্রতি রাখতে লাগল সতর্ক দৃষ্টি তাঁর আত্মা বিশাল ভুবনে পাখা মেলে উড়ে বেড়াতে লাগল।

এ ছিল মুহম্মদ (সাঃ) এর চলমান জীবনের চালচিত্র। এ কাজেই তিনি রাতদিন নিমগ্ন থাকতেন। এতেই তিনি গভীর আকর্ষণ অনুভব করতেন। এতেই ছিল তাঁর প্রাণের শান্তি। একান্তে অবস্থান করে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তিনি গভীর অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকতেন। হই-হট্টগোল থেকে দূরে থাকা, জগতের শান্তি-শৃঙ্খলা ও অনুশাসনের প্রতি ধ্যান রাখাই হল তাঁর জীবনের একমাত্র সাধ্য-সাধনা। তিনি শুধু পশু-চারণের মধ্যেই তখন লিপ্ত থাকেন। উদার-উন্মুক্ত প্রান্তর তাঁর হৃদয়-মনে গভীর শান্তির পরশ বুলিয়ে দিত। একান্তে অবস্থানের ফলে তাঁর বিবেক ও চিন্তা-চেতনা বিকশিত হতে লাগল। হৃদয়মন ও আত্মার উপর আল্লাহর বিচিত্র সৃষ্টি সম্পর্কে নিত্য-নতুন উপলব্ধি সৃষ্টি হতে লাগল।

আর আবু তালিব ? তিনি রুজি-রোজগারের সন্ধানে লিপ্ত থাকতেন। বৈষয়িক চিন্তা-ভাবনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হত তাঁর জীবন। তাঁর ভাইপোসহ তাঁর এবং তাঁর পরিবারের লোকজনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে পালন করে যেতে লাগলেন। আল্লাহর রহমতে তাঁর পরিবারে তেমন কোন অভাব অনটন ছিল না।

একদিন আবু তালিব মুহম্মদ (সাঃ) এর কাছে এসে বললেন ঃ 'মুহম্মদ! তুমি তো জানো, আমাদের পরিবারে খরচ-খরচা দিন দিন বেড়ে চলেছে। এতে আমাদের দুশ্চিন্তাও বাড়ছে। খাদিজা অন্য এক লোককে দিয়ে বাণিজ্য চালাচ্ছেন। যদি রাজী হও, তাহলে তাঁর সাথে কথা বলি।' সে সময়ে তিনি তেইশ-চব্বিশ বছরের যুবক।

মুহম্মদ (সাঃ) বললেন ঃ 'চাচাজি! আপনি বললে আমি রাজি।'

খাদিজা ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা। তাঁর বংশধারা পাঁচ পুরুষ ঊর্ধ্বে মুহম্মদের ঊর্ধ্বতম পুরুষ কুসাই-এ গিয়ে মিলে যেত। বনী মাখজুম গোত্রে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। খাদিজার স্বামী প্রচুর ধন-সম্পদ রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরে ধনশালী বিধবা খাদিজাকে একাধিক কুরাইশ ব্যবসায়ী বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু তিনি কাউকেই স্বামীত্বে বরণ না করে একাকিনী জীবন-যাপন করতে থাকেন এবং লোকজন দিয়ে ব্যবসায় বাণিজ্য চালাতে থাকেন। এতে তিনি প্রচুর লাভ করতেন এবং সুখে-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন। একদিন আবু তালিব তাঁর কাছে গেলে খাদিজা মনে মনে ভাবলেন যে, আবু তালিবের কাছ থেকে একজন উপযুক্ত লোক মিলতে পারে। তিনি খাদিজাকে জিজ্ঞেস করলেন– 'খাদিজা! তোমার বাণিজ্য দেখাশোনার জন্য মুহম্মদকে পছন্দ হয় ?'

খাদিজা ঃ 'আপনি যদি অন্য লোকের নামও করতেন, তাহলেও তাতে আমার আপত্তি থাকত না। আর আপনি এমন একজন লোকের নাম করেছেন তিনি আবার আল-আমীন!'

আবু তালিব আনন্দিত চিত্তে ফিরে এসে বললেন ঃ 'মুহম্মদ! আল্লাহ রোজগারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।'

সিরিয়ার উদ্দেশে বাণিজ্য-কাফেলা প্রস্তুত। তাতে মুহম্মদ (সাঃ) ও ছিলেন। তাঁর সাথে খাদিজার গোলাম মাইসারাও ছিল। সকলেই তাঁদের বিদায় জানাতে এলেন। আবু তালিব ছিলেন সবার আগে। বিদায়ের মুহূর্তে সবার উদ্দেশে স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন ঃ 'আল্লাহ তোমাদের যাত্রা সফল করুন। তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য লাভজনক হোক আর আল্লাহ তোমাদের সহী-সালামতে ফিরিয়ে আনুন।' মাইসারাকেও বললেন ঃ 'মাইসারা, তুমি মুহম্মদের প্রতি লক্ষ্য রেখো, তার যেন কোন কষ্ট না হয়।'

কাফেলা রওয়ানা হল। প্রথম সফরে তিনি যা যা দেখেছিলেন, সেগুলো আবার তাঁর নজরে পড়তে লাগল। গভীর মনোযোগ দিয়ে তিনি সেসব দেখতে লাগলেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে কাফেলা সিরিয়ায় পৌঁছে গেল এবং যথারীতি তাঁরা বুসরা শহরে পূর্ববর্তী স্থানে তাঁবু ফেললেন। কাফেলার সমস্ত লোকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তিনি লাভ করেছিলেন। তাদের জন্যও মুহম্মদ (সাঃ) ছিলেন মঙ্গল ও করুণার প্রতিমূর্তি। কাফেলার লোকেরা সবাই তাঁর অনুগত হয়ে গিয়েছিল। কেউ তাঁর কথা বা হুকুম অমান্য করত না।

সার্থকভাবে, পাক্কা ব্যবসায়ীর মতো বাণিজ্য করলেন তিনি। বড় ধীরস্থির, শিষ্টতা, নম্রতা, ভদ্রতা ও ঈমানদারীর সাথে মালপত্র কেনা-বেচা করলেন তিনি। অত্যন্ত পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন লেনদেন। বাণিজ্য শেষে মক্কায় ফিরে এসে খাদিজাকে সবকিছু বুঝিয়ে দিলেন। তিনি যে যে মালপত্র কিনে আনতে বলেছিলেন, যথারীতি তা এনে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন।

এ বাণিজ্যের কারণে এত ব্যস্ততার মধ্যে থাকার ফলে কী তাঁর গভীরভাবে ধ্যান-সাধনা ও নিত্যকরণীয়কর্মের ব্যাঘাত ঘটেছিল ? না। তিনি আগের মতোই যথারীতি ধ্যান-সাধনা ও নিত্যকর্মের মধ্যে সত্যের সন্ধানে রত থাকতেন। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের লোকজন ছিল সেখানে। তাঁদের আলাদা-আলাদা ধর্ম ছিল। তারা নিজ নিজ ধ্যান-ধারণানুযায়ী আপন কর্মে ব্যস্ত থাকত। তিনি সেসব নিয়ে চিন্তা করতেন আর ভাবতেন কাদের মতবাদ ঠিক ? কারা কতটা সত্যপথে আসীন ? এসব চিন্তায় তিনি গভীরভাবে ডুবে থাকতেন।

বাণিজ্য-কাফেলা যে স্থানটিতে তাঁবু ফেলেছিল, তার নিকটেই ছিল একটি ছায়াদার বৃক্ষ। অভ্যাসমতো তিনি সে গাছের নীচে বসে ছিলেন। মাইসারা এদিক-ওদিক কিছু কাজ-কর্মে ব্যস্ত ছিল। কাছেই ছিল এক গির্জা। সেখান থেকে এক পাদ্রী মাইসারার কাছে এলেন। তাঁর নাম নস্তুর। মাইসারা প্রতি বছরই

বাণিজ্যে আসত, তাই ঐ পাদ্রী তাকে বেশ ভালই চিনতেন। পাদ্রী নস্তুর মাইসারাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'মাইসারা! তোমার সাথে উনি কে ?'

মাইসারা ঃ 'উনি এক কুরাইশ যুবক।'

নস্তুর ঃ 'তুমি ওঁর মধ্যে কী কী বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছো ?'

মাইসারাঃ 'ঈমানদারী, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নম্রতা-ভদ্রতা, উদারতা ও সদাচারিতা, সমুদ্রের মতো গভীর চিন্তাশীলতা, পরিচ্ছন্ন বিচার ক্ষমতা, সুবুদ্ধি ও গভীর মনোযোগ সহকারে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করা— এসব বৈশিষ্ট্য আমি তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি।'

নস্তুর বিস্ময়াভিভূত চিত্তে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তার চোখ দুটি কেমন ?'

মাইসারা এ প্রশ্ন শুনে কিছুটা থতমত খেয়ে গেল। তারপর বলল ঃ 'আয়ত ও কৃষ্ণবর্ণের চোখদুটির সাদা অংশে সামান্য লাল আভা রয়েছে। চোখের ভোমরা কালো, মনে হয় যেন কাজল লাগানো। তাঁর এ আয়ত চোখদুটি তাঁর সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।'

নস্তুর, যাঁকে দেখে মাইসারাকে এসব প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি বললেন ঃ 'মাইসারা! ঐ গাছের নীচে বসে থাকা যুবকের সম্পর্কে যে বৈশিষ্ট্যগুলির কথা তুমি বললে, আমার ধারণা, উনি নবী হবেন।'

নস্তুর এবার মুহম্মদের কাছে এসে তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যেকার লোকজনদের আচার-আচরণ সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন করতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছা, এসব ধর্মকর্ম, চালচলন ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর মনোভাব সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। তিনি ঐ সকল ধর্মমত খণ্ডন করে সে সম্পর্কে নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। নস্তুর নিজে ছিলেন ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী। এবার তিনি সে ধর্ম সম্পর্কেও প্রশ্ন করলেন। তিনি সে ধর্মের মধ্যেকার সমস্ত ভালমন্দ সম্পর্কে স্পষ্ট মতামত প্রকাশ করলেন।

৩

কিছুদিন বাদে কাফেলা মক্কায় ফিরে এলো। 'মার্‌রুজ্জাহ্‌রান'-এ পৌঁছালে মাইসারা মুহম্মদ (সাঃ) কে বললেন ঃ 'আল-আমীন! আপনি এখান থেকে খাদিজার কাছে গিয়ে তাঁক সুসংবাদ দিয়ে আসুন।'

তিনি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে রওয়ানা হলেন। মক্কায় পৌঁছাতে দুপুর হয়ে গেল। খাদিজা তখন বালাখানায় আপন মনে বিচরণ করছিলেন। ঠাণ্ডা হাওয়ায় মনটাকে ভাসিয়ে দিয়ে আপন মনে ঘোরাফেরা করছিলেন। এমন সময় তাঁর দৃষ্টি গেল উন্মুক্ত মরুপ্রান্তরের পানে। তিনি দেখলেন উটের পিঠে সওয়ার হয়ে মরুভূমির তপ্ত দিগন্ত হতে বালি উড়িয়ে কে যেন দ্রুতগতিতে সেদিকেই এগিয়ে আসছেন। তিনি ভাবছেন কে আসছেন এদিকে ? খাদিজা আগন্তুককে চেনার চেষ্টা করতে লাগলেন। উষ্ট্রারোহী আরো নিকটবর্তী হলেন। আরো নিকটবর্তী।

নিশ্চিতভাবে দেখলেন ইনি আর কেউ নন– আল্-আমীন, মুহম্মদ (সাঃ)। দ্রুতগতিতে তিনি তাঁর বাড়ির দিকেই এগিয়ে আসছেন!

সদর দরজায় পৌঁছাতেই খাদিজা বড় নিষ্ঠার সাথে স্বাগত জানালেন। বাণিজ্য শেষে নির্বিঘ্নে ফিরে আসার জন্য তিনি খুবই আনন্দ প্রকাশ করলেন। তারপর তিনি যারপরনাই আনন্দিত চিত্তে ব্যবসা-বণিজ্যের সমস্ত বিষয় অবগত করালেন। বাণিজ্যের কেনা-বেচা, লাভ-লোকসান সমস্ত কিছুই তাঁকে শোনালেন। লোকসান তো নয় ; সমস্তই লাভ।

খাদিজা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সবকিছু শুনতে লাগলেন। আর সুসংবাদ শুনে আনন্দিত চিত্তে বাহবা দিতে লাগলেন। মুহম্মদের সুস্পষ্ট বিবরণীতে খাদিজা যারপরনাই আনন্দিত হলেন। তাঁর মিষ্টিমধুর বচন আর তাঁর সার্বিক সততায় তিনি মোহাবিষ্ট হয়ে পড়তে লাগলেন। এর পূর্বেও বাণিজ্যে মুনাফা হয়েছে ঠিকই কিন্তু এত মুনাফা আর কখনোই হয়নি। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে খাদিজা বড়ই প্রভাবিত হলেন।

এবার মাইসারা এলো। তার মুখ থেকেও শুনলেন বাণিজ্যের যাবতীয় সুখবর। সমস্ত ঘটনাই তাঁকে অভিভূত করে তুলল। যা ছিল কল্পনাতীত।

মাইসারা মুহম্মদের বাণিজ্যের সমস্ত তথ্যই খাদিজাকে অবগত করাল। মাইসারা তাঁর বিশ্বস্ততা, সততা আর সেইসাথে তাঁর সার্বিক আচার-আচরণ সম্পর্কে জানাল। মুহম্মদ (সাঃ) এর এ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় খাদিজা মোহিত হয়ে গেলেন।

এরপর মাইসারা খাদিজাকে পাদ্রী নস্তুরের ঘটনাও বর্ণনা করল। তাঁর সম্পর্কে নস্তুর যে সুসংবাদ দিয়েছে সে কথাও বর্ণনা করল। তারপর বলল– 'আরেকটি ব্যাপারে আমি খুবই বিস্মিত হয়েছি। বাণিজ্য শেষে আমরা ফিরছিলাম। আমার সাথে দুটো উট ছিল। দুটো উটই পথিমধ্যে বসে পড়ল। আমি অনেক পিছনে পড়ে গেলাম। আমি এই ভয়ে তটস্থ যে, কাফেলা হয়তো পিছনে আমাকে একলা ফেলে রেখে চলে যাবে। আমি তাড়াতাড়ি আল-আমীনের কাছে গিয়ে পুরো ঘটনা তাঁকে জানালাম। তারপর তিনি দুটো উটকেই চালিয়ে দিলেন। দু হাতে দুটি উটের লেজ ধরে তাদের হাঁকিয়ে দেয়ার সাথে সাথে তারা এত জোরে চলতে লাগল যে, আমি পড়ে যাওয়ার ভয়ে তটস্থ হয়ে উঠলাম।'

খাদিজা খুবই বিস্মিত হলেন। বললেন ঃ 'তিনি তো অদ্ভুত সব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী!'

এত সব ব্যাপার দেখে খাদিজা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এ সব বিশেষত্ব তাঁর পক্ষে ভুলে যাওয়া একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। মুহম্মদ (সাঃ)-এর প্রশংসায় তাঁর হৃদয় সদা-সর্বদাই উৎফুল্ল হয়ে থাকল। যাঁর সাথেই দেখা হয় তাকেই তাঁর গুণের কথা বলতে লাগলেন। তাঁর মনের অগোচরে তাঁকে তিনি গভীর হৃদয়ে স্থান দিয়ে ফেললেন। তাঁর মতো সদাচারী, মহৎ, সত্যবাদী,

সচ্চরিত্র এক যুবক আল-আমীনকে জীবনসাথী হিসেবে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তাঁর হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। খাদিজা মনে-প্রাণে তাঁকেই চাইতে লাগলেন। ইনি সেই খাদিজা, যাঁকে কুরাইশ কুলের বড় বড় সওদাগররা জীবনসঙ্গিনী হিসেবে কামনা করেছিলেন। খাদিজা একে একে সবাইকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। হেলায় ত্যাগ করেছিলেন তাদের প্রস্তাব। কিন্তু মুহম্মদ (সাঃ)! তাঁকে পাওয়ার জন্য তাঁর সমগ্র হৃদয়মনপ্রাণ উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তিনি তাঁর মনের এ আকাঙ্ক্ষার কথা আর গোপন রাখতে পারলেন না। নিকট সম্পর্কীয় মেয়েদের মধ্যেও সে মনোভাব ব্যক্ত করে ফেললেন। তাদের মধ্যে নাফিসা বিনতে উলাইয়া নামে একটি মেয়ে ছিল। সে বলল ঃ

'খাদিজা! এতে আর অসুবিধা কী ? আল-আমীনকে বিয়ে করে ফেল।'

খাদিজা ঃ 'এ প্রস্তাব কে দেবে ?'

নাফিসা ঃ 'আমি তার দায়িত্ব নিচ্ছি।'

তারপর নাফিসা মুহম্মদের কাছে গিয়ে বললেন– 'আল-আমীন, তুমি বিয়ে করছ না কেন ?'

মুহম্মদ বললেন– 'এমন কে আছে যে, আমি তাকে বিয়ে করব ?

নাফিসা ঃ 'যদি রাজি থাকো তাহলে সুন্দরী, ধনশালিনী এক মেয়ের সাথে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করি! সে রাজি হলে তুমি রাজি তো ?'

মুহম্মদ (সাঃ) ঃ 'সে কে ?'

নাফিসা ঃ 'খাদিজা!'

মুহম্মদ (সাঃ) খাদিজার স্বভাব-চরিত্র ও তাঁর বুদ্ধিমত্তার প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে তিনি যেমনটি শুনেছিলেন তেমনটিই পেয়েছিলেন। লোকসমাজে তিনি 'তাহিরা' বা পবিত্রা নারী নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি তাঁকে 'তাহিরা' ই পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সাথে বিয়ে ? একথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। কেননা, তিনি জানতেন যে, অনেক ধনী সওদাগরও সেখানে পাত্তা পাননি।

মুহম্মদ (সাঃ) ঃ 'কিন্তু খাদিজার কী অভিমত ?'

নাফিসা তাঁকে সে কথাই বলল, যা ইতিপূর্বে খাদিজাকে বলেছিলেন। সে বলল ঃ 'তার দায়িত্ব আমার।'

মুহম্মদ আবু তালিবের কাছে পৌঁছে সব কথা অবগত করালেন। আবু তালিব একথা শুনে কিছুটা বিহ্বল হয়ে গেলেন। তাঁর মুখ থেকে মিথ্যা অথবা বাজে কথা তো কখনো শোনেননি! তিনি তা অস্বীকারও করতে পারলেন না। উপরন্তু বললেনঃ

'এ তো বড় ভাল কথা মুহম্মদ। প্রভূত ধন-সম্পদের অধিকারী সম্ভ্রান্ত মহিলা খাদিজা অনেক ধন-সম্পদওয়ালা পুরুষদের প্রত্যাখ্যান করেছেন। এখন তিনিই তোমাকে জীবনসাথী হিসেবে নির্বাচিত করলেন।'

তারপর বললেন ঃ 'কিন্তু পুত্র আমার! যেহেতু তোমার ধন-সম্পদ তেমন নেই সেহেতু তা তোমার প্রতিষ্ঠার সহায়ক হতে পারে!'

মুহম্মদ বললেন ঃ 'চাচাজি! তাঁর এবং তাঁর ধন-সম্পদের প্রতি আমার কোন মোহ নেই।'

আবু তালিব তাঁর ভাইদের সাথে নিয়ে খাদিজার চাচা আমর বিন আসাদের কাছে গেলেন। এরপর তার ভাই আমর বিন খুওয়াইলিদের সাথেও সাক্ষাৎ করে তাঁদের পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। তাঁরা এ প্রস্তাবে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন।

বিয়ের দিনক্ষণও ঠিক হয়ে গেল। বিয়ের দিন সমাজের গণ্যমাণ্য ব্যক্তিরা নিমন্ত্রিত অতিথিরূপে খাদিজার গৃহে বিয়ের মজলিসে উপস্থিত হলেন। আবু তালিব বিয়ের খুৎবা পড়লেন। ভারি সুন্দর ছিল সে খুৎবা। এ থেকেই অনুমান করা যায় যে, মুহম্মদ ছোট-বড় সকলের কাছে কেমন শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন। আবু তালিব আল্লাহর প্রতি প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মজলিসের সকলের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ

"ইনি আমার মরহুম ভাই আবদুল্লাহর পুত্র মুহম্মদ। কুরাইশকুলশিরোমণি নব যুবক মুহম্মদের সমকক্ষ সমাজে আর কেউ নেই। তাঁর ধন-সম্পদ নেই কিন্তু ধনসম্পদ তো বড়ই অস্থায়ী বস্তু। আপনারা জানেন, মুহম্মদ আমার বংশের এক অমূল্য রত্ন। আমার সম্পদ থেকে তিনি বিশ উটের দেনমোহরের বিনিময়ে খুওয়াইলিদের কন্যা খাদিজাকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছেন। আল্লাহর কসম, এর ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।"

এভাবে খাদিজার সাথে মুহম্মদের শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হল এবং আরব সমাজের সবচেয়ে ধনবতী ও বিদূষী মহিলা খাদিজা মুহম্মদের জীবনসঙ্গিনী হলেন।

সে সময় মুহম্মদের বয়স ছিল পঁচিশ বছর দু'মাস দশদিন ও খাদিজার বয়স ছিল চল্লিশ বছর।

৪

ঐ সময়ে মুহম্মদ ছিলেন নব যুবক। হাসিখুশি ও প্রাণবন্ত এক যুবক। গায়ের রঙ ছিল ফর্সা কিন্তু তার উপরে ছিল হাল্কা লালিমা। চেহারায় যেন হাসি ও আনন্দের ঝলক বইত। ঈষৎ গোলাকার হালকা মুখাবয়ব। সুউন্নত বক্ষদেশ। না-অতি বেঁটে, না-অতি লম্বা–মধ্যমাকৃতির দৈহিক গঠন। বড় মাথা, প্রায় কপাল পর্যন্ত বিস্তৃত ঘনকালো কেশরাজি। চুল মস্তক বরাবর দু'ধারে ছড়ানো। চওড়া ললাট, যাতে অসাধারণ মাহাত্ম্যের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠত। ঘন কালো ভোমরা, দেখলে মনে হত যেন কাজল লাগানো হয়েছে– তা ছিল বড়ই মনোহর। উজ্জ্বল ফর্সা গায়ের রঙ দেখে মনে হত যেন তাতে হালকা লাল রঙ লাগানো। তাঁর

উজ্জ্বল চেহারা দেখে মনে হত আকাশের চাঁদ তাঁর সমগ্র দেহে আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। সে আলোকিত চেহারা মানবমনে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের আবেশ ছড়িয়ে দিত। তাঁর নাসিকা ছিল সুউন্নত। সামনের দাঁতগুলোর মধ্যে দেখা যেত আলোকিত হালকা রেখা। হীরে মতির মত জ্বলজ্বল করত সুউজ্জ্বল দন্তরাজি। কথা বললে যেন তা থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হত। মনে হত তা থেকে উজ্জ্বলতা ফুটে উঠছে। মুখে ছিল ঘন-কালো দাড়ি। ঘাড় ছিল সুঠাম, সুউন্নত। বুক চওড়া। উপযুক্ত ও সঠিক মাপের ঘাড় ও পৃষ্ঠদেশ, মধ্যম আকারের দুটি হাত। বাহু পরিমাণমত মাংসল। মধ্যমাকৃতির লম্বা আঙুল। উরু ও হাঁটু মানানসই। সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পথ চলতেন। হাঁটতেন অত্যন্ত দৃঢ়পদে, বেশ জোরে। দেখে মনে হত কোন উঁচু জায়গা থেকে নিচের দিকে নেমে আসছেন। তাঁর চেহারায় গভীর চিন্তন ও মননের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠত। তাঁর চেহারায় উচ্চতর চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণায় আলোক বিচ্ছুরিত হত। কোন ব্যক্তি প্রথম দর্শনেই প্রভাবিত হয়ে পড়ত। খাদিজার সাথে তাঁর অত্যন্ত আনন্দময় জীবন গড়ে উঠেছিল। সে জীবন ছিল সুখ-শান্তিতে পূর্ণ এক সমৃদ্ধ জীবন। খাদিজাও ছিলেন অত্যন্ত সাবধানী, দায়িত্বশীল ও বুদ্ধিমতী নারী। তিনি মুহম্মদ (সাঃ)-এর রুচি-প্রবৃত্তি, মন-মানসিকতা, ধ্যান-ধারণা, চাওয়া-পাওয়া ও পছন্দ-অপছন্দের প্রতি গভীর মনোযোগী ছিলেন। তিনি সর্বদাই তাঁকে খুশি ও আনন্দিত রাখার চেষ্টা করতেন।

মুহম্মদের রুচি-প্রবৃত্তি কেমন ছিল ? সর্বদা সত্য কথা বলা, সমস্ত কাজই সততার সাথে সম্পন্ন করা, হুড়-হাঙ্গামা থেকে দূরে থাকা, ঝুট-ঝামেলা থেকে দূরে থাকা আর একান্তে আপনমনে গভীর চিন্তা-ভাবনায় ডুবে থাকা। খাদিজা তাঁর এসব প্রতিটি বিষয়ের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য রাখতেন। যার ফলে, তাঁর নিত্য কাজ-কর্ম নির্বিঘ্নে চলে যাচ্ছে। খাদিজা তাঁকে সর্বাবস্থায় সহযোগিতা করে চললেন। এখন তাঁকে আর পশু চরাতে হয় না; যার ফলে তিনি পরিপূর্ণরূপে আপন ধ্যান-ধারণায় লিপ্ত থাকতে সমর্থ হলেন। ইচ্ছামতো বিচার-বিবেচনায় মনোনিবেশ করতে লাগলেন। অভিনিবিষ্ট চিত্তে প্রাকৃতিক দৃশ্য নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। আল্লাহর অসীম রহস্যের দান সমগ্র সৃষ্টিকুলকে জানার এবং বোঝার চেষ্টা করতে লাগলেন। সেজন্য তিনি পূর্বপুরুষ দাদা ইব্রাহীমের দেখানো সত্যপথ ধরে জগতের চিরন্তন সত্যের পথ সন্ধান করতে লাগলেন। জ্ঞান, বুদ্ধি, ধ্যান, সাধনা, চিন্তা, চেতনা সমস্ত কিছুই সে পথ ধরে আবর্তিত হতে লাগল।

'আর এভাবেই আমরা ইব্রাহীমকে (আঃ) আকাশ ও পৃথিবীর শাসনসংক্রান্ত পথ দেখিয়েছি যা বিশ্বাসীদের জন্য সহায় হতে পারে।' – কুরআন।

এখন প্রশ্ন, তিনি কী খাদিজার প্রতি দায়িত্বশীলতাকে অস্বীকার করতে পারেন ? না, তা হতে পারে না। খাদিজা মুহম্মদের মতো দায়িত্বশীল, নিষ্ঠাবান,

সৎ ও মহৎ গুণাবলীর অধিকারী এক স্বামীর যোগ্য সহধর্মিনী রূপে তাঁকে জানতে, বুঝতে ও চিনতে ভুল করেননি; আর মুহম্মদের দৃষ্টান্ত তো মুহম্মদ নিজেই ছিলেন! নিজের ইবাদত বন্দেগী সত্ত্বেও খাদিজার প্রতি দায়িত্ব পালনে তিনি ছিলেন আদর্শ গৃহী। তিনি তাঁর সমস্ত দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি তাকে প্রয়োজনীয় সম্পদ দিয়ে খুশি রাখতেন। তিনি তাঁর ধন-সম্পদ দায়িত্বশীলতার সাথে রক্ষা করতেন। তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যের তদারকি করতেন। যাকে তিনি সদাচারী, দায়িত্বশীল ও বিশ্বাসী মনে করতেন তাকে দিয়ে ব্যবসার কর্ম চালাতেন। এ সবের দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ছিলেন উপযুক্ত স্বামী, দায়িত্বশীল গৃহী ও আদর্শ একজন স্বামী। খাদিজার নিমিত্তে তাঁর সমস্ত ভূমিকা ছিল অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মনোরঞ্জক। তাঁদের দাম্পত্য জীবন হয়েছিল খুবই আনন্দদায়ক ও মধুর। খাদিজা তাঁকে আরবের ধনশালী ও সম্ভ্রান্ত সবার উপরে স্থান দিয়েছিলেন। ধনশালী, প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালীদের মোকাবিলায় তাঁকেই সর্বশ্রেষ্ঠজ্ঞানে জীবনসাথী হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। খাদিজা মুহম্মদের প্রতি খুবই খুশি ও কৃতজ্ঞ ছিলেন। মুহম্মদকে নিয়ে খাদিজার অনেক আকাঙ্ক্ষা ছিল। অবশেষে তাঁকে জীবনসাথী হিসেবে পাওয়ার পর খাদিজার আর কোন খেদ ছিল না।

দাম্পত্য জীবনের পরিতৃপ্তি ও সুখ-শান্তি মুহম্মদের জীবনকে আরো সুন্দর ও মোহনীয় করে তুলেছিল। পরস্পর পরস্পরের প্রতি খুবই দায়িত্বমীল ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। খাদিজা তাঁর সমস্ত কথা খুবই মনোযোগ সহকারে শুনতেন। মুহম্মদ (সাঃ) প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা কখনোই বলতেন না। যা বলতেন, খুবই ভেবে-চিন্তে সুচিন্তিত শব্দপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতেন। রসিকতাও করতেন তবে তা ছিল সুচিন্তিত ও সূক্ষ্ম। তাঁর হাসি ছিল সুস্মিত। সে হাসিমুখ প্রাণে আনন্দের হিল্লোল তুলত। তাঁর সাথে কথা বলতে গিয়ে মানুষ মোহিত হয়ে যেত। তাঁর সুস্মিত মুখ কখনো বা সুমার্জিত হাসির রূপলাভ করত। এ সকল বৈশিষ্ট্যাবলীর কারণে লোকে তাঁর কথা গভীর মনোযোগ সহকারে শুনত। তাঁর মতামত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করত। তাঁর পরামর্শানুযায়ী চলাকে শান্তি ও মুক্তির পথ বলে মনে করত।

৫

পাহাড় পরিবেষ্টিত মক্কা শহরের মাঝখানে অবস্থিত পবিত্র কাবা ঘর। ফলে, জোর বৃষ্টি হলে শহর পানিতে ভরে যেত। কাবা ঘরের দেওয়ালও তেমন উঁচু ছিল না। উপরে আবার ছাদও ছিল না। যেমনটি আমাদের ঈদগাহে থাকে না। এক সময়কার ঘটনা। খুব জোর বর্ষার ফলে বন্যা দেখা দিল। অসংখ্য বাড়িঘর ভেঙে গেল। পানি কাবা-ঘরের ভিতরে পৌঁছে গেল। ফলে দেওয়ালে চিড় ধরল। ভিত খুব দুর্বল হয়ে পড়ল। এ ঘটনা মক্কাবাসীদের খুব সমস্যায় ফেলল। কাবা ঘর মেরামতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। সকলের ন্যায় মুহম্মদ (সাঃ) ও কাবাঘর মেরামতের কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

কাবা ছিল মক্কাবাসীদের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। কাবা ছিল তাদের মূল উপাসনাগার। কাবাঘর ছিল তাদের মূর্তিদের মূল আবাস-স্থল। তাছাড়া দূর-দূরান্তের পুণ্যার্থীরা কাবা পরিক্রমা করতে আসত। এর ফলে, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যও জমে উঠত। তা হয়ে উঠত লাভজনক। শুধু তাই নয় ; তাদের চেতনায় কাবাঘর ছিল একটি সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থান। পুণ্যার্থীরা দূর-দূরান্ত থেকে আসত। আগত পুণ্যার্থীরা কাবাকে বড়ই সম্মান করত। আগন্তুকরা কুরাইশদেরও যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখত। কেননা, তাঁরা ছিলেন কাবাঘরের সংরক্ষক। কাবা-সংক্রান্ত বিভিন্ন পদে তাঁরা আসীন ছিলেন। কাবাঘরের এ হেন দুরবস্থায় মক্কার বিশিষ্ট অধিবাসীরা একত্রিত হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন এখন কী করণীয় ?

শলা-পরামর্শ শেষে প্রস্তাব উঠল কাবার পুরনো ইমারত ভেঙে ফেলে নতুন ইমারত গড়ে তোলা যাক। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে কী করে ? কে ভাঙবে পুরনো ইমারত আর নূতন করে তা কে-ই বা নির্মাণ করবে?

ধরণীর বুকে কাবা আল্লাহর সবচেয়ে পবিত্র ঘর। তারা এ ব্যাপারে খুবই ভীত ছিলেন যে, আল্লাহ্ যদি নারাজ হন, যদি কোন আজাব তাদের উপর পতিত হয় ? কী করা যায় কেউ ভেবে পাচ্ছেন না।

কিন্তু কাবাঘর একেবারে জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছিল। যে কোন সময় ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই পুনর্নির্মাণ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। নিরুপায় হয়ে ভীতসন্ত্রস্ত চিত্তে তাই তাঁরা তা ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু এ ছাড়াও অন্য সমস্যা ছিল। নতুন ইমারত মজবুত ও সুদৃঢ় হওয়া উচিত। এজন্য ভালো উপকরণসামগ্রী কোথায় পাওয়া যাবে ? দক্ষ কারিগর কোথায় পাওয়া যাবে যিনি পাথরের পর পাথর সাজিয়ে মজবুত করে গড়বেন নতুন কাবাঘর?

আল্লাহ চাইলে তাঁর ইচ্ছায় কে বাঁধ সাধতে পারে ? তাই তার একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল। সে সময় এক রোমক ব্যবসায়ী বাণিজ্য সামগ্রী নিয়ে মিশর থেকে সমুদ্রপথে হাবশায় যাচ্ছিলেন। এ জাহাজ জেদ্দা বন্দরে এসে সমুদ্রতটে আঘাত খেয়ে ভেঙে যায়। এ জাহাজে প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান কাষ্ঠফলক ছিল। আর ছিল অতি মূল্যবান গৃহনির্মাণসামগ্রী। সে ব্যক্তি তাঁর সমস্ত বাণিজ্যসামগ্রী বন্দরে স্তুপ করে হাবশাগামী জাহাজের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কুরাইশরা এ খবর পাওয়ামাত্রই অবিলম্বে কয়েকজনকে জেদ্দা বন্দরে পাঠিয়ে দিলেন। ঐ ব্যক্তির নাম ছিল বাকুম। এসব লোকেরা তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তারা তাকে তাদের প্রয়োজনীয়তার কথা জানালে সে খুশিমনে সমস্ত জিনিসপত্র বিক্রি করতে রাজি হয়ে গেল। বাকুম তাঁদের জানাল যে, সে শুধু ব্যবসায়ী নয় ; একজন দক্ষ কারিগরও। তাঁদের জন্য এটা ভালই হল। কারণ, তাঁরা দক্ষ কারিগরও সন্ধান

করছিলেন। সাথে সাথে একজন দক্ষ কারিগরও পেয়ে গেলেন। তারা বললেন– ‘আচ্ছা, আপনিও আমাদের সাথে চলুন। এ মহৎ কাজে আপনিও শরিক হয়ে যান।”

বাকুম মক্কায় গিয়ে কাবা ঘর দেখে বলল– ‘এর নির্মাণ কাজ তো অনেক সহজ। এর আঙিনায় কিছু স্তম্ভ নির্মাণ করতে হবে যার উপরে ছাদ দেয়া যেতে পারে। এতে ইমারত মজবুত থাকবে। ঝড়ঝঞ্ঝা ও বন্যাতেও তা সুরক্ষিত থাকবে।’ তারাও ঠিক এ ইচ্ছাই পোষণ করছিলেন। সে জন্য তার প্রস্তাবে সবাই রাজি হলেন। মক্কায় মিসরের একজন লোক থাকত। সে ছিল কিবতি সম্প্রদায়ের লোক। তার নাম ছিল সুলেহ। কাঠের কাজে সে খুবই দক্ষ ছিল। বাকুমকে সহযোগিতা করার জন্য তাকেও কাজে লাগানো হল।

কুরাইশরা কাবাঘরকে আলাদা-আলাদা করে ভাগ করে নিলেন যাতে সকল গোত্রের লোক সে ঘর ভাঙার কাজে যথাযথভাবে অংশ নিতে পারে আর এ মহৎ কাজ থেকে কেউ বঞ্চিত না হয়।

কাবা-ঘর ভেঙে ফেলার সময় এসে গেল। লোকেরা আবারো ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ভাঙতে হবে, কিন্তু কে ভাঙবে ? আবরাহার শোচনীয় পরিণামের কথা তখনো তাদের চোখের সামনে ভাসছিল। সেদিন যারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কাবাঘর ভাঙতে এসেছিল, তারা না পেরেছিল কাবা পর্যন্ত পৌঁছাতে, আর না পেরেছিল ফিরে যেতে। প্রকাশ্য দিবালোকে তারা তছনছ হয়ে গিয়েছিল। তা খুব বেশিদিনের কথা ছিল না। তাদের শোচনীয় পরিণামের চিত্র তাদের চোখের সামনে সদা-সর্বদা ভেসে উঠত আর ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যেত। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভাঙা নয় ; গড়া। অতএব, উপাসনা করা হল, কুরবানি করা হল, দোয়া করা হল আর বিনয় ও নম্রতার সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করা হল। এবার এক ব্যক্তি এগিয়ে গেলো। ভয়ে তার শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। তিনি ছিলেন মুগীরার পুত্র ওয়ালীদ। শক্ত হাতে কোদাল ধরে সজোরে আঘাত হেনে একটা স্তম্ভ ভেঙে ফেললেন। সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। উদ্বিগ্ন চিত্তে তারা সেদিকে তাকিয়ে ছিল। কী হয়, কী হয় ভেবে বিষণ্ন চিত্তে অপেক্ষা করতে লাগল তারা। ওয়ালিদের কী দশা হয় তাই ভেবে তারা অস্থির। দেখতে দেখতে রাত হয়ে গেল। সে রাত কেটে গিয়ে আবার সকাল হল। কিন্তু না ওয়ালিদের কিছুই হয়নি। তার উপরে কোনো বিপদাপদ আসেনি। তা দেখে কুরাইশরা মনে সাহস পেল। বুকে সাহস নিয়ে এবার তারা কাবাঘর ভাঙার কাজে নেমে পড়ল।

এ ভাঙার কাজে সবাই অংশ গ্রহণ করল। পাথর সরানোর কাজে সকলেই অংশগ্রহণ করল। ভাঙতে ভাঙতে সবুজ চাতাল পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সেখানেও কোদাল মারা হল। কোদালের আঘাতে সেখান থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হতে লাগল। সেখানেই নয়া ইমারতের ভিত্ স্থাপিত হল।

কাছেই ছিল পাহাড়ি এলাকা। সেখান থেকে পাথর বয়ে এনে নয়া ইমারত গড়ার কাজ চলল। মুহম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সব চাচাই এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। দেখতে দেখতে মজবুত দেওয়াল নির্মাণ সম্পন্ন হল।

কাবা ঘরের পুরাতন দেওয়ালের পূর্বপ্রান্তে একটি কালো পাথর ছিল ; 'হাজরে আসওয়াদ' বা কালো পাথর নামে পরিচিত। আরবরা তাকে সম্মানের চোখে দেখত; ইসলামেও তার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। কাবা তওয়াফ বা পরিক্রমা করার সময় ঐ পাথর থেকেই যাত্রা শুরু করার প্রথা ছিল। তাতে চুম্বনও দেওয়া হত।

কুরাইশরা এ দেওয়াল কিছুটা উঁচু করে নির্মাণ করেছিল। এখন 'হাজরে আসওয়াদ' স্থাপন করার সময় উপস্থিত হল। কিন্তু প্রশ্ন উঠল এ মহাসম্মানিত কাজটি করার সৌভাগ্য কে বা কারা লাভ করবে ? কোন গোত্রই এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকার জন্য প্রস্তুত ছিল না। প্রত্যেক গোত্রই এ সৌভাগ্য লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিল এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের আগে এ কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে নিজেদের বেশি হকদার মনে করত।

এক মহাসমস্যা উপস্থিত হল। লোকেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। অবস্থা নাজুক হয়ে পড়ল। প্রত্যেকের মনের গোপন আকাঙ্ক্ষার কথা উত্তপ্ত তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়ল। এবার তা হানাহানির পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার উপক্রম হল।

দেখতে দেখতে পাঁচদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল তবুও হাঙ্গামা শেষ হল না। কোন সিদ্ধান্তও নেয়া গেল না। অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ল। লোকেরা মরণপণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গেল। বনী আবদুদ্দার ও বনী আদী নামে দুটি বিখ্যাত গোত্র ছিল। এ দুই গোত্রও এ সৌভাগ্যের দাবীদার আর কাউকে হতে না দেয়ার জন্য নিজেরা জোটবদ্ধ হল। আর কোন গোত্রকেই তারা এর ধারে কাছে আসতে দেবে না বলে সিদ্ধান্ত নিল। প্রাচীন আরবের প্রথানুযায়ী পেয়ালায় রক্ত রেখে প্রতিজ্ঞা পূরণের কাজও তারা যথারীতি সম্পন্ন করল। খাপ থেকে তলোয়ার বের করে তা প্রদর্শন করে জানিয়ে দেয়া হল যে, এ প্রশ্নের মীমাংসা হবে একমাত্র তরবারি দ্বারা। সে সময় আবু উমাইয়া বিন মুগীরা উঠে দাঁড়ালেন। তিনি কুরাইশকুলের মধ্যে সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁকে সবাই মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান প্রদর্শন করত। তিনি সকলের উদ্দেশে বড় মর্মস্পর্শী ভাষায় বললেন– "ভাইসব! সম্মান ও নেতৃত্বের ব্যাপারে তোমাদের সবার মর্যাদা সমান। অকারণে ঝগড়া-লড়াই করে লাভ নেই। পরস্পর ঘৃণা ও বিদ্বেষ থেকে বিরত হও। জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ সম্পাদন কর। আমি প্রস্তাব দিচ্ছি– বাবুসসাফার দিক থেকে বেরিয়ে যে কুরাইশ আজ সর্বপ্রথম এ দিকে আসবে, এর ফায়সালা তার উপরেই ছেড়ে দাও।'

তাঁর এ অভিভাবকসুলভ পরামর্শ সবাই মেনে নিল। কাবার চারটি দিকে হারাম শরীফকে ঘিরে চারটি প্রাচীর আছে। তার একটি দরজার নাম বাবুসসাফা। কেননা, এটি সাফা পাহাড়ের দিকে অবস্থিত। সকলেই বাবুসসাফার দিকে গভীর মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে প্রথম ব্যক্তির আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। আর ভাবতে লাগলেন তাদের ভাগ্য আজ কার হাত দিয়ে কীভাবে নিরূপিত হয়। আল্লাহর কী অসীম রহস্য! কিছুসময় বাদেই এক সুন্দর সুপুরুষ নবযুবককে ঐ বাবুসসাফার দিক থেকেই আসতে দেখা গেল। তিনি বেশ জোর পদক্ষেপেই এগিয়ে আসছেন। একটু নিকটবর্তী হতেই সবাই চীৎকার করে বলে উঠল– 'ঐ দেখ মুহম্মদ আল-আমীন আসছেন। তাঁর সিদ্ধান্তকেই আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।'

আরববাসীদের কী গভীর বিশ্বাস আর ভরসা ছিল তাঁর প্রতি! সমগ্র জাতির মধ্যেই এমন কোন ব্যক্তি নেই যে, তাঁর প্রতি কারো সামান্যতম সন্দেহও থাকে। এমন কোন ব্যক্তিকেও দেখা গেল না যাঁর সিদ্ধান্তে তার অমত আছে। এখন দেখার বিষয়, তিনি কীভাবে সেই নাজুক সমস্যার সমাধান দেন।

লোকেরা গভীর আগ্রহের সাথে তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তিনি বললেন– "একটা কাপড় আনুন।" কাপড় আনা হল। তিনি হাজরে আসওয়াদ কে নিজ হাতে উঠিয়ে তাতে রাখলেন। তারপর বললেন– " সকল গোত্রের সরদার মিলে এ কাপড়কে ধরে উঠিয়ে নিন।"

সকল গোত্রের সরদার মিলে সে কাপড় ধরে তাকে যেখানে স্থাপন করার কথা সেখানেই নিয়ে আনা হল। তারপর তিনি সেটিকে উঠিয়ে যথাস্থানে তা রেখে দিলেন। লোকেরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। কী সাংঘাতিক সমস্যা ? অথচ কত সহজে তার সমাধান হল! সকলের আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হল অথচ তা থেকে কেউ বঞ্চিত হল না! তাঁর জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তায় কত বড় বিপদ থেকে জাতি রক্ষা পেল! জাতি কত বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে রেহাই পেল! শত্রুতা ও হিংসার আগুন নিভে গেল। জাতি আবার আগের মতো শান্তির সাথে বসবাস করতে লাগল।

তারপর কুরাইশরা সম্মিলিতভাবে কাবাঘর নির্মাণকাজ সম্পন্ন করল। স্তম্ভের উপরে ছাদ স্থাপন করা হল এবং ভিতরে যাওয়ার জন্য একটি দরজা খুলে দেওয়া হল, সেখানে দেবতাদের রাজা হুবুলের মূর্তি রাখা ছিল।

সে সময়ে তিনি তাঁর জীবনের পঁয়ত্রিশ বছর বয়স অতিক্রম করছিলেন।

তাঁর স্বচ্ছতা ও সততার কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। তিনি হয়ে উঠেছিলেন তাঁর জাতির পরম প্রিয়ভাজন ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন অতিশয় সৎ ও পবিত্র স্বভাবের মানুষ। প্রত্যেকটি মানুষই তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখত। তাঁর কথা মেনে চলত।

"এবং অবশ্যই আপনি মহৎ চরিত্রের অধিকারী।" –কুরআন।

তৃতীয় অধ্যায়
আল্লাহর আওয়াজ

— আঁধার আরবের চার অলঙ্কার

— আঁধার প্রেমীদের লজ্জাজনক কথাবার্তা

— হেরা গুহায় সত্যের সন্ধান

— শাকের পরে শোক

— ক্রীতদাসের ভাগ্যোদয়

— মহানবীর (সাঃ) অভিভাবকত্বে হযরত আলী

— নবুয়তের লক্ষণ স্পষ্ট হল

— হযরত জিব্রাঈলের আগমন ও তাঁর উদ্বিগ্নতা

— খাদিজার অন্তঃকরণে ঈমানের আলো

— ওয়ারাকা বিন নওফেলের সাথে সাক্ষাৎ

— ওহী থেমে থাকা

— পুনরায় ওহী আসা ও আবার থেমে থাকা

— সান্ত্বনার আশ্বাস

— আলী ও জায়েদের ঈমানের কোলে আশ্রয়

— সত্যবাদীদের অন্তর্গত আবু বকর

— মুসলমান ও ইসলাম প্রচার

— আবু তালিবের সমর্থন

— কুরাইশদের বিরোধিতা।

তৃতীয় অধ্যায়
আল্লাহর আওয়াজ
১

আরবের লোকেরা হজরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের শিক্ষা ভুলে গিয়ে আবার পৌত্তলিকতার অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু কুরাইশকুলের কিছু মানুষ এ বিপথগামিতা থেকে নিজেদের রক্ষা করে চলেছিলেন। তাঁরা শির্‌ক ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে তাঁদের পূর্বপুরুষ হজরত ইব্রাহীমের শিক্ষা তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন। তাঁরা মক্কাবাসীদের উদ্দেশে বললেন ঃ "কুরাইশ ভাইসব! ইব্রাহীমের সন্তানগণ! আল্লাহর ঘর পবিত্র কর। কাবাগৃহে তোমরা যেসব মূর্তি বসিয়ে রেখেছ, ওগুলিকে হটিয়ে দাও। তারা তোমাদের হাতেগড়া মূর্তি; তারা না পায় দেখতে, না পায় শুনতে। তাদের পূজা করে কী লাভ ? তোমরা তাদের পরিক্রমণ করছ, তাদের উপর অর্ঘ্য চড়াচ্ছ। তাদের নামে বলিও দিচ্ছ। ভাইসব! এ ধর্মের পরিবর্তে কোন সত্যধর্মের সন্ধান কর। ভাইসব! তওরাত ও ইঞ্জিলে এক নবীর কথা উল্লেখিত হয়েছে। সে নবী তোমাদের মধ্য থেকেই আসবেন। তিনি এসেও গিয়েছেন। ইহুদি আলেম, খ্রিস্টান পাদরি, কাহিন সবাই এ কথাই বলছেন। সেজন্য তোমরা অতীত পাপের জন্য অনুশোচনা করে সে মহাপুরুষের জন্য অপেক্ষা কর। এতে তোমরা দুনিয়াতেও সফল হবে, পরকালেও মুক্তি পাবে।"

ঐ সময়ে এ ছিল সম্পূর্ণ এক নতুন আওয়াজ। কুরাইশরা শুনে ভাবতে লাগল কে সে ব্যক্তি ? মনে তো হয় সে ব্যক্তি উমর বিন নুফাইলের পুত্র জায়েদ। নওফেলের পুত্র ওয়ারাকা, হারিসের পুত্র উসমান অথবা জহশের পুত্র উবাইদ!

এঁরা তৎকালীন আরব সমাজে সম্মানিত বিশিষ্ট ও ধনী লোক বলে পরিচিত ছিলেন। লোকেরা তাঁদের সম্মান করত। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই জানত যে, এঁরা ইব্রাহীমী (আঃ) ধর্মের অনুসারী। তাঁরা মদপান ও জুয়াখেলা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। মূর্তিপূজাকে তাঁরা ঘৃণার চোখে দেখতেন। নির্যাতিত কন্যা সন্তানদের প্রতি তাঁদের মায়া-মমতা ছিল অপরিসীম। যদি কখনো শুনতেন যে, কোন লোক তার কন্যা সন্তানকে জ্যান্ত কবর দিতে যাচ্ছে, তাহলে তাঁরা ছুটে গিয়ে তাদের রক্ষা করতেন। অন্নহীনতা ও দরিদ্রতার কারণে অথবা কন্যা সন্তান জন্মানোকে অভিশাপ মনে করে তাদের জ্যান্ত কবর দিতে উদ্যত হওয়া ব্যক্তিদের কাছ থেকে সে নিষ্পাপ শিশুকন্যাদের রক্ষা করে তাঁরা নিজেরাই তাদের মানুষ করতেন। বড় হলে তাদের পিতা তাদের মর্যাদার সাথে গ্রহণ করতে চাইলে তাদের কাছে সে কন্যাদের ফিরিয়ে দিতেন।

এর সবকিছুই ছিল সত্য কিন্তু অন্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিক আরববাসীদের তাঁরা ইব্রাহীমী ধর্মের অনুসরণে সত্য ও সঠিক পথে আহ্বানে অপারগ ছিলেন। কেননা, সে সত্যধর্ম সত্য-মিথ্যা, যৌক্তিক-অযৌক্তিক সবকিছু মিলেমিশে একটা কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। তা থেকে সুস্পষ্ট সত্যের আলো পাওয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তবুও ঐ চার ব্যক্তি চাইতেন যে, এ বিষয়ে খোলা-মেলা আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হোক। আর সেই সাথে ইব্রাহীমী ধর্মের অনুসরণে মূর্তি সংস্কৃতি বাতিল করা হোক। আপামর জনসাধারণ ফিরে আসুক একেশ্বরবাদী সত্যধর্মে।

এরকম টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে আরববাসীদের জীবন অতিবাহিত হয়ে চলল। এ সকল কাল্পনিক মূর্তিসকলই ছিল তাদের উপাস্য দেবতা। পুরুষানুক্রমে তারা মূর্তিপূজা করে এসেছে। কীভাবে তারা তা ত্যাগ করবে ? একথা তারা কল্পনাও করতে পারত না। তাঁদের সত্যপথে আহ্বানের কথা শুনে তারা মুখ ফিরিয়ে নিল। সত্যের আওয়াজকে তুচ্ছজ্ঞান করে তা শোনা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখল। তারা সত্যের আহ্বান শুনতে রাজি ছিল না। তারা তাঁদের অনেক গালিগালাজ করল। তাঁদের অনেক আঘাত দিল। তারা তাঁদের উপহাস করল। যত রকম ভাবে হামলা করা সম্ভব তারা তা করে তাঁদের কষ্ট দিল।

এভাবে এক যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেল। তাঁদের কেউ বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে গেল আর কেউ খ্রিস্টান হয়ে গেল। একমাত্র জায়েদই ইব্রাহীমের ধর্মের অনুসারী রয়ে গেলেন। তিনি কাবা শরীফের দেওয়ালে মাথা ঠুকতেন আর বলতেন– 'হে আল্লাহ! আমি যদি জানতাম কোন পথ তুমি পছন্দ কর তাহলে আমি সে পথই অনুসরণ করতাম। কিন্তু.... সে পথ আমার জানা নেই।' তারপর তিনি সিজদায় পড়ে মাথা ঠুকতেন।

২

এর চার ব্যক্তি সর্বসমক্ষে নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের কথা ঘোষণা দিলেন। তাঁরা তাঁদের জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও উপলব্ধি মতো সব কথা বয়ান করলেন। এসব কথা শুনে কুরাইশরা খুব উপহাস করল। সেই ব্যক্তিদের আজ এই অবস্থা হল যাঁরা শ্রেষ্ঠতা, ভদ্রতা ও মানবতার ক্ষেত্রে আরববাসীদের কাছে আদর্শস্থানীয় ছিলেন। তারাই আজ তাদের কাছে অসম্মান ও উপহাসের পাত্র। আর বাকি থাকলেন মাত্র এক ব্যক্তি। তিনি সমাজের একজন বিশিষ্ট যুবক, সবার নয়নের মণি আর হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা। যিনি তাদের কাছে প্রাণাধিক প্রিয় ব্যক্তি। তিনি একজন আলোকিত ব্যক্তিরূপে সবার কাছেই প্রতিভাত। তিনি সত্য ও সুন্দরের এক মূর্তিমান পুরুষ। হাঁ, তিনি আজও কোন সত্যের সন্ধান দিলেন না। তিনিও সত্যের সন্ধানে অভিনিবিষ্ট।

মক্কা থেকে ছয় মাইল দূরে হেরা নামক এক পাহাড় আছে। তাতে আছে এক গুহা যা 'গারে হেরা' নামে পরিচিত। মুহম্মদ (সাঃ) ঐ গুহায় চলে যেতেন। কোন সময় কয়েক দিন ও কয়েক রাত তিনি সেখানে অতিবাহিত করতেন। যে সত্যের সন্ধানে তিনি রত ছিলেন তারই ধ্যানে তিনি সেখানে নিমগ্ন থাকতেন। সে জ্ঞানের সন্ধানে তিনি ধ্যানমগ্ন থাকতেন।

রমজান মাসে তিনি জনসমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতেন। সেখানে দুনিয়াদারি ও জনসাধারণের কোন শোরগোল ও হাঙ্গামা ছিল না। সেখানে সর্বদাই সীমাহীন নীরবতা বিরাজ করত। সেখানে তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। সেখানে তিনি কয়েকদিনের খাদ্য পানীয় কাছে রাখতেন। ফুরিয়ে গেলে গৃহ থেকে পুনরায় নিয়ে যেতেন। কখনো বা বাড়ি থেকে সেখানে খাদ্য পানীয় পাঠিয়ে দেয়া হত।

এ ছিল তাঁর সাধনার জীবন। দিন রাত তিনি সেই সত্য ও সুন্দরের সাধনায় ডুবে থাকতেন। চিন্তার সমুদ্রে ডুবে থাকতেন। তাঁর মনের মধ্যে জাগত অসংখ্য -অগণিত প্রশ্ন। যে সত্য তাঁর চিন্তার সাগর হতে উদগীরিত হত তাই তিনি গ্রহণ করতেন আর যা তাঁর মনে সন্দেহ জাগাত, তা তিনি পরিত্যাগ করতেন।

জীবন ও জগতের স্বরূপ কী ? কী এর উদ্দেশ্য ? এ সব ছিল তাঁর দৈনন্দিন জীবনের জিজ্ঞাসা। এ সত্যের সন্ধানে তিনি গভীর চিন্তার সাগরে ডুবে থাকতেন।

এ অবস্থায় বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়ে চলল। প্রতিদিন তিনি গুহায় যেতেন। কিন্তু রমজান মাসে তিনি পুরোপুরি একা হয়ে যেতেন এবং দিনের পর দিন সেখানেই অতিবাহিত করতেন। পুনরায় যখন মক্কায় ফিরতেন তখন সবার আগে তিনি কাবা তওয়াফ (পরিক্রমা) করতেন।

তারপর তিনি পরিবার-পরিজন ও সন্তানাদিদের সাথে মিলিত হতেন। বিবি খাদিজা বড়ই শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে তাঁর কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন। তাঁর সমস্ত ভালো-মন্দের খবর নিতেন। বিবি খাদিজা জিজ্ঞেস করতেন ঃ 'সব কুশল তো ? মন-মেজাজ ভালো তো ? কোন অসুবিধা হয়নি তো ?'

তিনি বলতেন ঃ 'অসংখ্য শুকরিয়া সেই সর্বময় সত্তার প্রতি। তাঁর দয়ায়, তাঁর অনুগ্রহে সব ঠিক আছে।'

সন্তান-সন্ততিরা তাঁকে ঘিরে ধরত। যারা নিতান্ত ছোট তাদের কোলে নিয়ে আদর-সোহাগ করতেন। যারা বড়, তাদের সাথে কথা বলতেন। সবার ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করতেন। সন্তানদের মধ্যে যারা বড় তারা বলত ঃ 'আপনি কোথায় ছিলেন আব্বাজান ? আমরাও আপনার সাথে যাব।'

তিনি ছোট সন্তানদের কোলে তুলে নিতেন। আদর সোহাগ করতেন, তাদের সাথে মিষ্টিমধুর আলাপ করতেন আর বলতেন ঃ 'ঠিক আছে, এক সময় আমি তোমাদের সাথে করে নিয়ে যাব।'

কিছু সময় তিনি বাল-বাচ্চাদের সাথে সময় কাটাতেন। তাদের মিষ্টি কথায় তিনি খুশি হতেন। তাদের সাথে হাসতেন আর এক গভীর পরিতৃপ্তির স্বাদ অনুভব করতেন। তারপর, তিনি আবার যথাসময়ে হেরা গুহায় প্রত্যাবর্তন করতেন।

কিন্তু এ আনন্দময় মুহূর্তের দিনগুলি তাঁর জন্য আর সুস্থায়ী হতে পারল না। তাঁর পুত্র সন্তানেরা সেই মহিমাময় সত্তার উদ্দেশে এক একে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করল। কাসিম, তাইয়্যিব, তাহির সবাই চলে গেলেন। একের পর এক আঘাত পেতে লাগলেন তিনি। তবু ধৈর্য ধারণ করতে লাগলেন। শৈশবে মা-বাপ হারিয়ে তিনি এতিম হয়েছিলেন আর বড় হয়ে কালিজার টুকরো সন্তানদের হারিয়ে পুত্রহারা শোকাহত পিতা হলেন। অসীম ধৈর্যের সাথে সমস্ত শোকব্যাথা নীরবে সয়ে গেলেন।

পুত্র সন্তানেরা সবাই চলে গেলেন কিন্তু রয়ে গেলেন কন্যা সন্তানেরা। তাঁর চার কন্যা হলেন জয়নব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা।

জয়নব বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাঁকে আবুল আসের সাথে বিয়ে দেয়া হল। এ আস ছিল খাদিজার ভাইপো ও রবীর পুত্র। রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে বিয়ে দেয়া হল উত্‌বা ও উতাইবার সাথে। এরা ছিল আবু লাহাবের পুত্র।

তিন কন্যার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সাথে রয়ে গেলেন কনিষ্ঠা কন্যা কলিজার টুকরা ফাতিমা। তাঁর কোন পুত্র-সন্তান আর জীবিত ছিলেন না। কিন্তু ভাগ্যত দুই পুত্রের পিতা হলেন!

হুকাইম বিন হিজাম নামে খাদিজার এক ভাইপো ছিল। একদিন বিবি খাদিজা তার সাথে দেখা করতে গিয়ে তাঁর সাথে তার গোলামকেও নিয়ে এসেছিলেন। সে ছিল ভারি সুন্দর। সে বড় আদর যত্নে মানুষ হয়েছিল। একদিন মুহম্মদ (সাঃ) বললেন– 'খাদিজা, এ কার পুত্র ?'

খাদিজা ঃ 'আমার ভাইপো হুকাইম সিরিয়া থেকে কিছু গোলাম কিনে এনেছিল। তাদের মধ্য থেকে একে আমাকে দিয়েছিল।'

মুহম্মদ (সাঃ) ঃ 'আল্লাহর কসম, এর চেহারায় ভদ্রতার পরিচয় সুস্পষ্ট। তার মধ্যে বুদ্ধিমত্তারও লক্ষণ আছে।'

খাদিজা ঃ 'সে যথেষ্ট আদর যত্নে মানুষ হয়েছে।'

হাবশার এক বাজার থেকে এ গোলামকে বিক্রি করা হয়েছিল। বনী কাইনরা তাকে বিক্রি করেছিল। মুহম্মদ (সাঃ) বড়ই স্নেহের দৃষ্টিতে সে গোলামের পানে তাকালেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'বৎস! তোমার নাম কী ?'

গোল।ম ঃ 'আমার নাম জায়েদ।'

মুহম্মদ (সাঃ) ঃ 'তোমার বংশ পরিচয় কী ?'

গোলাম ঃ 'আমার পিতার নাম হারিস। দাদার নাম শূরাহবিল ও পরদাদার নাম কা'ব। আমার মায়ের নাম সওদা, তিনি সালিবার কন্যা। তিনি তাঈ গোত্রের সাথে সম্পর্কিত।' তিনি বিবি খাদিজাকে বললেন ঃ 'এখন কী সে আমার গোলাম নয় ?'

খাদিজা ঃ 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা নয় কেন ? সে তো আপনারই।'

মুহম্মদ (সাঃ) তৎক্ষণাৎ সে গোলামকে আজাদ করে দিয়ে তাকে পুত্রবৎ গ্রহণ করে নিলেন। তারপর তিনি ঐ গোলামের মাতা-পিতার কাছে লোক পাঠালেন। তাদের সম্মতিতেই তিনি তাকে নিজের কাছে রাখবেন। যাতে আর কোন সন্দেহ না থাকে।

খবর পেয়েই জায়েদের মাতা-পিতা মক্কায় এসে পৌঁছালো। তারা তাঁর কাছে আবেদন করল ঃ 'আমাদের কাছ থেকে যা ইচ্ছা মূল্য নিন আর আমাদের সন্তানকে ফিরিয়ে দিন।'

তিনি বললেন ঃ 'এক শর্তে।'

তারা বলল ঃ 'কী শর্ত ?'

তিনি বললেন ঃ 'ডেকে এনে আমি তাকে ছেড়ে দিচ্ছি। যদি সে স্বেচ্ছায় তোমাদের সাথে যেতে চায়, তাহলে তাকে তোমরা নিয়ে যেতে পারবে। তার বিনিময়ে কোন টাকা-পয়সার প্রয়োজন নেই আমার। আর যদি সে তোমাদের সাথে না গিয়ে আমার কাছে থাকতে চায়, তাহলে কিন্তু আমি তাকে জোর করে নিয়ে যেতে দেবো না। যে আমাকে না ছাড়বে, আমিও তাকে ছাড়ব না।'

তারা বলল ঃ 'এ তো আপনার অনুগ্রহ।' জায়েদকে হাজির করা হলে তিনি তাকে বললেন ঃ 'দেখ, দুজন অতিথি এসেছেন। তুমি কী তাদের চেন ?'

জায়েদ বলল ঃ 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এঁদের একজন আমার আব্বা ও একজন আমার চাচা।'

তিনি বললেন ঃ 'তোমার ইচ্ছা। তুমি চাইলে এদের সাথে চলে যেতে পারো, না চাইলে তুমি আমার কাছে থেকে যেতে পারো।

সে দ্রুত এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলল ঃ 'না, না, আমি যাব না। আমি আপনার সাথে থাকব।

জায়েদের পিতা হারিস রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে কড়া ধমক দিয়ে বলল ঃ 'জায়েদ! মা-বাপ আর মাতৃভূমি ছেড়ে তুমি গোলাম হয়ে থাকতে চাও ?'

জায়েদ বলল ঃ 'ইনি তো আমাকে গোলাম করে রাখেননি। এমন মহৎ মানুষকে ছেড়ে আমি কখনো যেতে পারব না।'

মুহম্মদ (সাঃ) জায়েদের হাত ধরে কুরাইশদের কাছে নিয়ে এসে বললেন ঃ 'আপনারা সাক্ষী থাকুন, এ আমার পুত্র। এ আমার ওয়ারিশ হবে আর আমি হব তার ওয়ারিশ।'

হারিস এ ঘটনা দেখে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে পড়ল। তারপর ছেলেকে তাঁর কাছে রেখেই সে চলে গেল।

এর অল্পকাল পরে তাঁর চাচাত ভাই তাঁর অভিভাবকত্বে চলে এলেন। ইনি তাঁর চাচা আবু তালিবের পুত্র। এভাবে জায়েদ ও আলী দুজনে মিলে তাঁর কাছে রয়ে গেলেন আর মহানন্দে জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন।

এটা কেন হল ? এর কারণ আবু তালিবের অনেক সন্তানাদি ছিল। কিন্তু তাঁর ধন-সম্পদ সে হিসেবে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না। সেজন্য অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে দিন গুজারা করতেন। এ অনটন এক সময় খুব উদ্বেগজনক অবস্থায় এসে পৌঁছালো। এ সময়ে তৎকালীন আরব দেশে এক অভূতপূর্ব দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছিল। শুধু আবু তালিব কেন ? সে সময় দেশের অনেক ধনী লোকও কাঙাল হয়ে গিয়েছিল। তাঁর অন্য এক চাচা ছিলেন আব্বাস। ইনি বনী হাশিম গোত্রের অন্যতম ধনী লোক ছিলেন। মুহম্মদ (সাঃ) তাঁকে বললেন ঃ 'আমরা দু'জন মিলে চাচা আবু তালিবের দুই পুত্রকে আমাদের কাছে এনে রাখি। তাতে তাঁর বোঝা কিছুটা হালকা হবে আর পেরেশানিও অনেকটা কমবে।' আব্বাস এ প্রস্তাব মেনে নিলে দুজনে আবু তালিবের কাছে গিয়ে এ প্রস্তাব রাখতে আবু তালিব বললেন ঃ 'যাদের ইচ্ছা নিয়ে যাও।'

আব্বাস নিলেন জাফরকে আর তিনি নিলেন আলীকে। সেই থেকে আলী চিরকালের জন্য তাঁর পুত্রসম হয়ে গেলেন আর তিনি চিরকালের জন্য হয়ে গেলেন তাঁর দায়িত্বশীল অভিভাবক ও পিতা।

৩

মুহম্মদ (সাঃ) চল্লিশ বছরের কাছাকাছি বয়সে পৌঁছে গেলেন।

এখন তাঁর মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য প্রস্ফূটিত হতে লাগল যে সত্যের সন্ধানে তিনি জীবনের এতটা সময় গভীর সাধনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন। বছরের পর বছর ধরে যে সত্যের সাধনায় তিনি নিমজ্জমান ছিলেন, যে ইবাদত ও তপস্যায় রত ছিলেন, সে সত্য এবার তাঁর আত্মাকে আলোকিত করে তুলতে লাগল। ক্ষণে ক্ষণে আলোর দীপ্তিতে হৃদয় আলোকিত হয়ে ওঠে। হৃদয় চমকে ওঠে, কখনো বা এমনও হয় যেন মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়ে যেতে পারে।

তিনি স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। তাঁর মধ্যে সত্যের আলো প্রকাশমান হয়ে পড়ল। মনের আকাশ হতে যেন নিরাশার কালো মেঘ সরে গেল। যে সাধনা তিনি এত দিন করে এসেছেন, তা যেন আজ সফল হতে চলেছে। তিনি স্বপ্নে দেখলেন– সারা দুনিয়া স্নিগ্ধ সুন্দর আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে। সর্বত্রই সুখ আর শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। অশান্তি আর অন্ধকার দূরিভূত হয়ে গেছে। এখন শুধু চিরবরণীয় ও চিরস্মরণীয় একটি মুহূর্তের জন্য অপেক্ষামাত্র।

তাঁর সত্যদৃষ্টি উন্মীলিত হতে লাগল। তিনি দেখলেন, তাঁর চারপাশের মানুষেরা কী রকম অন্যায় ও ভ্রান্ত পথে ধাবিত হয়ে নিজেদের ইহ-পরকালের সর্বনাশ সাধন করছে। তারা সত্য ও সুন্দরের পথ হতে কত দূরে সরে গেছে।

তিনি তাঁর সত্যদৃষ্টি ও বোধশক্তি দিয়ে অনুভব করলেন একমাত্র আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টিকুলের প্রভু ও উপাস্য। তাঁর শরীক ও বিকল্পও কেউ নেই ; কিছুই নেই। সমস্ত মানুষই তাঁর বান্দা। সমগ্র সৃষ্টিকুল ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তারই অধীন। তিনি সকলকেই তার কাজের প্রতিফল দেবেন। ভালো কাজের ভালো ফল, মন্দ কাজের মন্দ ফল সমস্ত মানুষকেই পেতে হবে।

তাঁর দেখা সমস্ত স্বপ্নই সত্যদৃষ্টি ও অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধ। যা জানার জন্য, যে সত্য উপলব্ধির তিনি বছরের পর বছর ধরে সাধনা করে এসেছেন তা চন্দ্রসূর্যের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে তাঁর সামনে ধরা দিল। অসারতা ও মিথ্যাচারিতা তাঁর দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে গেল। এক কথায়, সত্য ও মিথ্যা, আলো ও অন্ধকার, ন্যায় ও অন্যায়, স্বর্গ ও নরক সমস্ত কিছুই তাঁর চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল। তাঁর হৃদয় আলোকিত হল। তিনি বড়ই খুশি হলেন। কিন্তু সেই সাথে তিনি কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন– ভীতসন্ত্রস্তও হলেন।

তিনি যে সত্য ও সুন্দরের স্বরূপ সন্ধানে এতদিন নিমজ্জিত ছিলেন তার সন্ধান পেয়ে তাঁর আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা রইল না। কিন্তু এ সত্য প্রচার করলে লোকেদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে ? কী তার পরিণাম হবে ? একথা ভেবে তিনি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন, ভয়ে তাঁর প্রাণ কাঁপতে থাকে।

আল্লাহ্ তাঁকে সত্যপথ দেখালেন। তিনি তাঁকে সেই পথ দেখালেন যা তিনি তাঁর পুণ্যাত্মা বান্দাদের দেখিয়েছেন। কিন্তু লোকেরা তো পথভ্রষ্ট। কে তাদের সে সত্য সুন্দরের পথে আহ্বান করবে ? অসত্যের পথ থেকে কে তাদের ফিরিয়ে আনবে ? তাদের হৃদয় কীভাবে সত্যালোকে আলোকিত হবে ?

স্বপ্ন যখন প্রভাতের অরুণোদয়ের মতো স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হতে লাগল, আর যখন তিনি অজ্ঞাত কথা জ্ঞাত হতে লাগলেন তখন তাঁর মধ্যে নানা ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের প্রকোপ দেখা দিতে লাগল। তা নিয়ে তিনি আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে লাগলেন। নিজের আবিষ্কৃত সত্যের প্রতি সন্দিহান হয়ে উঠতে লাগলেন। ভাবেন, আমি মানসিক রোগী নই তো ? আমার উপরে ভূত-প্রেতের আছর হয়নি তো ? এসব কথা তিনি সমস্তটাই বিবি খাদিজাকে শোনালেন। তাঁর মনের অবস্থাও তাঁকে শোনালেন। খাদিজা সব কথা গভীর মনোযোগের সাথে শুনলেন। তারপর গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সাথে বললেন ঃ 'আমার জীবনসাথী! আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। শয়তান আপনাকে কীভাবে প্রতারণা করতে পারে ?'

আবার রমজান মাস আসার সাথে সাথেই তিনি হেরা গুহায় চলে গেলেন। আগের সমস্ত ধ্যানধারণা মন থেকে মুছে ফেলে আবার গভীর সাধনায় নিমগ্ন

হলেন। যথারীতি ইবাদত-উপাসনা করতে লাগলেন। কোন কোন সময় বাড়ি থেকে খাদিজা এসে প্রয়োজনীয় পানাহার রেখে যেতেন আর তাঁকে দেখে চোখ জুড়িয়ে যেতেন। গরীব ও সাহায্যপ্রার্থীরাও তাঁর সাথে দেখা করত, তিনি তাদের সাহায্যও করতেন।

এভাবে রমজান মাসের কয়েক দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। সেদিন তিনি গুহায় বিশ্রামরত ছিলেন। প্রভাতের এক মধুর সময় ছিল। এমন সময় আচমকা এক ফিরিশতা তাঁকে দেখা দিলেন। অপূর্ব সুন্দর আলোকিত চেহারা তাঁর। তাঁর হাতে অপূর্ব সুন্দর এক টুকরো রেশমের কাপড়। তিনি তাঁকে বললেন ঃ 'মুহম্মদ! পড়।'

তিনি ভীষণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন ঃ 'আমি পড়তে পারি না।'

ফিরিশতা তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তখন তাঁর মনে হতে লাগল তাঁর গলার মধ্যে ঘড়ঘড় করছে। শরীর যেন দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে। ফিরিশতা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ 'পড়।'

মুহম্মদ বললেন ঃ 'আমি পড়তে পারি না।'

ফিরিশতা আবার তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর বুকের মধ্যে। তাঁর আবারো মনে হতে লাগল তাঁর গলার মধ্যে ঘড়ঘড় করছে, শরীর দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে। তিনি পুনরায় ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ 'পড়।'

এবার তাঁর মনে হল আবারো গলা ঘড়ঘড় করবে এবং দেহের হাড়গোড় দুমড়ে-মুচড়ে যাবে।

মুহম্মদ বললেন ঃ 'কী পড়ব ?'

ফিরিশতা বললেন ঃ 'পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। যিনি একবিন্দু অপবিত্র পানি হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পড়, তোমার দয়াময় প্রভুর নামে, যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞানদান করেছেন, মানুষকে তিনি সেই জ্ঞান দান করেছেন– যা তারা জানত না।'

ফিরিশতার পড়ার সাথে সাথে তিনিও পড়লেন। পড়তে পড়তেই তা তাঁর হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়ে গেল। ফিরিশতা নিষ্ক্রান্ত হলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। প্রচণ্ড ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সমস্ত চেহারায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ভীতসন্ত্রস্ত চিত্তে তিনি গুহার চারিদিকে দেখতে লাগলেন। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিন্তা করতে লাগলেন ঃ

'কে আমার সাথে কথা কয়ে গেল ? কে আমাকে এভাবে পড়িয়ে গেল ?'

তারপর দ্রুতপদে বেরিয়ে এলেন গুহা থেকে। এবার তাঁর বিশ্বাস হল যে, এ ঘটনা জ্বিনের প্রভাবে ঘটেছে। তিনি পাহাড়ি এলাকা থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলেন। তাঁর সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল আর বার বার মনে হতে লাগল আগে থেকেই যে স্বপ্ন তিনি এতদিন দেখে এসেছেন, এতদিনে তা সত্য প্রমাণিত হল। তিনি অনেক নতুন সত্যের সাথে পরিচিত হলেন। এতদিন যাবৎ

যা তিনি অনুসন্ধান করে আসছিলেন তা তার সামনে প্রতিভাত হল। কিন্তু যে এসেছিল, সেই কে ? যে আমাকে পড়তে বলেছিল, কী তার পরিচয় ?

হঠাৎ একটি আওয়াজ তাঁর কানে এলো। কে যেন তাঁকে বলছে– 'মুহম্মদ!'

তিনি চমকে উঠলেন। ঘাবড়ে গিয়ে উপরের দিকে তাকালেন। দেখলেন, ফিরিশতা মানুষের চেহারা ধারণ করে আকাশ আলোকিত করে দাঁড়িয়ে আছে। সে ফিরিশতা বলল ঃ 'মুহম্মদ! তুমি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল আর আমি ফিরিশতা জিব্রাঈল।'

তিনি আরো ঘাবড়ে গেলেন। তাঁর সমস্ত চেহারায় ভয়ের লক্ষণ ফুটে উঠল। ভয়ে তাঁর পা জমে গেল। তিনি ভয়ে ভয়ে একবার বামদিকে, একবার ডানদিকে, একবার সামনে, একবার পিছনে যেদিকেই তাকাতে লাগলেন, দেখলেন সে ফিরিশতা একইভাবে দণ্ডায়মান। সামনে, পিছনে, উপরে, নীচে– এক কথায় সর্বত্রই সে ফিরিশতাকে দেখা যেতে লাগল।

দেখতে দেখতে অনেক দেরি হয়ে গেল। তিনি একইভাবে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন আর সেই সাথে সম্ভব অসম্ভব নানা চিন্তাভাবনায় তাঁর মধ্যে তোলপাড় হয়ে যেতে লাগল। এদিকে বিবি খাদিজা তাঁর কাছে লোক পাঠালেন। সে তাঁকে সেখানে না পেয়ে আত্মীয়-স্বজনদের কাছে গিয়ে খোঁজ করল। কিন্তু সেখানেও তাঁকে পাওয়া গেল না। অনুসন্ধানকারী এদিকে ওদিকে সর্বত্রই তাঁকে খুঁজে ফিরল কিন্তু কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না।

ফিরিশতা চলে গেল। তিনি বিবি খাদিজার কাছে পৌঁছালেন। তখনও তিনি ভয়ে কাঁপছিলেন। কাঁপতে কাঁপতে বললেন ঃ 'আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও, কম্বল জড়িয়ে দাও।'

বিবি খাদিজা সাথে সাথে তাঁকে কম্বল জড়িয়ে দিলেন। তাঁর এ কম্পমান অবস্থা দেখে তিনিও খুবই ঘাবড়ে গেলেন। তাঁর মনে হতে লাগল তিনি কী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ? তিনি জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন ? সেজন্য কী তাঁর এত শীত লাগছে ? তাঁর উপরে কী কোন মুসীবত এসে পড়েছে ? যখন তাঁর ভয়ভয় ভাব অনেকটা দূর হল, শরীরের কাঁপুনি কমে গেল তখন খাদিজা বললেন ঃ 'আপনি কোথায় ছিলেন? আপনার কী হয়েছে ? খাদিজার দিকে তাকিয়ে তিনি যেন কিছুটা বিবশ হয়ে গেলেন। ভীত-সন্ত্রস্ত চিত্তে তিনি বললেন ঃ

'খাদিজা! বল আমার কী হয়েছে ? তুমি বল আমার কী হয়েছে ? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

তারপর তিনি সমস্ত বর্ণনা করলেন এবং বললেন ঃ 'আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে।' বিবি খাদিজা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন। তাঁর কথা শুনে তিনি বিন্দুমাত্র চিন্তিত হলেন না। তিনি তাঁকে যারপরনাই শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁর মনে গভীর প্রত্যয় জাগল, তাঁর অন্তর থেকে বিশ্বাসের আলো ঝলক দিয়ে উঠল। তিনি তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যার

হাতে খাদিজার জীবন সুরক্ষিত। আপনি এ উম্মতের নবী হবেন। আপনি সত্যবাক্য বলেন, আত্মীয়-পরিজনদের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেন, আমানতের খেয়ানত করেন না, আপনি গরীবের সহায় ও ভরসাহীনদের ভরসাস্থল, আপনি অতিথিপরায়ণ, সদাসর্বদাই আপনি কল্যাণকর্মে রত; আল্লাহর শপথ, এ গুণাবলী যাঁর মধ্যে আছে, আল্লাহ তাঁকে কখনই অপদস্থ করবেন না।'

খাদিজার এ কথায় তিনি বড়ই আশ্বস্ত হলেন, তাঁর বিবশতা দূরীভূত হল, চেহারা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি আনন্দিত চিত্তে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। তারপর পুনরায় শুয়ে পড়লেন।

খাদিজা এ সমস্ত ঘটনার কথা চিন্তা করে বড়ই খুশি হলেন, মনে মনে ভীতও। মুহম্মদ (সাঃ) এর প্রতি তাঁর ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালোবাসার সীমা-পরিসীমা ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁর মনে কিছু ভয় ও সন্দেহ জেগে উঠল। তাই তিনি ভাবলেন, তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকার কাছে গিয়ে এ সব বিষয়ে প্রশ্ন করবেন। সম্ভবত, এসব বিষয়ে তিনিই ভালো বলতে পারবেন।

ওয়ারাকা ছিলেন নওফেলের পুত্র। তিনি সমাজে একজন বিশিষ্ট আলেম বলে পরিচিত ছিলেন। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। গভীর আন্তরিকতার সাথে তিনি বিভিন্ন, ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। প্রথমে ইহুদি ধর্মের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন পরে খ্রিস্টধর্মে। ইঞ্জিল শরীফের প্রতি তাঁর গভীর আন্তরিকতা ছিল। হিব্রু ভাষা থেকে তা তিনি আরবিতে অনুবাদও করতেন। খাদিজা তাঁকে সমস্ত বৃত্তান্ত শোনালেন। তাঁর উপর যা-কিছু ঘটেছিল, তা তিনি সবিস্তার বর্ণনা করলেন। সবকিছু শুনে ওয়ারাকা বললেন– 'সাধু, সাধু। সেই সত্তার কসম, যার হাতে ওয়ারাকার জীবন-মরণ। খাদিজা! তুমি যা-কিছু বলেছো, তা যদি সত্যি হয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই যে,. অবতরিত ব্যক্তি ফিরিশতা। তিনি মূসা (আঃ) এর কাছেও আসতেন আল্লাহর প্রত্যাদেশ নিয়ে। আল্লাহর কসম, ইনি আল্লাহর প্রেরিত নবী। তাঁকে বলো, কোন ভয় নেই, যা করছেন, তাই তাঁকে করে যেতে বলো।'

বিবি খাদিজা ফিরে এসে মুহম্মদ (সাঃ) কে সুসংবাদ শোনালেন। বললেন ঃ 'শুভ হোক, শুভ হোক, এ সৌভাগ্যের বার্তা, সর্বশ্রেষ্ঠ সংবাদ।'

তারপর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের সাথে যা-কিছু কথাবার্তা হয়েছে, তা তিনি সবিস্তার বর্ণনা করলেন। তখন তিনি তাঁর সাথে কথা বলতে চাইলে খাদিজা তাঁকে সাথে করে ওয়ারাকার কাছে নিয়ে এলেন। সেই সাথে তিনি ঈমানও আনলেন।

তিনি কাবা তওয়াফ করতে চললেন। রাস্তায় ওয়ারাকার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। দেখা হতেই তিনি বললেন ঃ 'মুহম্মদ! তুমি কী দেখ ?' মুহম্মদ (সাঃ) সুস্পষ্টভাবে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। ওয়ারাকা বললেন ঃ 'যাঁর হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার শপথ। তুমি এ উম্মতের নবী হবে। ইনি সেই ফিরিশতা, যিনি নবী মূসা'র কাছে প্রত্যাদেশ নিয়ে হাজির হতেন। মুহম্মদ! তোমার নবুয়তির কথা

ঘোষণা করলে লোকে তোমাকে মিথ্যুক বলবে, তোমার উপর জুলুম-অত্যাচার করবে, তোমার দেশের লোকেরা তোমাকে দেশছাড়া করবে। তারা তোমার সাথে যুদ্ধ করতেও পিছপা হবে না। হায়, আমি যদি ততদিন জীবিত থাকতাম!'

মুহম্মদ (সাঃ) বললেন ঃ 'কী ? লোকে আমাকে দেশছাড়া করবে ?'

ওয়ারাকা বললেন ঃ 'হাঁ, হাঁ, যখনই কোন নবী আল্লাহ্‌র বাণী নিয়ে মানুষের কাছে হাজির হয়েছে, তারাই ঐ একই ব্যবহার করেছে। হায়, আমি যদি ততদিন বেঁচে থাকতাম, তাহলে আমি তোমার সহযোগী হতাম।'

তারপর তিনি তাঁর কপোল চুম্বন করলেন।

প্রিয়নবী গৃহে ফিরে এলেন। কিন্তু দুশ্চিন্তা আর উদাসীনতা তাঁকে আচ্ছন্ন করে রইল। বারবার চিন্তা করতে লাগলেন– আমার দুর্বল কাঁধের উপরে নবুয়তের ভার এসে পড়ল। আমি এত বড় দায়িত্ব পালন করতে পারব তো ?

আমি লোকেদের কীভাবে সত্যের পথে আহ্বান করব ? আমি কীভাবে তাদের সরল-সত্যের পথ দেখাব ? তারা তো সত্য-সুন্দরের পথ থেকে বিমুখ জীবন যাপন করছে। তারা আল্লাহর থেকে মুখ ফিরিয়ে মূর্তিপূজায় ডুবে রয়েছে। তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে তো মিথ্যার উপাসনায় লিপ্ত রয়েছে! শুধু তো তাই নয়, এই মিথ্যার জন্য তো তাদের গর্বের সীমা নেই।

অগণিত চিন্তা-ভাবনায় তাঁর সমস্ত সত্তা আলোড়িত হতে লাগল। আর তিনি নতুন প্রত্যাদেশ (ওহী) আসার অপেক্ষায় দিন গুণতে লাগলেন।

৪

এবার ফিরিশতার আগমনের অপেক্ষায় দিন অতিবাহিত হতে লাগল। সেই ফিরিশতা যাঁর সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। ওয়ারাকা ইবনে নওফেল যাঁর কথা বলেছিলেন। যিনি আল্লাহর তরফ হতে প্রত্যাদেশ (ওহী) নিয়ে মূসার কাছে আগমন করতেন। আর বিবি খাদিজা পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে যাকে আল্লাহর ফিরিশতা বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

তিনি দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে লাগলেন। দীর্ঘ অপেক্ষার মধ্য দিয়ে অনেক দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল তবু জিব্রাঈল এলেন না। তাঁর উপরে আর কোনো প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হল না।

আবার তাঁর মধ্যে দুশ্চিন্তা সৃষ্টি হল ঃ 'এখন আমি কী করব ? লোকেদের আমি কী করে বোঝাব ? জিব্রাঈল আমার কাছে আর আসছে না কেন ? জিব্রাঈল কোন প্রত্যাদেশ আর আনছে না কেন ?' দুশ্চিন্তা তাঁকে ঘিরে ধরল। আলোকিত চেহারা যেন মলিন হয়ে যেতে চাইল। তাঁর মধ্যে উদাসীনতা দেখা দিল। হাস্যোজ্জ্বল হৃদয় হতে কান্না উৎসারিত হতে চাইল। বিবি খাদিজার মানসিক অবস্থাও তথৈবচ। তিনিও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মানসিকভাবে তিনিও দুর্বল হয়ে পড়লেন। কিন্তু সকলেই ধৈর্যধারণ করতে লাগলেন। মনের দুশ্চিন্তা তাঁরা

চেহারায় প্রকাশিত হতে দিলেন না। নানা ভাবেই অশান্ত মনকে শান্ত করতে লাগলেন। মনে আশার আলো জ্বালিয়ে রাখলেন। তিনি পুনরায় যথারীতি হেরা গুহায় যেতে লাগলেন। সেখানেই তিনি দিন-রাত ইবাদত করতেন এবং প্রভুর উদ্দেশে বলতেন ঃ

'প্রভু! তুমি আমাকে নবী মনোনীত করেছ, কিন্তু এখন কী হল ?' তিনি দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন। যেখানেই যেতেন এ দুশ্চিন্তা তাঁর সাথী হত। প্রচণ্ড মানসিক অবসাদে তিনি যেন ভেঙে পড়তে লাগলেন। কখনো ভাবলেন পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে জীবন বিসর্জনের মধ্য দিয়ে সব দুশ্চিন্তার অবসান ঘটাবেন। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, মানসিকভাবে তিনি কতটা ভেঙে পড়েছিলেন।

এ ছিল তাঁর জন্য চরম বেদনাদায়ক অস্বস্তিকর এক মানসিক অবস্থা। দুশ্চিন্তার বোঝা দিনের পর দিন তাঁর ঘাড়ে চেপে বসতে লাগল। প্রত্যাদেশ (ওহী) বন্ধ থাকাটা তাঁর জন্য ছিল এক চরম অসহনীয় ব্যাপার। ভাবলেন, প্রভু কী আমাকে ত্যাগ করেছেন ? এ বোধ তাঁর মধ্যে তীরের ফলার মতো আঘাত হানতে লাগল।

একদিন তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। অকস্মাৎ আকাশ হতে গায়েবী আওয়াজ তাঁর কানে ভেসে এলো। মাথা উঁচু করে দেখলেন সেই ফিরিশতা সারা আকাশ জুড়ে এক সুবর্ণ সিংহাসনে বসে আছেন। তিনি তাঁকে চিনতে পারলেন। ইনিই ফিরিশতা জিব্রাঈল, হেরা গুহায় তিনিই প্রত্যাদেশ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

হে আল্লাহ্! এই দীন বান্দার প্রতি কী অসীম অনুগ্রহ তোমার!!

ফিরিশতাকে দেখেই তাঁর সমস্ত সত্তা মহানন্দে হিল্লোলিত হয়ে উঠল। তাঁর মধ্যে পূর্বের মতো কম্পন সৃষ্টি হল। জোরে হাওয়া বইলে যেমন কোন কিছু দুলতে থাকে, তিনি তেমনই দুলতে লাগলেন। এই কম্পন কী আগের মতো অজ্ঞতাজনিত কম্পন ছিল ? এ ভয়, কম্পমানতা ও দোদুল্যমানতা কী পূর্বের মতোই ছিল ? না; বরং এ ছিল স্বর্গীয় মাধুর্যমণ্ডিত এক সুন্দর সুখানুভূতি। তা ছিল আত্মপ্রত্যয় এ প্রসন্নতার এক যুগল অনুভূতি। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘরে চলে এলেন। কাঁপতে কাঁপতে বললেন ঃ 'আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও, আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও।' তাঁকে কম্বল জড়িয়ে দেওয়া হল। এমন সময় সেই ফিরিশতাই প্রত্যাদেশ নিয়ে অবতীর্ণ হলেন, প্রত্যাদেশ হল ঃ

'হে বস্ত্র আচ্ছাদনকারি ! ওঠো এবং তোমার প্রভুকে ভয় করো, তাঁর মাহাত্ম্য প্রচার করো এবং অংশীবাদিতা ও অপবিত্রতা হতে নিজেকে পবিত্র রাখো।'

এবার তাঁর আত্মা প্রশান্ত হল। স্বস্তি ও শান্তিতে তাঁর সমস্ত হৃদয়-মন-প্রাণ ভরে উঠল। সমস্ত দেহমন গভীর আত্মপ্রত্যয়ে জেগে উঠল। সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হয়ে গেল। সমস্ত বিপদ কেটে গেল।

সমস্ত ঘটনা সন্দর্শনে খাদিজার হৃদয়-মন-প্রাণও এক স্বর্গীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তাঁর চেহারা সদ্যফোটা গোলাপের মতো উৎফুল্ল হয়ে উঠল। হওয়ারই কথা। কেননা, তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে, মনের সাধ পূর্ণ হয়েছে। প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষমাণ ছিলেন। এবার তা এসে যাওয়াতে আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা রইল না।

এর পরে আরো কয়েকবার প্রত্যাদেশ এলো। হজরত জিব্রাঈল আসতে থাকলেন। প্রভুর বার্তা পৌঁছে দিতে লাগলেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় প্রত্যাদেশ আবারো কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। লোকেদের ইসলামে আহ্বানের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিধর্মীরা সমভাবে তাঁর বিরোধিতাও করে যাচ্ছিল। বিরোধিতার জন্য এরকম একটা সুযোগের সন্ধানেই তারা তৎপর ছিল। প্রত্যাদেশ বন্ধ হওয়ায় তারা বিরাট সুযোগ পেয়ে গেল। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তারা পিছপা হল না। তারা এবার বলতে লাগল ঃ

'মুহম্মদ! তোমার নবুয়তের কী হল ? দু'চার দিন তো খুবই গায়েবী কথা শোনালে, তারপর সব থেমে গেল ? জিব্রাঈল পথ ভুলে গেল ? সব কথা শেষ ? মানুষকে এবারে কী শোনাবে ? ভাই মুহম্মদ ! মনে হচ্ছে তোমার প্রভু তোমার উপর খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সেজন্য তিনি তোমার উপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।'

প্রত্যাদেশ বন্ধ থাকাটা তার জন্য যেমন অসহনীয় ব্যাপার ছিল তেমনই তাঁর উদ্দেশ্যে বিধর্মীদের বিদ্রূপও ছিল চরম কষ্টদায়ক ব্যাপার। বিধর্মীদের এসব নির্দয় আচরণ তাঁকে তীরের মতো আঘাত করতে লাগল। তিনি খুবই বিবশ হয়ে পড়লেন। কিন্তু খুব বেশিদিন অতিবাহিত হতে না হতেই হজরত জিব্রাঈল আবার প্রত্যাদেশ নিয়ে অবতীর্ণ হলেন!

"আলোকিত দিন ও অন্ধকার রজনীর শপথ যখন তা সমগ্র জগৎকে আচ্ছন্ন করে। তোমার প্রভু তোমাকে ত্যাগ করেননি এবং তোমার উপর অসন্তুষ্টও হননি। আর তোমার কাছে প্রত্যাদিষ্ট বাণী পূর্বের চেয়ে অনেক মূল্যবান। অতি সত্বরই তোমার প্রভু তোমার উপর তা অবতীর্ণ করবেন। তিনি কী তোমাকে এতিম রূপে পেয়ে তোমাকে আশ্রয় দেননি এবং পথহারা থেকে তোমাকে সত্য ও সরল পথ দেখাননি ? আর তোমাকে ধনহীন অবস্থায় পেয়ে তোমাকে ধনবান করেননি ? অনন্তর এতিমকে কষ্ট দিয়ো না এবং সাহায্যপ্রার্থীকে বিমুখ করো না; আর তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে বরাদ্দ নিয়ামত পাওয়ার সাধনায় রত থাকো।"

র–কুরআন ।

আল্লাহ! আল্লাহ!! না, তিনি তাঁর প্রিয় হাবিবের প্রতি নারাজ হননি, অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর প্রতি তিনি বিমুখ হননি; বরং তাঁকে তাঁর অপার অনুগ্রহ দান করে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। অসীম অনুগ্রহের সাগরে তাঁকে অবগাহন

করিয়েছেন। এবার অব্যাহতভাবে প্রত্যাদেশ আসতে লাগল। জিব্রাঈল তাঁর কাছে যথারীতি প্রত্যাদিষ্ট আয়াত শোনাতে লাগলেন আর সেই সাথে শিখালেন আল্লাহ্‌র উদ্দেশে ইবাদত-উপাসনার পদ্ধতি।

হজরত জিব্রাঈল তাঁকে ওজু করা শিখালেন, সেই সাথে নামায পড়াও শিখিয়ে দিলেন। একদিন তিনি মক্কা উপত্যকার একটি উঁচু জায়গায় অবস্থান করছিলেন। হজরত জিব্রাঈল ওজু করে দেখিয়ে দিলেন কীভাবে ওজু করতে হয়। তিনিও তাই করে পাক-পবিত্র হলেন। তারপর জিব্রাঈল উঠে দাঁড়ালেন। তিনিও জিব্রাঈলের সাথে উঠে দাঁড়ালেন। জিব্রাঈল তাঁকে নামায পড়িয়ে দেখালেন। তিনিও তাঁর মতো একইভাবে নামায পড়লেন। তারপর জিব্রাঈল নিষ্ক্রান্ত হলেন।

তিনি খাদিজার কাছে এলেন। তাঁর সামনে ওজু করলেন। তারপর বললেন ঃ 'নামায পড়ার জন্য পাক-পবিত্র হওয়ার এটাই নিয়ম।' বিবি খাদিজা একই ভাবে ওজু করলেন। তারপর তিনি নামাযের জন্য দাঁড়ালেন। খাদিজাও তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন।

৫

আলি তখন হজরতের অভিভাবকত্বে তাঁর গৃহেই লালিত হচ্ছিলেন। তাঁর সাথেই থাকতেন। আলি গভীর মনোযোগ সহকারে তাঁদের নামায পড়া দেখলেন। তিনি দেখলেন এঁরা দুজনেই একইভাবে রুকু-সিজদায় অবনত হয়ে আল্লাহর উদ্দেশে লুটিয়ে পড়ছেন। মধুর কণ্ঠে পবিত্র সুন্দর সব আয়াত পাঠ করছেন। এসব আয়াতের মধ্যে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অশ্রুতপূর্ব সব কথা রয়েছে। ভারী সুন্দর সে সব আয়াত।

আলি অবাক বিস্ময়ে এসব দেখতে লাগলেন। মহানবী (সাঃ) তাঁকে বড়ই আদর যত্ন করতেন। আলি ছিলেন তাঁর বড়ই প্রিয় পাত্র। আলির প্রতি নবীজীর ছিল অপত্য স্নেহ। তিনি মহানবীর সমস্ত কাজ-কর্মকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন। তাঁর সমস্ত কথা তিনি নির্দ্বিধায় মেনে চলতেন।

আলি এসব দেখেশুনে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন আর মনে মনে বললেন ঃ 'কিন্তু এসব ব্যাপার তো আজ আমি এই প্রথম দেখলাম। আর কখনো তো এভাবে সিজদা ও তিলাওয়াত করতেন না! এরকম সুন্দর মর্মস্পর্শী বাণীও তো আর কখনো শুনিনি!'

নামায সমাপ্ত হলে আলি নবীজীকে জিজ্ঞেস করলেন 'এ কী করলেন ?'

মুহম্মদ (সাঃ) বললেন ঃ 'এ আল্লাহর প্রেরিত ধর্মীয় উপাসনা। আল্লাহ্ এ ধর্ম মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর প্রেরিত দুনিয়ার সমস্ত নবীই এ ধর্ম প্রচার করে গিয়েছেন।

আলির কাছে তা খুবই আশ্চর্যজনক বলে মনে হল। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ 'এ রুকু ও সিজদা কার উদ্দেশে ?'

মুহম্মদ (সাঃ) 'আল্লাহ আমাকে তাঁর নবী মনোনীত করেছেন। তিনি আমার নিকট বাণী পাঠিয়েছেন এই মর্মে যে, আমি যেন তা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করি। লোক বিপথগামী হয়ে পড়েছে। আমি সরল পথ দেখাব, আল্লাহর ইবাদতে মনোযোগী হতে বলব। এ রুকু ও সিজদা আমরা তাঁর উদ্দেশেই করি।'

আলি ঃ 'এ তো ভারি সুন্দর জিনিস। যাঁর প্রতি আপনি ঈমান এনেছেন আমিও কী তাঁর উপর ঈমান আনতে পারি ? আমি কী আপনার মতো ইবাদত করতে পারি? আমিও কী আপনার সাথে নামায পড়তে পারি ?'

মুহম্মদ (সাঃ) ঃ 'হাঁ। অবশ্যই পারবে। আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি ছাড়া উপাস্য আর কেউ নেই। তুমিও তার ইবাদত করো। লাত-উজ্জাকে ত্যাগ করো। সমস্ত রকমের মুর্তির সাথে সম্পর্ক ত্যাগ কর।'

আলি ঃ 'আচ্ছা, তাহলে আমি আব্বাজানকে একটু জিজ্ঞেস করি।'

সারা রাত আলির চোখে ঘুম এলো না। তিনি তাঁর কাছ থেকে যা কিছু শুনেছিলেন, তা বার বার স্মরণ করতে লাগলেন। সারা রাত ধরে চিন্তা-ভাবনা করলেন। সকাল হলে মহানবীকে (সাঃ) বললেন ঃ

'আমি ঈমান আনলাম। আমি আপনাকে অনুসরণ করার সংকল্প গ্রহণ করলাম। আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই। বলুন, আমি কীভাবে রুকু করব ? কীভাবে সিজদা করব ? আর কীভাবে আল্লাহর কালাম পড়ব ?'

নবীজী তাঁকে নামায শিখিয়ে দিলেন। যে সমস্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল, তা তাঁকে পড়িয়ে মুখস্থ করিয়ে দিলেন। তারপর, যখনই মহানবী (সাঃ) নামায পড়তেন, তখনই আলি (রাঃ) তাঁর সাথী হতেন।

হজরত আলি ও জায়েদ একসাথে থাকতেন। এখন জায়েদই বা বাকী থাকেন কেন ? তিনিও ঈমান আনলেন এবং দ্বীনী-শিক্ষা লাভ করতে লাগলেন।

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ঈমান আনার গৌরব অর্জন করেন বিবি খাদিজা। তারপর আলি এবং তারপর জায়েদ। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুহম্মদ (সাঃ) ও ইসলামের জন্য তাঁরা নিবেদিতপ্রাণ হয়ে গেলেন।

হজরত আলি ও হজরত জায়েদ মহানবীর জন্য নিবেদিতপ্রাণ হয়ে গেলেন। জীবনের প্রারম্ভে মহানবীকে এঁরা পেয়েছিলেন একজন মহৎ-হৃদয় মানব, অভিভাবক ও পিতা রূপে।

মহানবীর ব্যক্তিত্ব ও চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যের কোন তুলনা ছিল না। আলি ও জায়েদ তাঁকে অতি নিকট থেকে দেখেছিলেন এবং পরম অভিভাবক ও পিতা হিসেবে পেয়েছিলেন। মহানবীর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধের সীমা-পরিসীমা ছিল না। মহানবীর সঙ্গ ও সাহচর্য তাঁদের স্বর্গীয় পরিতৃপ্তিতে পূর্ণ করে দিল।

এরপর আবুবকর ঈমান আনলেন। ইনি ছিলেন আবু কুহাফা তাঈমীর পুত্র এবং নবীজীর অন্তরঙ্গতম বন্ধু।

আবুবকর নবীজীর সততা ও পবিত্রতায় গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। সেজন্য তিনি তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁকে তিনি সর্বদাই শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তাঁর সাহচর্য লাভ করাকে এক অলৌকিক সৌভাগ্য বলে মনে করতেন। গভীর হৃদয়ে তিনি যেন সত্যের সন্ধানে ব্রতী ছিলেন। মহানবীও তাঁকে বড়ই ভালোবাসতেন এবং পরম বন্ধুর মতো আচরণ করতেন। তাঁর এ নিষ্ঠা ও বন্ধুত্বের কোন তুলনা ছিল না। মহানবী তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার সাথে সাথে কোনো দ্বিরুক্তি না করেই বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন।

নবীজী তাঁকে ইসলামে দাওয়াত দিলেন এবং ইসলামমের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা দিলেন। তা শোনার সাথে সাথেই আবুবকরের মুখ থেকে যে বাক্য বেরিয়ে এলো তা নিষ্ঠা ও আস্থার চূড়ান্ত নমুনা হিসেবে ইতিহাসে অমর হয়ে রইল। তিনি বললেনঃ

'আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত হোন, আপনি যে সত্য উচ্চারণ করলেন, সে সত্যের উপর আস্থা জানিয়ে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, আপনি তাঁর মনোনীত নবী ও রসূল।'

বিবি খাদিজা আবুবকরের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। সাথে সাথেই তিনি শান্তির চিহ্নস্বরূপ সাদা কাপড় উড়িয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন ঃ

'আবু কুহাফার পুত্র। আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া। যিনি আপনাকে সুমতি (হেদায়েত) দান করেছেন।'

আবু বকরের ইসলাম গ্রহণ রসূলুল্লাহর জন্য বড়ই সহায়ক হল। তাঁর সাহস বৃদ্ধি পেল এবং তাঁর যাত্রাপথ আরো সহজ হয়ে এলো।

হজরত আবুবকর বড়ই দয়ালু ও শান্ত-স্বভাবের মানুষ ছিলেন। সমগ্র মক্কা নগরেই তিনি সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরূপে সুপরিচিত ছিলেন। ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাই তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। তিনি কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। খানদানের ভালো-মন্দ সমস্ত স্তরের মানুষ তাঁর অধীনতা মেনে চলত। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলে তিনি বড়ই উপকৃত হলেন। আল্লাহ তাঁকে ধন-সম্পদ দিয়েছিলেন, সে সাথে তাঁকে দিয়েছিলেন একটি বিশাল হৃদয়। সম্পদ আমদানি হত আর তিনি প্রাণ খুলে খরচ করতেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান-প্রজ্ঞাও ছিল প্রবল। যে কোন ধরনের সামাজিক সমস্যা দ্রুত সমাধানে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। যে কোন রকমের সমস্যা এলেই লোকে তাঁর সমাধানপ্রত্যাশী হতেন। মহানবীও মাঝে মাঝে তাঁর কাছে এসে বসতেন। তাঁর (সাঃ) মধ্যেকার অসামান্য বৈশিষ্ট্যাবলী আবুবকরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করত।

আবুবকরও (রাঃ) ইসলাম প্রচারের কাজ নেমে পড়লেন। যারা তাঁর অতি কাছের মানুষ ছিল, যারা তাঁর দ্বারা উপকৃত হতো এবং তার প্রজ্ঞা, বিশ্বস্ততা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত ছিল তাদের কাছে তিনি ইসলাম ব্যাখ্যা করলেন এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন। তাদের অনেকেই তাঁর কথা মেনে নিয়ে পবিত্র ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে আশ্রয় নিল। যাঁরা প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁরা হলেন– উসমান ইবনে আফফান, জুবাইর ইবনে আওয়াম, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও তালহা ইবনে উবাইদিল্লাহ।

তারপর জাররাহ্‌র পুত্র আবু উবাইদ এবং আবু আরকামের পুত্র মুসলমান হলেন। পরে আরো অগণিত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে নবীজীর ও আবুবকরের কন্যারাও ছিলেন।

আল্লাহ এঁদের সকলের প্রতি খুশি হোন এবং এঁদের সকলের প্রতি তাঁর করুণা বর্ষণ করুন!!

৬

ইসলামের আলো ধীরে ধীরে দিগ্‌-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল কিন্তু তারা প্রকাশ্যে ইসলাম পালনে সাহসী হল না। মহানবীও প্রকাশ্যে দাওয়াতের কাজ শুরু করলেন না। প্রচারের কাজ গোপনেই চালিয়ে যেতে লাগলেন। নব দীক্ষিত মুসলিমরা অতি গোপনে ধর্ম পালন ও প্রচার করে যেতে লাগলেন। ঈমানের উত্তাপে উত্তপ্ত মুসলিমরা পরিচিতদের মধ্যে ইসলামের আলো পৌঁছে দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু কুরাইশ সরদারদের দৃষ্টির আড়ালেই সব কাজ করে যেতে লাগলেন। কুরআন পাঠ নিজেদের মধ্যেই করতেন এবং নিজেরাই পরস্পরের মধ্যে মুখস্থ করে নিতেন। এ কাজে গোপনীয়তা রক্ষার জন্য তারা নিজেদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে চলে যেতেন যাতে শত্রুরা টের না পায়। নামাযের সময় হলে চুপি চুপি গুহার মধ্যে গিয়ে নামায পড়তেন। বড়ই নম্রতা ও আন্তরিকতার সাথে তাঁরা নামায আদায় করতেন এবং নব্য মুসলিমদের তাঁরা মহানবীর বাণী মুখস্থ করিয়ে দিতেন। সেই সাথে ধর্মের কথাও বুঝিয়ে দিতেন।

যেভাবেই হোক, একথা শত্রুদের কানে পৌঁছে গেল। তারা রহস্য ভেদ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। তারা মুসলিমদের পিছনে চর লাগাল। অত্যল্প দিনের মধ্যেই তারা সমস্ত কিছু জেনে ফেলল। তারা জানতে পারল যে, মুসলমানরা গুহায় গিয়ে নামায পড়ে এবং নিজেদের মধ্যে নতুন ধর্মমত নিয়ে আলোচনা করে এবং অন্যদের তা শিখায়।

তারা জানতে পারল যে, মুহম্মদ একেশ্বরবাদ প্রচার করছেন এবং বহু ঈশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজার বিরোধিতা করছেন। মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদের আহ্বান ? কী অদ্ভুত ব্যাপার!!

কী ? আবু তালিবের অভিভাবকত্বে লালিত আবদুল্লাহর এতিম পুত্র মুহম্মদ নবী হওয়ার দাবি করছে ? জনসাধারণকে সে পিতৃপুরুষের ধর্ম থেকে বিমুখ করছে? সে দেবতাদের প্রভুত্বের বিশ্বাস থেকে জনসাধারণকে নিজের দলে টানছে? পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উসকে দিচ্ছে ?

জাতীয় ধর্মের বিরোধিতা ? পূর্বপূরুষের ধর্মের সাথে শত্রুতা ? মুহম্মদের দুঃসাহস বড়ই বেড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে!!

সর্বত্রই একই কথা! একই আলোচনা। সর্বত্রই বিরোধিতার আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠল। একথা শুনে লোকেরা ক্ষেপে উঠতে লাগল।

কেউ বলল ঃ 'মুহম্মদকে জ্বিন-ভূতে ধরেছে, এছাড়া কোন ব্যাপারই নয়।' কেউ বলল ঃ 'তার বড়ই ক্ষমতার লোভ হয়েছে, এতো এক নেশা। খোদ জমানাই তাকে উল্টে দেবে। আমাদের কিছু করার দরকার পড়বে না।' এসব বালখিল্য কথাবার্তায় মুহম্মদ (সাঃ) মোটেও মনোযোগ দিতেন না। এদের মধ্যে আবার এমন লোকও ছিল যারা মুহম্মদের ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়ছিল। তারা মনে করত, নতুন ধর্মের কথাও শোনা যাক। পরীক্ষা করা যাক। তা থেকেও কোন ফায়দা হাসিল হতে পারে। লোকসান তো হবে না! হয়তো লাভই হবে! এসব ভেবে তারা নানা রকমের পরীক্ষা করতে লাগল। তার মধ্যে কিছু ভালো লেগে গেলে আপনা আপনিই তারা মুসলমান হয়ে যেতে লাগল।

তারা আবু তালিবের কাছে এসে মুহম্মদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। বলল ঃ দেখ, তোমার ভাইপো আমাদের চৌদ্দ পুরুষের ধর্মের বিরুদ্ধে কী এক এক নতুন ধর্ম বের করেছে!'

একদিন আবু তালিব তা দেখার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। সাথে রইলেন আলির ভাই জাফর। গিয়ে দেখলেন, মুহম্মদ নামায পড়ছেন। সেই সাথে আলিও। দুজনেই লোকালয় হতে অনেক দূরে এসে নামায পড়ছেন। কেন ? তাঁর এবং তাঁর সাথীদের ভয়ে। মহানবীর নামায পড়া শেষ হলে আবু তালিব বললেনঃ 'মুহম্মদ! তুমি এ কেমন ধর্ম পালন করছ ?' মহানবী বললেন ঃ 'চাচাজি! এ খোদ আল্লাহরই মনোনীত ধর্ম। এ তাঁর ফেরেশতাদের, নবীদের, রসূলদের ধর্ম। দাদা ইব্রাহীমও এ ধর্ম পালন ও প্রচার করে গিয়েছেন, আল্লাহ্ আমাকে বিশ্বমানবের কাছে এ ধর্ম প্রচার ও তাদের সত্যপথ প্রদর্শনের জন্য পাঠিয়েছেন। পরম শ্রদ্ধেয় চাচাজি! আপনিই আমার অভিভাবক, সেজন্য সে ধর্মে আপনাকে আহ্বান করা আমার সবচেয়ে বড় অধিকার। সেজন্য এ ধর্ম গ্রহণের জন্য আমি আপনার কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি। আপনি আমাকে বিমুখ করবেন না চাচাজি!'

আবু তালিব বললেন ঃ 'প্রিয়তম ভাইপো আমার! পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করা তো আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তা সত্ত্বেও তোমার প্রতি আমার সমস্ত সমর্থন ও সহানুভূতি রয়েছে। আমার দেহে যতদিন প্রাণ থাকবে, ততদিন কেউ তোমার কিছু করতে পারবে না।'

তারপর আলিকে বললেন ঃ 'পুত্র! তুমি তো এ ধর্ম গ্রহণ করেছো! কিন্তু তা বুঝতে পারছ তো?'

আলী বললেন ঃ 'সম্মানিত আব্বাজান! আমি আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত রসূলের উপর ঈমান এনেছি। তিনি যা বলেন তাই আমি মেনে চলি। প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য নিয়মিত নামাযও পড়ি।'

আবু তালিব বললেন ঃ 'ভাইপো মুহম্মদ তো ঠিক কথাই বলছেন। সর্বদাই তাঁর কথা মেনে চলবে।'

তারপর জাফরকে বললেন ঃ 'পুত্র! তুমিও ভাইদের সাথে নামায পড়ো।'

আবু তালিব নিজে মুসলমান হলেন না কিন্তু তাঁর সন্তানদের ইসলামেই মনোনিত করিয়ে দিলেন।

কুরাইশদের সাথে ও নবী মুহম্মদের সাথে আবু তালিবের কী সম্পর্ক রয়ে গেল? পরবর্তী পর্যায়ে তা যথারীতি আলোচিত হবে।

মুসলমানদের নামায পড়া দেখে কুরাইশরা হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল। তাদের রুকু করা দেখে ঠাট্টা করতে লাগল আর সিজদা করতে দেখতে নকল করে করে তাঁদের মানসিক যন্ত্রণার সৃষ্টি করল। দিনের পর দিন তা বেড়ে চলল। তা তাদের দৈনন্দিন হাসি-ঠাট্টার বিষয়ে পরিণত করল। মুসলমানরা মক্কা উপত্যকায় আসর ও চাশ্তের নামায পড়তেন। তারা সেখানেও পৌঁছে গেল। তাঁদের দেখে চোখ মারতে লাগল, ইশারা-ইঙ্গিতে তাঁদের ব্যঙ্গ করতে লাগল। সেই সাথে হুল্লোড়বাজিও করতে লাগল। তা দেখে দেখে একসময় মুসলমানদের ধৈর্য সীমা ছাড়িয়ে গেল। রেগে আগুন হয়ে গেলেন। দু'পক্ষই লড়াইয়ের জন্য দাঁড়িয়ে গেল। হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস এক বিধর্মীকে এমন মার দিলেন যে, তার মাথা ফেটে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বয়ে গেল। যতটা সম্ভব মহানবী মুশরিকদের থেকে দূরে অবস্থান করতে লাগলেন যাতে মুসলমানরা মুশরিকদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারে। কুরআন্ন শোনানোর প্রয়োজন হলে অথবা নতুন প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলে সবাইকে 'দারে আরকাম'-এ নিয়ে চলে যেতেন।

নবী মনোনীত হওয়ার পর তিন বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। সবাই জেনে গেল যে, তিনি একটি নতুন ধর্মের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। সবাই বুঝে গেল যে, তিনি এখন এক মজবুত অবস্থায় এসে উন্নীত হয়েছেন। তাঁর অনুসারীদের সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছে। এবার আল্লাহর আদেশ হল আর গোপনে নয়; মানুষকে সত্য-ধর্মে খোলাখুলি আহ্বান কর।

'আপনাকে আদেশ দেয়া হল, মুশরিকদের পরোয়া না করে এখন প্রকাশ্যে ঘোষণা দিন।' —কুরআন ॥

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম অ্যান

— আপন আলয়ে বিশ্বনেতা

— নিজ বংশের লোকেদের প্রতি আহ্বান

— আবু লাহাবের বিরোধিতা

— পুনরায় নিমন্ত্রণ

— মানবতার মুক্তিদূতের মর্মস্পর্শী ভাষণ

— শ্রোতাদের উপেক্ষা নীতি

— হযরত আলীর নিঃসঙ্কোচী হক-প্রিয়তা

— সাফা পাহাড়ের আহ্বান

— আবু লাহাবের লজ্জাজনক আচরণ

— লোকেদের বিপদগামিতায় মহানবীর বেদনা প্রকাশ

— কুরাইশদের বিষম ক্রোধ

— আবু তালিবের কাছে কুরাইশ প্রতিনিধিবৃন্দ

— কুরাইশদের দ্বিতীয় প্রতিনিধিদল

—পৌত্তলিকদের সাথে বচসা ও বির্তক

— আবু তালিবকে ফুসলানোর ব্যর্থ প্রয়াস

— আবু তালিবের প্রতি কুরাইশদের আস্ফালন

— আল্লাহর রসূলের পক্ষে বিশ্বাসী জনতার ভীড়

— আবু তালিবের উৎসাহ দান

— আবু তালিবের আশ্রয় ও সহযোগিতায় আশ্বাস।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম আহ্বান

১

হজরত মুহম্মদের নবুয়ত প্রাপ্তির পর দেখতে দেখতে তিন বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এতদিন প্রিয়নবী ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে দ্বীনের পথে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। এরপর আল্লাহর হুকুম হল কারো কোন রকমের পরোয়া না করে প্রকাশ্যে দ্বীন প্রচার করুন। নির্ভয়ে দ্বীনের সংবাদ মানুষের কাছে পৌঁছে দিন। এ কাজ প্রথমে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে শুরু করুন। কোন হতভাগ্য যদি তা না শোনে তাহলে 'কুচ পরোয়া নেই'।

মহানবী চিন্তা করতে লাগলেন এখন কী করা যায় ? নিজের বংশের লোকেদের কিভাবে বোঝাবেন ? এসব চিন্তায় বাড়ির বাইরেও পর্যন্ত যাওয়া ছেড়ে দিলেন। এমন কী কোথাও যাওয়া-আসাও বন্ধ করে দিলেন।

এ কথা আর গোপন থাকল না। কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তা ছড়িয়ে গেল। সর্বত্রই চর্চা হতে লাগল। আত্মীয়-স্বজনরা খুবই ঘাবড়ে গেলেন। বলতে লাগলেন, মুহম্মদ অসুস্থ হয়ে পড়েননি তো ? ভয়ংকর কোন বিপদাপদে পড়েননি তো! তাঁর ফুফুরাও ভীত বিহ্বল হয়ে পড়লেন। অবশেষে তাঁরা তাঁর বাড়িতে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'মুহম্মদ! তুমি কেমন আছো ? বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ করে দিলে কেন ?'

তিনি বললেন ঃ 'আমার ঘাড়ে খুব বড় একটা বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে ভারে আমি নুয়ে পড়ছি। শ্রদ্ধেয়া ফুফুরা! একদিকে আমার আত্মীয়-স্বজনেরা আল্লাহকেও মানছেন আবার মূর্তিপূজাও করছেন। এভাবে কী আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব ? না। কখনোই নয়। এ তো বিপদসংকেত। আল্লাহর হুকুম যে, আমি তাদের সাবধান করে দিই। আমি তাদের বলি, তোমরা মূর্তিপূজা ত্যাগ কর। আমি চিন্তা করছি কী করব। কখনো মনে হচ্ছে তাদের খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করি। তারপর সেখানেই তাদের আল্লাহর নাফরমানি থেকে সুরক্ষার আহ্বান জানাই।'

ফুফুরা বললেন ঃ 'অসুবিধা কী ? নিমন্ত্রণ কর। কিন্তু আবু লাহাবকে ডেকো না। সে ধড়ে প্রাণ থাকতে তোমার কথা শুনবে না।'

মহানবী অবিলম্বে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে সেখানে আহ্বান করলেন। সেই সাথে আবু লাহাবকেও আহ্বান করলেন। যদিও ফুফুরা নিষেধ করেছিলেন; তবুও ডাকলেন। আর তিনি একথাও জানতেন যে, আবু লাহাব তাঁর কথা মানবে না এবং তার দেহের শেষ রক্তবিন্দুটুকু দিয়ে হলেও তাঁর বিরোধিতা করবে।

নিমন্ত্রণ রক্ষায় বহু লোকের সমাবেশ ঘটল। সবাই একসাথে খাওয়া-দাওয়া করলেন। এঁদের মধ্যে তাঁর চাচা, চাচাত ভাই ও সমস্ত আত্মীয়-স্বজন শামিল ছিলেন। তিনি সে মজলিসেই বসে রইলেন এই ভেবে যে, খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে সবাইকে সত্যধর্মে আহ্বান করবেন।

মতলববাজ আবু লাহাব চিন্তা করল, তার মতলব হাসিলের এটাই উপযুক্ত সুযোগ। এখানেই সবাই তাকে ঘিরে ফেলে পূর্বপুরুষদের ধর্মের বিরোধিতা করে নব্যধর্ম প্রচারকারী মুহম্মদকে সবাই মিলে এক হাতে নেয়া যাবে। তাকে ভয় দেখানো যাবে, ধমকানোও যাবে। আত্মীয়-স্বজনরা সবাই এখানে আছে, জমবেও ভালো। একথা ভেবেই সে সোজা দাঁড়িয়ে গেল এবং সবার উদ্দেশে বলল ঃ

'মুহম্মদ! এখানে উপস্থিত সকলেই তোমার চাচা, চাচাত ভাই ও আত্মীয় স্বজন। দেখ, তুমি বেশ কিছুকাল যাবৎ এমন কিছু কথাবার্তা প্রচার করছো, যা আমাদের জন্য খুবই উদ্বেগের বিষয়। ইতিমধ্যে তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের বংশপরম্পরাগত ধর্মবিশ্বাসের উপর আঘাত হেনেছ। তুমি সে ধর্মের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ নতুন একটি ধর্মমত প্রচার করছ। এটা তুমি মোটেই ভালো করছ না। এর পরিণাম হবে খুবই মারাত্মক। তুমি তোমার বংশের লোকেদের এমন একটা অবস্থার মুখে এনে দাঁড় করিয়েছ যে, সারা আরব মুলক তাদের বিরোধিতা করবে; অথচ সবাই জানে যে, সে শক্তির মোকাবিলা করাটা হবে আমাদের সাধ্যের বাইবে। এখন তুমি যদি এসব ত্যাগ না কর, তাহলে বাধ্য হয়ে আমাদের তোমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। আর এটা তখন আমাদের অন্যায় হবে না যদি বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে তোমাকে আমরা বন্দী করে রাখি। এখন তোমারই কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হবে যে, কুরাইশরা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু তোমার আত্মীয় স্বজনরা তার মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে গেলেও সমগ্র আরববাসীর বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়লাভ করা তো সম্ভব হবে না।'

প্রিয়নবী চাচ্ছিলেন যে, উপস্থিত অতিথিদের উদ্দেশে কিছু বলেন। লোকেদের মহান আল্লাহর প্রত্যাদেশ শুনিয়ে দেন। তিনি তাদের বুঝিয়ে দেন যে, আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার পরিণাম কত ভয়াবহ। তিনি বুঝিয়ে দেন যে, কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ। কিন্তু মতলববাজ আবু লাহাব তাঁকে কথা বলার কোন সুযোগ না দিয়েই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশে সবাইকে বলল ঃ

'এ বড়ই খারাপ কথা। সময় থাকতে তোমরা তাকে পরিত্যাগ করো। তোমরা তাকে অন্যের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সুযোগ কেন দিচ্ছ ? সে সময়ে তোমরা বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হয়ে পড়বে। তাকে তাদের হতে তুলে দিলে তোমরা বেঈজ্জতী হবে। তোমরা বদনামী হবে। আর তাকে রক্ষা করতে গেলে তোমরা মারা পড়ে যাবে। সুতরাং এখনই তাকে ধরে বন্দী করে রাখো।'

সোফিয়া নামে তাঁর এক ফুফু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এ কথা শুনে তিনি যারপরনাই উদ্বেগের সাথে বললেন ঃ 'আমার ভাইয়েরা! আমার ভাইপোকে অপমান করতে তোমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত। আল্লাহর কসম! লোকে তো এক যুগ ধরে বলে আসছে যে, মুত্তালিবের সন্তানদের মধ্যেকার একজনের পুত্র নবী হবেন। শুনে নাও, মুহম্মদ নবী। তিনি তোমাদের মহান সন্তান।'

আবু লাহাব ব্যঙ্গ করে চীৎকার করে বললঃ 'তোমাদের কী ? তোমরা শাড়ি-চুড়ি পরে ঘরের মধ্যেই থাকবে আর আক্রমণ এলে তো যুদ্ধ আমাদেরই করতে হবে। আর কোন গোষ্ঠী যদি আমাদের সাথে যোগ না দেয়..... তাহলে কী হবে ? আমাদের তো ঝাড়েবংশে নিপাত করে দেবে।'

আবু তালিব বললেন ঃ 'দেহের শেষ রক্তবিন্দুটুকু দিয়েও তাঁকে রক্ষা করব।'

আবু লাহাব বলল ঃ 'ভাইসব। এখান থেকে বেরিয়ে চলো। এখানে আমাদের আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করা উচিত নয়।'

সবাই উঠে চলে গেল। প্রিয়নবীর মনের কথা মনেই রয়ে গেল। তিনি আবারো আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করলেন। খাওয়া-দাওয়ার শেষে মহানবী সকলের উদ্দেশে আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট বাণী শোনালেন। বললেন ঃ

'বিপদাপদে আপনাদের সকলের রক্ষাকর্তা নিশ্চয়ই আপনাদের মিথ্যা বাণী শোনাতে পারেন না। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার আত্মীয়-স্বজনদের সাথে কখনোই মিথ্যা বলতে পারি না। যদি অপরিচিত কাউকে মিথ্যাবাক্য বলি বা ধোঁকাও দিই তা সত্ত্বেও কোন অবস্থাতেই আমি আপনাদের সাথে ঐ ব্যবহার করতে পারি না। আল্লাহ জানেন, আমি তাঁর রসূল। তিনি আমাকে আপনাদের মধ্যে প্রেরণ করেছেন। আর শুনুন, এ আরবের আর কোন গোষ্ঠীর কোন ব্যক্তি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বস্তুর সন্ধান পায়নি। আমি আপনাদের ইহ-পরকালের মঙ্গলবার্তা নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। প্রভুর আদেশ যে, আমি আপনাদের তাঁর দিকেই আহ্বান করি। আপনাদের মধ্যে এমন কেউ কী নেই যিনি এ সত্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য আমাকে সহযোগিতা করেন ?'

তারপর তিনি কিছুক্ষণ নীরবে উপস্থিত লোকেদের চেহারা নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। কে তাঁর প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। কে ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হয়ে তাঁর সহযোগিতার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কে তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয় আর কে হয় নিবেদিতপ্রাণ ?

কিন্তু কেউ কোন সাড়া দিল না। সবাই যেন সাপের মতো অন্ধকারে মুখ লুকোবার চেষ্টা করল।

কিছু লোক তাঁকে পাগল মনে করে তাঁর দিকে অবহেলার দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। কিছু লোক রাগে মুখ ফিরিয়ে নিল আর কেউ বা পিঠটান দেয়ার কথা চিন্তা করতে লাগল।

ঠিক এমন সময় রোগা-পাতলা, দুঃখভরা আঁখি আর গোঁফদাড়িহীন বারো-তেরো বছরের এক কিশোর বীরের মতো উঠে দাঁড়িয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে বলল ঃ 'আল্লাহর রসূল! আমি আপনার সাথী হব। আমি আপনার সহযোগিতা করব।'

কী অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হল! বালকের এ প্রত্যয়দীপ্ত বীরোচিত বাক্য শুনে উপস্থিত সকলে হতচকিত হয়ে গেল। দীর্ঘক্ষণের নীরবতা ভেঙে শোরগোল উঠল। তারা চীৎকার করে বললঃ 'বলুন আবু তালিব, আপনি ভাইপোকে রক্ষা করবেন না নিজের ছেলেকে রক্ষা করবেন ?'

দ্বিতীয় সভাও সমাপ্ত হল। কিন্তু এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হল। তবুও তিনি নিরাশ হলেন না। পূর্ণ শক্তিতে কাজ করে যেতে লাগলেন। এবার তিনি অন্য পথ অবলম্বন করলেন। কাবার নিকটবর্তী সাফা পাহাড়ের উপর উঠে বড়ই আবেগ ভরা কণ্ঠে মক্কাবাসীদের উদ্দেশে উদাত্ত কণ্ঠে বললেন ঃ

'কুরাইশ ভাইসব! কুরাইশ ভাইসব!!'

'আরে কে চীৎকার করছে ? কার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে ?' কেউ বলল ঃ 'আর কারো নয় মুহম্মদের (সাঃ) কণ্ঠস্বর। ঐ পাহাড়ের উপর থেকে ভেসে আসছে।' লোকেদের মধ্যে এরকম গুঞ্জরণ ছড়িয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরেই সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে বহু লোক জড়ো হয়ে গেল। তারা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল ঃ 'বল মুহম্মদ! কী হয়েছে ? কী ব্যাপার ?' মহানবী সকলের উদ্দেশে আবেগমথিত স্বরে উদাত্ত কণ্ঠে বললেন ঃ 'ভাইসব! যদি আমি বলি, পাহাড়ের পিছন থেকে শত্রুদল তোমাদের উপর আক্রমণ করতে আসছে তাহলে তোমরা তা বিশ্বাস করবে?'

উপস্থিত জনতা একসাথে বলল ঃ 'হাঁ, হাঁ অবশ্যই বিশ্বাস করব। কারণ, আপনি আমাদের সঙ্গে কখনোই মিথ্যা কথা বলেননী।'

মহানবী (সাঃ) বড়ই দরদভরা কণ্ঠে সবার উদ্দেশে বললেন ঃ 'আমার প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ! আমি তোমাদের এক ভয়ানক আজাবের দুঃসংবাদ জানাচ্ছি। যা তোমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। আমি অনুভব করছি যে, তা ঐ পাহাড়ের দিক থেকেই ধেয়ে আসছে। কুরাইশ ভাইসব! আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে তোমরা নিজেদের রক্ষা কর, আগুন থেকে নিজেদের বাঁচাও। আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণে তোমাদের উপর গজবের আগুন বর্ষিত হলে আমি তোমাদের রক্ষা করতে সমর্থ হব না। আল্লাহর অসন্তুষ্টির আগুন থেকে রক্ষা পওয়ার একমাত্র উপায় আল্লাহকে এক বলে মানা এবং আমাকে তাঁর প্রেরিত রসূল বলে স্বীকার করা।'

আবু লাহাব একথা শুনে রেগে আগুন হয়ে গেল। তারপর এক ধমক মেরে গাধার মতো চীৎকার করে বলল ঃ 'গোল্লায় যাও মুহম্মদ! তুমি আমাদের এ জন্য ডেকেছিলে ?

মহানবী তাঁর নিজের চাচার এ হেন আচরণে মনে বড়ই আঘাত পেলেন। তিনি তাঁর দিকে দুঃখিত চিত্তে তাকালেন কিন্তু কোন তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হলেন না যাতে তিনি অন্য লোকেদের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে আন্তরিকতাপূর্ণ আলাপ করতে পারেন। যাতে তিনি জনসাধারণকে সত্যধর্মে আহ্বান করতে পারেন এবং প্রভুর প্রত্যাদিষ্ট বাণী শোনাতে পারেন। কিন্তু আবু লাহাবের মন মোটেও নরম হল না। উল্টো সে আরো গোলমাল পাকাতে লাগল যাতে লোকে মহানবীর কথা না শোনে।

অবশেষে লোকেরা সেখান থেকে চলে গেল। সেসব লোকেরা কেউ বলতে লাগল ঃ 'আবদুল মুত্তালিবের নবযুবক পুত্র আকাশ থেকে কথা বলে।'

কেউ বলল ঃ 'মুহম্মদ এমন একজনকে ইবাদত করতে বলছে, যাকে আমরা চোখে দেখিনি, যার কথা আমরা কানেও শুনিনি।'

কেউ বলল ঃ 'মুহম্মদ যার সাথে কথা বলেন তাঁর সাথে আমাদের যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছেন না কেন ?'

ইসলামের আহ্বান শোনাতে শোনাতে মহানবীর আরেক যুগ সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। মহানবী তাঁর নিবেদিতপ্রাণ শিষ্যদের নিয়ে বাড়ি আসেন আবার প্রচারে বেরিয়ে যান। সেখানে তিনি তাদের কুরআনের আয়াত শোনাতে লাগলেন। নিরক্ষর লোকেরা তা বার বার শুনে উত্তমরূপে মুখস্থ করে নিতে লাগল এবং সাক্ষর লোকেরা তা লিখে রাখতে লাগল এবং সেই সাথে মুখস্থ করে নিতে লাগল। ছোট বালক-বালিকাদের তা মুখস্থ করিয়ে নিতে লাগলেন এবং নবাগত মুসলিমদেরও উত্তমরূপে মুখস্থ করাতে লাগলেন।

ধীরে ধীরে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ল। মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগল। কিন্তু অনেকেশ্বরবাদীরা তাদের হেসে উড়িয়ে দিতে লাগল। এ ছিল তাদের জন্য এক 'ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কেত'– একথা তারা কখনোই স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না। তারা মনে করতে লাগল, এরা পাগল, এরা কী করতে পারে ? তারা ভাবল, মুহম্মদের (সাঃ) প্রতি অতিভক্তিবশত এসব লোকেরা আবেগের বশে তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করেছে। কিন্তু এর পরিণাম তারা জানে না। এ তো তাদের দুদিনের নেশা। তারপর উপযুক্ত সময়ে সব নেশা ছুটে যাবে। তারপর তারা আবার ফিরে আসবে চৌদ্দ পুরুষের ধর্মে।

একদিনের কথা। কিছু লোক কাবাঘরে মূর্তিদের উদ্দেশে সিজদা করছিল। এমন সময় মহানবী সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকেরা তাঁকে দেখে লজ্জিত ও ভীত হল। মহানবী ভাবলেন, এ জঘন্য পাপকর্ম থেকে তাদের নিবৃত্ত করা যাক। মানুষ হয়ে মূর্তির উদ্দেশে প্রণত হওয়া মানবতা ও মনুষ্যত্বের বড়ই অপমান। এ অপমান থেকে তাদের রক্ষা করা উচিত। তাদের উদ্দেশে তিনি বললেন ঃ

'কুরাইশ ভাইসব! তোমরা তো দাদা ইব্রাহীমের ধর্ম থেকে অনেক দূরে সরে গেছো। তোমরা তোমাদের হাতে গড়া এ তুচ্ছ মূর্তিকে পূজা করছ আর তাদের

আল্লাহর সাথে শরীক করছ। বল, আল্লাহ এতে তোমাদের প্রতি কতটা অসন্তুষ্ট হবেন!'

একথা সহ্য করতে না পেরে পৌত্তলিকরা মহানবীর সাথে তর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ল। তারা বলতে লাগল ঃ

'আমরা প্রকৃতপক্ষে মূর্তিপূজার আড়ালে আল্লাহরই উপাসনা করি। আমাদের আকাঙ্ক্ষা তো কেবলমাত্র সেই আল্লাহরই নিকটবর্তী হওয়া। এ মূর্তিরা হচ্ছে তাঁকে পাওয়ার একটা মাধ্যম।'

মহানবী বললেন ঃ 'যদি তোমরা আল্লাহকেই পেতে চাও, আমার কথা শোনো, তাহলে আল্লাহও তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।'

একথা শুনে তারা বীতরাগ হয়ে পড়ল। তারা বলল ঃ 'এঁর কথা শুনতে শুনতে আমাদের কান বধির হয়ে গেল। এসব কথা আর কতদিন সহ্য করা যায়?'

'আমরা সবকিছু নীরবে সয়ে যাচ্ছি। এখন তা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। তিনি অনবরত আমাদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করছেন। আমাদের পূর্বপুরুষদের বিপথগামী বলে অভিহিত করছেন–আমরা কখনোই আমাদের ঠাকুর-দেবতাদের ত্যাগ করব না। তাদের ত্যাগ করতে আমরা একেবারেই প্রস্তুত নই।'

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সবাই উঠে চলে গেল। তারা সর্বত্রই মহানবীর সমালোচনা করতে লাগল। কেউ কেউ তাঁকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়ারও পরিকল্পনা করল। এমন কী তাঁকে ভীতি প্রদর্শন ও ধমকাতে লাগল।

২

মক্কার পৌত্তলিক নেতৃবৃন্দ মহানবীর মোকাবিলায় এক মন্ত্রণাসভার আয়োজন করল। তারা বলল– 'মুহম্মদ আমাদের দেবতাদের বিরুদ্ধে খুব বাড়াবাড়ি করছেন। শুধু তাই নয় সীমাহীন ঔদ্ধত্যের সাথে আমাদের ধর্মের বিরোধিতা করছেন। তার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া যায় ? কীভাবে তাকে নিবৃত্ত করা যায় ?'

'মুহম্মদ দেবতাদের অপমান করছেন। যাঁরা আমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা। বহুকাল পূর্ব থেকেই তাঁরা আমাদের উপাস্য। '

'মুহম্মদ কী আমাদের মূর্খ ও অজ্ঞ মনে করেন ? কেন তিনি আমাদের মূর্তিপূজা ত্যাগ করতে বলছেন ? তাও আবার সেই মূর্তিদের যাঁদের উপাসনার জন্য আরবের দূর-দিগন্ত থেকে ভক্তরা এখানে এসে উপস্থিত হন ? এসে তাদের সিজদা করেন এবং তাঁদের সন্তুষ্টির জন্য কাবাঘর প্রদক্ষিণ করেন ?

'তিনি কি চান সারা আরবদেশে মূর্তিবিরোধী মতবাদ ছড়িয়ে দিয়ে জনসাধারণকে মক্কায় আসতে নিরুৎসাহিত করে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস করে দিতে? তিনি আমাদের ধর্ম ধ্বংস করছেন এবার কী আমাদের রুটি-রুজি থেকেও বঞ্চিত করবেন ?

বহুক্ষণ ধরে পরামর্শ চলল। শেষে সিদ্ধান্ত হল কিছু লোক আবু তালিবের কাছে গিয়ে মুহম্মদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবে যাতে আবু তালিব তাঁর ভাইপোকে নিবৃত্ত করেন, যাতে মুহম্মদ আমাদের এবং আমাদের দেবতাদের বিরুদ্ধে কিছু না বলেন। আমরা তার ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু বলব না; তিনিও যেন আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু না বলেন।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক কয়েকজন কুরাইশ দলপতি আবু তালিবের কাছে গেল। এরা হল ঃ হরবের পুত্র আবু সুফিয়ান, রবিআর পুত্র উত্বা, মুগীরার পুত্র ওয়ালিদ, ওয়াইলের পুত্র আস এবং হিশামের পুত্র আমর। এ সেই আমর আর তার উপনাম ছিল আবুল হাকাম– এ ব্যক্তিই আবু জেহেল নামে পরিচিত। এরা সবাই মিলে আবু তালিবের কাছে গিয়ে তাদের বক্তব্য উত্থাপন করল। আবু তালিব খুব মনোযোগ সহকারে অত্যন্ত বিনয় ও ধৈর্যের সাথে তাদের কথা শুনলেন এবং অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের ফিরিয়ে দিলেন। মহানবী তাঁর কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে চললেন। জনসাধারণকে তিনি মূর্তিপূজার অসারতা সম্পর্কে বুঝিয়ে এক আল্লাহর উপাসনায় তাদের আহ্বান করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে ইসলাম গ্রহণকারীদের বিরাট একটা দল তৈরি হয়ে গেল।

এসব দেখে পৌত্তলিকরা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। মুহম্মদ ধর্ম প্রচারে সাফল্য লাভ করছে, জনসাধারণ দলে দলে তাঁর ধর্ম গ্রহণ করছে, ইসলাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এখন আমাদের কী হবে ? আমাদের নেতৃত্ব বেহাত হয়ে যাবে। প্রিয় জন্মভূমি উজাড় হয়ে যাবে, আমাদের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে। আর বিলম্ব নয়। এখুনি একটা ফায়সালা হয়ে যাওয়া দরকার। সে কথা ভেবে পুনরায় তারা আবু তালিবের কাছে এসে পূর্ব কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলল ঃ

'আবু তালিব! আপনি আমাদের সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। আমরা আন্তরিকভাবে আপনাকে সম্মান জানাই। আপনি আমাদের পক্ষ থেকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আপনার ভাইপোকে নিবৃত্ত করুন। তাকে বলুন, তিনি যেন আমাদের দেবতাদের বিরুদ্ধে কিছু না বলেন, আমাদের ধর্মের অবমাননা না করেন। তিনি যেন আমাদের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনায় আঘাত না দেন। আর আমাদের পূর্বপুরুষদের বিপথগামী বলে অভিহিত না করেন। আপনি হয় এসব বলে তাকে নিবৃত্ত করুন, নতুবা আপনি মাঝখান থেকে সরে যান; দায়িত্ব আমরা নিজেরাই হাতে তুলে নিই। এর ফলে, এসব ঝামেলা থেকে আপনিও মুক্ত হয়ে শান্তিতে থাকতে পারবেন।'

আবু তালিব দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে সেসব কথা শুনে খুব হয়রান হয়ে পড়লেন। অগত্যা তিনি মুহম্মদকে ডেকে বাধ্য হয়ে বললেন ঃ

'ভাইপো! এরা সমাজের সম্ভ্রান্ত ও ধনশালী ব্যক্তি। এঁরা এক একটা গোত্রের গোত্রপতি ও সম্মানী ব্যক্তি। এঁরা চাচ্ছেন, তুমি তাদের ধর্মবিশ্বাস ও

ঠাকুর-দেবতাদের বিরুদ্ধে কিছু বলো না। তারাও তোমার এবং তোমার উপাসক সম্পর্কেও কিছু বলবেন না।'

মুহম্মদ বললেন ঃ 'চাচাজি! মানবের সার্বিক কল্যাণের জন্য যা বলতে আমি আদিষ্ট হয়েছি, তা না বলে তাদের সত্যপথে আহ্বান করা কী আমি ত্যাগ করব?'

আবুতালিব বললেন– 'তা কী জিনিস ?'

মুহম্মদ বললেন ঃ 'আমি কেবলমাত্র বলছি যে, তারা একটি মাত্র বাক্য তাদের মুখে উচ্চারণ করুক। এর বিনিময়ে সমগ্র পৃথিবী তাদের পদানত হয়ে তাদের পদচুম্বন করবে।'

আবু জেহেল গাধার মতো চীৎকার করে বলল ঃ 'তোর বাপের কসম, কী সে কথা বল্। আর আমাদের কাছ থেকে তুই ওরকম দশটা বাক্য শুনে নেয়।'

মুহম্মদ বললেন ঃ 'আপনারা শুধু বলুন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই)। আপনারা শুধু এতটুকু বাক্য মুখে উচ্চারণ করুন। বিনিময়ে সম্মান ও সাফল্য আপনাদের পায়ে এসে লুটিয়ে পড়বে। আপনাদের উপর আল্লাহর করুণা বৃষ্টির মতো বর্ষিত হবে। আপনারা ইহকালেও শান্তি পাবেন পরকালেও মুক্তি পাবেন।'

এ কথা শুনে সবাই রে রে করে উঠল। ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। তারা চরম শত্রুতার মনোভাব নিয়ে স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পূর্বে বলে গেল– 'মুহম্মদ! তোমার পায়ের তলায় মাটি কীভাবে কাড়তে হয় তা আমাদের ভাল রকম জানা আছে।'

৩

হজরত মুহম্মদের আহ্বান দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল। সমাজের ছোট-বড় বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষ সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে আশ্রয় নিচ্ছিলেন। এসব দেখে পৌত্তলিকরা হিংসার আগুনে জ্বলতে লাগল। ভয়ংকর বিষধর সাপের মতো রাগে ফুঁসতে লাগল। এক আল্লাহর ইবাদত তাদের কাছে ছিল পৌত্তলিকতাকে চরম অবমাননার শামিল। ইসলামের মর্যাদা কাফেরদের ক্রোধানলে পতিত করল। মুসলমানদের উদাত্ত আহ্বান পৌত্তলিকদের কাছে বিষের পেয়ালার মতো মনে হতে লাগল। ক্রোধানলে ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকা বিধর্মী পৌত্তলিকরা অবশেষে মুহম্মদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে শপথ নিল ঃ

'এবার মুহম্মদের বিরুদ্ধে অবশিষ্ট রইল আমাদের হাতের নাঙ্গা তলোয়ার। তাকে যেখানেই পাওয়া যাবে, যে অবস্থায় পাওয়া যাবে, যেভাবেই হোক আমরা তাকে আঘাত করব। তার দেহ-মন-প্রাণ– সমস্ত কিছুকেই আঘাতে জর্জরিত করে দেবো। ধর্ম প্রচারের সাধ তাকে চিরকালের জন্য মিটিয়ে দেবো।'

তারা তাদের কবি ও বদলোকদের মহানবীর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল। তারা তাঁকে গালাগালি করতে লাগল, তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজনা ছড়াতে লাগল। কবিরা

অশ্লীল ব্যঙ্গ করতে লাগল। তারা তাঁর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল। তারা কেউ তাঁকে যাদুকর বলে অভিহিত করল। কেউ বলতে লাগল তাঁকে যাদু করা হয়েছে, কেউ বলল তিনি নারীলোভী।

একদিন কয়েকজন পৌত্তলিক কাবা ঘরে একত্রিত হয়ে মহানবী প্রসঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে লাগল। তারা বলাবলি করলঃ

'আরে মুহম্মদ তো বলছেন মৃত্যুর পর মানুষকে আবার জীবিত করে তার কর্মফলের হিসাব-নিকাশ করা হবে। সুকর্মের জন্য তাদের পুরস্কৃত করা হবে আর কুকর্মের জন্য কুপরিণাম ভোগ করতে হবে। সুকর্মের পুরস্কার স্বরূপ আমরা স্বর্গে যাব আর কুকর্মের পরিণামস্বরূপ নরকে যাব।

তারপর তারা চিন্তা করল মুহম্মদকে আহ্বান করে তাঁর সাথে বিতর্ক হোক। তাঁর কথার সপক্ষে তিনি তথ্যপ্রমাণ পেশ করবেন আর যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং যদি শুধুই দাবি করতে থাকেন তাহলে আমাদের যা ইচ্ছা আমরা তাই করব এবং তা অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেবো। এরপরে আর কোন যুক্তিতর্ক আমরা গ্রহণ করব না।

একথা ভেবে তারা মুহম্মদের কাছে অতিদ্রুত এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিল। লোকটি তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছালে তাঁর মনে একটা আশার আলো জ্বলে উঠল। তিনি ভাবছেন, হয়তো তারা ঈমান আনার চিন্তায় হন্তদন্ত হয়ে তাঁর কাছে ছুটে এসেছে। একথা ভেবে সরল মনে তিনি তার সাথে এগিয়ে চললেন। কিন্তু সেখানে ছিল অন্য ব্যাপার, অন্য মতলব। তারা তাঁকে মানসিক আঘাতে জর্জরিত করার জন্যই ডেকে এনেছে।

তারা মুহম্মদকে বললঃ 'মুহম্মদ! এ আরবের বুকে আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়নি যে নিজের জাতির সঙ্গে আপনার মতো কোন বিরোধ খাড়া করেছে। আপনি আমাদের ধর্মকে অসার বলে প্রচার করছেন। আমাদের দেবতাদের মন্দ বলছেন। আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস সৃষ্টি করছেন। সমগ্র জাতিকে আপনি ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছেন। এটা আপনি কী করছেন ? মুহম্মদ! আপনি নিজেই বলুন। আপনি কী চান ? আপনি যদি লড়াই চান আমরা রাজি আছি। আর যদি ধনদৌলত, ইজ্জত-সম্ভ্রম ও সুন্দরী নারী চান, তাও বলুন, তা আমরা দিতে প্রস্তুত। যদি ধনদৌলত পেতে চান তাহলে বলুন, ধন-সম্পদে আপনাকে ভরে দেবো। যদি সুন্দরী নারী চান বলুন, আরবের সেরা সুন্দরীদের আপনার খিদমতে এনে দেবো। আর যদি নেতা হওয়ার ইচ্ছা তাকে , বলুন, আমরা আপনাকে নেতা বলে বরণ করব। আর যদি মাথা খারাপ হয়ে যায় আর যদি ভূত-পেত্নিতে পেয়ে থাকে তাও বলুন আমরা নিরাময় করি, যাবতীয় খরচ আমাদের।'

মুহম্মদের জীবন-সাধনা ও লক্ষ উদ্দেশ্যের উপর এ কত বড় হামলা তা সহজেই অনুমেয়। তিনি বড়ই ব্যথাহত হলেন। তারপর অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় বললেন ঃ 'এ ধরনের স্বপ্নসাধ ও দুরাকাঙ্ক্ষা আমার নেই। ধন-সম্পদের প্রত্যাশাও আমার নেই। নেতা ও বাদশাহ হওয়ার ইচ্ছাও আমি পোষণ করি না। আমার বলার কথা– আমি আল্লাহর প্রেরিত প্রত্যাদেশবাহী নবী ও রসূল। তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন মানুষকে হুশিয়ার করে দিতে। মানুষকে মিথ্যার পথ হতে সত্যপথে ফিরিয়ে এনে আল্লাহকে পাওয়ার সঠিক পথ প্রদর্শনই আমার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।'

তাঁর এ কথায় কোন কাজ হল না। উল্টো তাদের মূর্খতা ও অজ্ঞানতা আগুনের মতো জ্বলে উঠল। হই-চই শুরু করে দিল। মুখে যা আসে তাই বলে তাঁকে গালাগালি করতে লাগল। তারা বলল ঃ

'আপনি যদি সত্যিসত্যিই আল্লাহর রসূল হন এবং তিনি যদি আমাদের মঙ্গলের জন্য আপনাকে পাঠিয়ে থাকেন তাহলে তা প্রমাণ করুন। তাহলেই আমরা আপনাকে নবী বলে মানব এবং আপনার কথা মেনে চলব।'

কেউ বলল ঃ 'আপনি আপনার প্রভুকে বলুন, আমাদের জন্য একটা মিঠা পানির নহর বইয়ে দিতে। যার স্বাদ হবে জমজমের চেয়েও সুন্দর এবং সিরিয়া ও ইরাকের পানির মতো হবে তার স্বাদ।

কেউ বলল ঃ 'আপনি যদি নবী হন তাহলে আপনার প্রভুকে বলুন বাগ-বাগিচা ঘেরা রাজপ্রাসাদে আপনার বসবাসের ব্যবস্থা করতে। সেই সাথে সোনা-চাঁদির পাহাড় গড়ে দিতে যাতে আরাম-আয়েশে জীবন অতিবাহিত করতে পারেন। আপনি যদি নবী হবেন তাহলে আমাদের মতো হাটে-বাজারে, মাঠে-ময়দানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকার সন্ধান করেন কেন ?'

কেউ বলল ঃ 'ইয়ামামায় রহমান নামে একটি লোক আছে। সেই আপনাকে সবকিছু শিখিয়ে দেয়। তাহলে শুনুন, আমরা রহমানের উপর ঈমান আনছি। আপনি আকাশে উঠে গিয়ে রহমানের কাছ থেকে একখানি লিখিত প্রমাণ নিয়ে আসুন যা আমরাও পড়তে পারি।'

কেউ বলল ঃ 'ফিরিশতারা আল্লাহর কন্যা। আমরা তাদেরই পূজা করি। আপনি আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাদের আমাদের সামনে এনে হাজির করুন অথবা আকাশ ভেঙে টুকরো-টুকরো করে আমাদের উপরে বর্ষণ করুন, তাহলে আমরা ঈমান আনব। আমরাও একটু দেখি তা কেমন আজাব আর কেমন শাস্তি, যার ভয় আপনি দেখাচ্ছেন।'

মহানবী বললেন ঃ 'আমার প্রভু পবিত্র। আমি কী তাঁর পয়গম্বর ছাড়া অন্য কিছু?'

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'প্রকৃত দাতা তো তিনিই, যাকে ইচ্ছা তিনিই তা দান করেন। চাইলে বাগ-বাগিচাও দিতে পারেন। তিনিই চাইলে নহর বইয়ে দিতে পারেন এবং রাজপ্রাসাদও দান করতে পারেন।'

লোকেরা বলল ঃ 'মুহম্মদ! আমরা আপনার কাছে অনেক প্রস্তাব রেখেছি কিন্তু আপনি তার সব প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমরা আপনার কাছে কত আবেদন-নিবেদন করেছি কিন্তু আপনি একটা কথাও শোনেননি। এখন আমরা হতাশ। আত্মরক্ষা করার অধিকার আমাদের আছে, আপনাকে আমরা যে কোন মূল্যে প্রতিহত করব। মনে রাখবেন, প্রাণ বাজি রেখে আমরা লড়ব। হয় আপনি থাকবেন না হয় আমরা থাকব।'

অবশেষে, পৌত্তলিকরা মুহম্মদ (সাঃ) কে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল। এ হল তাদের শেষ সিদ্ধান্ত।

'কিন্তু মুহম্মদকে (সাঃ) হত্যা করলে কী আবু তালিব চুপ করে থাকবেন ? তাঁর রক্তে আগুন লেগে যাবে না ? শুধু তো তাই নয়, আবদুল মুত্তালিবের পুরো বংশের লোকেরাই ক্ষেপে যাবে। তারা তো মক্কার প্রধান গোত্র এমন কী মক্কাবাসীদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাও। এর পরের অবস্থা সামলাবে কে ?'

এ চিন্তা করেই তারা অবদমিত হয়ে পড়ল। সমস্ত রবদবা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

'কিন্তু হাঁ, একটা পথ খোলা আছে। তা হল আবু তালিব মুহম্মদকে দূরে কোথাও সরিয়ে দিন। যাতে তাঁর চোখের আড়াল হলে মনটাও ঠাণ্ডা থাকে।

কয়েক দিন যাবৎ অনেক চিন্তা-ভাবনা করল তারা। অবশেষে এ মূর্খরা একটা পরামর্শ করল। ঠিক করল– 'আবু তালিবের কাছে এমন একজন যুবককে নিয়ে যাওয়া যাক, যে শক্তি ও সাহসে যথেষ্ট বীরত্বের অধিকারী এবং সৌন্দর্য-জগতেরও সম্রাট। তাঁকে বলো, তুমি এ যুবককে রাখো, বিনিময়ে মুহম্মদকে আমাদের হাতে অর্পণ কর।'

৪

এই কুমতলব হাসিল করার উদ্দেশে পৌত্তলিক নেতারা আবু তালিবের কাছে এলো। সাথে নিয়ে এলো ওয়ালিদ বিন উমারা নামের এক মোটাতাজা যুবককে। এসে আবু তালিবকে বলল ঃ 'আবু তালিব! এ আমাদের প্রিয়পুত্র ওয়ালিদ। মক্কার সবচেয়ে শক্তিমান ও সুশ্রী এক যুবক। সে সৌন্দর্য-জগতেরও সম্রাট। আজ থেকে এ আপনার পুত্র। সকল ব্যাপারে সে আপনাকে সুপরামর্শ দেবে এবং সকল কাজ নিজ হাতে করে দেবে। এ সুপুরুষ যুবকটিকে আপনি রাখুন আর এর বিনিময়ে আপনার ভাইপো মুহম্মদকে আমাদের দিয়ে দিন। আমরা তাকে নিঃশেষ করে দিই। বিনা কারণে এক বিতর্ক তুলে সমগ্র জাতিকে তিনি ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছেন। বিনিময়ে তার চেয়ে ভালো একজন যুবককে আমরা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি।'

সমাজের নেতা-গোছের এক দৃষ্টে এসব লোকদের এরকম হঠকারি বক্তব্যে আবু তালিব বিস্মিত চিত্তে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এ হঠকারি কুমতলববাজ লোকদের উপযুক্ত জবাব দেয়ার জন্য কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর মুখ খুললেন। বললেন ঃ 'অজ্ঞ, হঠকারি, বুদ্ধির ঢেকি কুরাইশ নেতৃবৃন্দ! তোমাদের কথা শুনে আমি বড়ই কৌতুক বোধ করছি। তোমরা কী করে ভাবলে যে, তোমাদের এ অপদার্থ পুত্রকে আমি খাইয়ে-পরিয়ে মোটাতাজা করি আর আমার হৃদয়ের ধন কলিজার টুকরো মুহম্মদকে তোমাদের দিই আর তোমরা তার উপর জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করতে তাকে হত্যা করে টুকরো টুকরো কর। আল্লাহর কসম! মহাপ্রলয়কালাবধি তা হতে দেবো না।'

কুরাইশ নেতাদের মধ্যে ছিল আদীর পুত্র মূতাইম। সে বলল ঃ 'আল্লাহর কসম, আবু তালিব! জাতি আপনাদের প্রতি অনেক সুবিচার করেছে। আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছি যাতে অপ্রিয় ঘটনা না ঘটে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আপনি আমাদের একটা কথাও মানতে প্রস্তুত নন।'

আবু তালিব বললেন ঃ 'আল্লাহর কসম! আমার প্রতি সামান্যতম সুবিচারও করা হয়নি। আসল কথা হল তোমরা আমাকে বেইজ্জতী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছো। তোমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছো যে, দেশের জনসাধারণকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিয়ে তোমরা আমার সর্বনাশ সাধনে লিপ্ত থাকবে। তবে ঠিক আছে, মন যা চায় তা করে দেখো।'

কুরাইশরা বলল ঃ 'আপনি আমাদের প্রতি সামান্যতম সুবিচারও করেনি। না আমাদের সাথে, না আপনার ভাইপো-র সাথে। আমরা আপনাকে কতবার অনুনয়-বিনয় করেছি যে, আপনি আপনার ভাইপোকে বোঝান, তাকে বাধা দিন কিন্তু আপনি আজ পর্যন্ত কিছুই করেননি। শুনে রাখুন, এবার যদি আমাদের দেবতাদের ও পূর্বপুরুষদের বিরুদ্ধে কিছু বলা হয় এবং আমাদের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় আঘাত করা হয় তো আমরা বলে যাচ্ছি, আমরা আর সহ্য করব না। এখন কেবলমাত্র দুটি পথ খোলা আছে– হয় বুঝিয়ে তাকে বিরত রাখুন নতুবা আমাদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকুন। আপনি যদি তাঁর পক্ষে থাকেন, তাহলে আমরা আপনার বিরুদ্ধেও লড়ব, তাঁর বিরুদ্ধেও লড়ব। পরিণামে হয় আপনি থাকবেন নতুবা আমরা থাকব।'

এসব কথা বলে লোকেরা চলে গেল। ব্যাপার বড়ই কঠিন। আবু তালিব বড়ই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। হৃদয় বড়ই দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। জাতি ও বংশের লোকদের এ প্রকাশ্য হুমকি তার প্রাণকে বড়ই আহত করল।

জাতির লোকদের এ শত্রুতামূলক জঘন্যতম কুপ্রস্তাব মেনে নেয়া যেমন তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, তেমনি প্রাণপ্রিয় ভাইপো মুহম্মদের (সাঃ) সামান্যতম ক্ষতিও

তাঁর পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না। এ ছিল বড়ই বেদনাদায়ক পরিস্থিতি। এ ছিল তাঁর আত্মমর্যাদা ও দায়িত্বশীলতার বিরাট একটা পরীক্ষা। আবু তালিব মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসলেন। চিন্তা করতে লাগলেন– 'আমি কী করব ? উহ্! আমি কী করব ?'

তাঁর মধ্যে এক গভীর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হল। তাঁর বিবেক তাঁকে নানা প্রশ্নে জর্জরিত করতে লাগল– আবু তালিব! তুমি কী করবে ? বল, এখন তোমার কী সিদ্ধান্ত হল ? তুমি কী তোমার প্রাণপ্রিয় ভাইপোকে ঐ ঘৃণ্য শত্রুদের হাতে তুলে দেবে ? না-কি তাকে রক্ষার জন্য শরীরের শেষ রক্তবিন্দুটুকু দিয়েও লড়াই করবে ?

এখন সিদ্ধান্ত নেয়ার পালা। এখন সারা পৃথিবীর অপেক্ষার সময়– দেখা যাক, তিনি কী করেন ?

অবশেষে, আবু তালিব সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি প্রাণপ্রিয় ভাইপোকে ইসলাম প্রচারে বিরত হতে বলবেন। এ প্রচার জাতির সমস্ত রকমের শত্রুতার মূল কারণ। তা কুরাইশদের ঐক্যবদ্ধতাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছিল। তা তাদের আত্মমর্যাদা ও অহংকারবোধকে আহত করেছিল।

মুহম্মদ চাচা আবু তালিবের কাছে গেলেন। চাচা আবু তালিব তাঁকে সমস্ত বৃত্তান্ত শোনালেন। কুরাইশদের হুমকির কথাও তাকে অবগত করালেন। তারপর বললেন ঃ 'প্রাণপ্রিয় পুত্র আমার! আল্লাহর জন্য তুমি আমার ও তোমার জীবনের প্রতি মনোযোগী হও। তুমি আমার উপর এতটা ভার চেপে না যা আমি বইতে অক্ষম হই।'

এ ছিল মুহম্মদের পরবর্তী সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এক বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্ন। এখন শুধু জবাবের অপেক্ষা।

বিশ্বমানবতার কল্যাণে নিবেদিত ও আল্লাহর প্রেরিত নবী মুহম্মদ নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য আল্লাহর আহ্বান জনগণকে শুনিয়ে তাদের সত্য-সুন্দরের পথে আহ্বানের তাগিদ কি পরিত্যাগ করবেন ? তিনি কি আল্লাহর আহ্বান থেকে মুখ ফিরিয়ে চাচার মুখাপেক্ষী হয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন ?

এখন কি ঈমানের জগৎপ্লাবী আলো থেকে এ দুনিয়া বঞ্চিত হবে আর কুফরির অন্ধকারে ডুবে যাবে এ পৃথিবী ?

আবু তালিব বললেন– 'মুহম্মদ! আমার কথা তো শুনলে। বল, তোমার কী সিদ্ধান্ত ?'

মুহম্মদ সেই সিদ্ধান্তই নিলেন যে সিদ্ধান্ত স্বয়ং খোদাতা'লা করে রেখেছেন। তিনি সেই সিদ্ধান্ত নিলেন যা স্বয়ং খোদাতা'লার পছন্দ। তিনি দৃঢ়-কঠিন পদভরে, ইস্পাত কঠিন সংকল্প নিয়ে তাঁর প্রাণের কথাটিই বললেন ঃ 'চাচাজি! আল্লাহর কসম! আমার এক হাতে যদি দেয়া হয় আকাশের সূর্য আর অন্য হাতে

যদি দেয়া হয় আকাশের চাঁদ তা সত্ত্বেও আল্লাহর প্রদত্ত সত্যধর্ম প্রচার থেকে আমি কখনো বিরত হবো না। এর জন্যে জীবনের শেষ রক্তবিন্দুটুকু দিয়ে লড়তেও আমি পিছপা হবো না।'

না। এর চেয়ে দৃঢ়তা, এর চেয়ে বড় আত্মবিশ্বাস আর চেয়ে বড় দৃঢ়কঠিন সংকল্প আর হয় না।

মুহম্মদ সে সিদ্ধান্তই শুনিয়ে দিলেন যা একান্তভাবেই সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছা ও জগতের সত্যপন্থী মানুষদের চিরকালের আকাঙ্ক্ষা।

চাচা আবু তালিব ভাইপো মুহম্মদের প্রবল আত্মবিশ্বাসদীপ্ত এ দৃঢ়কঠিন সংকল্প দেখে বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর পানে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। তিনি চিন্তার সাগরে ডুবে গেলেন– 'এ বড় কঠিন সংকল্প। এ বড় কঠিন কাজ। কোন শক্তি আর কোন প্রেরণার বলে মুহম্মদ (সাঃ) এমন দৃঢ়আত্মপ্রত্যয়দীপ্ত মহাসংকল্প এমন কঠিনভাবে ব্যক্ত করলেন! এ পথে কত বাধা তাঁকে অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু সে বাধার প্রতি তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সংকল্প সাধনে তাঁর মনে কোন ভয় নেই।

মুহম্মদ (সাঃ) চাচার কাছ থেকে উঠে সামনে পা বাড়ালেন। আবু তালিব অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে ডেকে আর বসাতে পারলেন না। তাঁর চোখ ফেটে পানি এলো। মহানবী (সাঃ)-র হৃদয়ে আবেগের হিল্লোল উঠল। চোখের পানি মুছতে লাগলেন। ভাবলেন তিনি কী আমাকে একা ছেড়ে দেবেন ? সারাটি জীবন ধরে যিনি চোখে চোখে রেখেছেন, সামান্যতম দুঃখ ও আঘাতে জর্জরিত হতে দেননি, সেই চাচাও আমাকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন ? এ ঝড়ঝঞ্ঝাদীর্ণ জীবনে আমাকে একা ছেড়ে দিলেন ?'

মুহম্মদ (সাঃ) কিছু দূর গেলেই চাচাজি ডাকলেন ঃ 'পুত্র! একটু শোন।'

মুহম্মদ (সাঃ) চাচার কাছে গেলেন। চাচাজি বললেন ঃ 'প্রাণপ্রিয় পুত্র আমার! যাও। মন যা চায় তাই কর। এ দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে, আমি তোমার সাথেই আছি।'

চাচা আবু তালিবের কণ্ঠে একথা শুনে তাঁর মুখের হাসিতে হীরের চমক বয়ে গেল। হৃদয় তাঁর আনন্দে মেতে উঠল। পৌত্তলিকদের ক্ষমতা থাকলে তারা এবার আসুক। আর ভয় করিনা। সত্যের জন্য জীবন বাজি রেখে লড়ব। জীবনের শেষ রক্তবিন্দুটুকু দিয়ে হলেও লড়াই করব। ইসলামের আলো পৌঁছে দেবো মানুষের ঘরে ঘরে।

চাচা আবুতালিব মুহম্মদকে পূর্ণ সহযোগিতা দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি অতি দ্রুত সবাইকে একত্রিত করে সবার উদ্দেশে বললেন ঃ 'ভাইসব!

সবাই মুহম্মদের পিছনে লেগেছে। তারা তার সর্বনাশ করতে চায়। কিন্তু তাদের এ আশা আমরা কখনোই পূরণ হতে দেবো না। এসো, আমরা সবাই মিলে মুহম্মদকে সহযোগিতা করি।'

একমাত্র আবু লাহাব ছাড়া তাঁর আর সব ভাই মিলে আবু তালিবের পক্ষে মত দিয়ে তাঁর শক্তি বাড়িয়ে দিলেন। আর হতভাগ্য আবু লাহাব বললঃ 'আমি কখনোই তাকে সহযোগিতা করব না। আমি কুরাইশদের পক্ষে।'

কুরাইশরা এবার জোরে-শোরে মুহম্মদ (সাঃ) এর পিছনে নেমে পড়ল আর যত রকমের কুমতলব সম্ভব তা তাঁর বিরুদ্ধে খাড়া করে দিয়ে তাঁকে হেনস্থা করতে লাগল। তাঁর উপরে পৌত্তলিকরা এমন জুলুম শুরু করল যে, তা থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহর জমীন কেঁপে উঠল, আকাশ আল্লাহর পানাহ চাইল কিন্তু তবুও পৌত্তলিকদের হৃদয়ে কোন ভয়ের সঞ্চার হল না। এ জুলুম শুধু তাঁর উপরে নয়। তাঁর সঙ্গী-সাথীদের উপরেও সমানে চলল।

কিন্তু মানবকল্যাণকামী মহানবী মুহম্মদ (সাঃ) মানবজাতির চির অভিভাবক মুখ বুঁজে সব অত্যাচার নীরবে সয়ে যেতে লাগলেন।

পঞ্চম অধ্যায়
সংগ্রামের নয়াদিগন্ত

— কুরাইশদের অনবরত দুর্ব্যবহার

— আবু জেহেলের ব্যর্থ চক্রান্ত

— আল্লাহ্‌র রসূল পরম রক্ষকের সুরক্ষায়

— পৌত্তলিকদের হৃদয়বিদারক অত্যাচার

— অত্যাচারিত মুসলমানদের অলৌকিক আত্মশক্তি

— ইসলামের ছায়াতলে হযরত হামজা

— হযরত হামজার সাহস ও বীরত্ব

— আল্লাহ্‌র রসূল ও উৎবার সংলাপ

— উৎবার প্রতিক্রিয়া এবং কুরাইশদের প্রতি তার পরামর্শ

— পুতুলখানায় কুরআনের গুঞ্জরণ

— এক বড় হাঙ্গামা

— কুরআন সম্পর্কে পৌত্তলিকদের রায়

— রিসালাতের শক্তি প্রমাণিত

— পৌত্তলিকদের হঠকারিতা।

পঞ্চম অধ্যায়
সংগ্রামের নয়াদিগন্ত

১

মহানবীর বিরোধিতায় কাফেররা সর্বশক্তি নিয়োগ করল। তাদের দুর্ব্যবহারে মহানবী অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। কাফেরদের নিষ্ঠুরতা সীমা ছাড়িয়ে গেল। তাকে দেখলেই তারা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগল তাঁর উপরে পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল। তাদের আচার-আচরণে পশুরাও লজ্জায় মুখ ফেরাতে লাগল এমন হীন ও নীচকর্ম নেই যে, যা তারা বাকি রাখল। ভদ্রতা ও মনুষ্যত্ব তাদের আচরণ দেখে চোখ বন্ধ করল আর তাদের কুবাক্য শুনে কানে আঙুল দিল।

রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম নামে মহানবীর দুই কন্যা ছিলেন। তাদের বিয়ে হয়েছিল উৎবা ও উতাইবার সাথে। এরা দুজনেই ছিল আবু লাহাবের পুত্র। এরা দু'জনেই আবু লাহাবের মতো কট্টর ইসলাম-বিরোধী ছিল। দীর্ঘকাল ধরে তারা নবীজীর এ দুই কন্যার প্রতি চরম দুর্ব্যবহার করে যেতে লাগল। তাদের নোংরা কথাবার্তা শুনতে শুনতে তাদের হৃদয়মন তিতিবিরক্ত হয়ে উঠতে লাগল। পাপাত্মা আবু লাহাব এতেও শান্তি পেল না। অবশেষে দুই পুত্রকে সে পৃথক করে দিল।

আবু লাহাব প্রিয়নবী মুহম্মদ (সাঃ)-র বাড়ির কাছেই বসবাস করত। সে তার দরজার সামনেই খড়কুটো ও নোংরা আবর্জনা ফেলত। তার স্ত্রী উম্মে জামিলও নোংরামিতে কিছুমাত্র কম ছিল না। সে তাঁর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত।

শত্রুদের এই ছিল আচরণ। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি কখনোই কারো সাথে অভদ্র আচরণ করেননি। ইতরদের ইতরামির জবাব সদা-সর্বদাই তিনি ভদ্রতা ও সদাচরণের দ্বারাই দিয়েছেন। মনুষ্যত্ব ও মানবতাই হত তাঁর সার্বিক আচরণের মাপকাঠি। তিনি সর্বদাই ধৈর্যের মাধ্যমে কাজ করতেন। দুঃখ ও আঘাত সীমাতিক্রম করলে তিনি শুধু এতটুকুই বলতেন ঃ

'আলে মুত্তালিব! প্রতিবেশীর সাথে তোমার এ কী আচরণ ?'

কুরাইশরা তো তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্তই নিয়েছিল। কিন্তু তারা দেখল যে, বনী হাশিম ও বনী আবদুল মুত্তালিব তো তাঁর সাথেই রয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁর জন্য তারা শেষ রক্তবিন্দুটুকু দিয়ে হলেও লড়বে। এর ফলে তারা পিছিয়ে গেল। তারা সাহস ও উৎসাহ হারিয়ে ফেলল। আপাতদৃষ্টিতে মুহম্মদকে হত্যার চিন্তা ত্যাগ করলেও তারা তাঁর বিরুদ্ধে নিত্য-নূতন মতলব আঁটতে লাগল। তারা তাঁকে পথে-ঘাটে একা পেলেই হাসি-ঠাট্টা ও বিরক্ত করতে লাগল। বলতে লাগল ঃ 'কী মুহম্মদ! আকাশ থেকে আজ আর কিছু আসেনি ?' অথবা বলত ঃ

'আল্লাহ রসূল বানাবার মতো আর কাউকেই পেলো না, তোমাকেই রসূল বানাল ? তোমার চেয়েও অনেক বুদ্ধিমান ও মালদার লোক তো এ সমাজেই রয়েছে।'

সেই সাথে তারা হাততালি দিত, শিস্ দিত যাতে মুহম্মদ কোন কথা না বলতে পারেন। দরিদ্র ও দুর্বল মুসলমানদের দেখলেই তারা জোরে হাসিঠাট্টা করত আর বলত ঃ 'এরা এ দুনিয়ার বাদশাহ। খুব সত্বরই এরা রোম ও ইরান জয় করবে।'

তাঁর সবচেয়ে জড় শত্রু ছিল আবু জেহেল। সে ছিল দুশমনকুল শিরোমণি। সততা ও ভদ্রতার লেশমাত্র ছিল না তার মধ্যে। তাঁর বিরোধিতার জন্য হেন কুকর্ম নেই যা সে করত না। তাঁকে যেখানেই পেত সেখানেই যন্ত্রণা দিত। অন্য লোকেদেরও তাঁর বিরুদ্ধে উসকে দিত। তিনি যখন নামায পড়তেন তখন সে তার সাথীদের নিয়ে তাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত, হই-হট্টগোল ও হাসি-ঠাট্টা করত। তিনি ধর্ম প্রচার করতে গেলে গুণ্ডাদের নিয়ে সে কাজে বাধা দিত, তাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত। লোকেদের দেখে সে বলত ঃ

'মুহম্মদের কথাও শোনো আবার আরাম সে বাঁশিও বাজাও।'

শুধু তাই নয়, সে তার সাথীদের বলল ঃ 'আল্লাহর কসম! আগামীকাল বিরাট একটা পাথর নিয়ে বসে থাকব। এমন ভারি পাথর যে, মুহম্মদ সিজদায় গেলে তার মাথায় আঘাত করলে তার মাথা চূর্ণ হয়ে যাবে। মন চায় তোমরা আমার সাথে থেকো না চাইলে চলে যেও। আলে মানাফদের সাথে পরে মোকাবিলা করা যাবে।'

সাথীরাও তাকে প্রোৎসাহ দিল। সাহস দিতে গিয়ে তারা বললঃ 'তওবা, তওবা! আমরা কী কখনো তোমাকে ত্যাগ করতে পারি ? আমাদের ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। মনে যা ইচ্ছা হয় তাই করো। আমরা তোমার সাথেই আছি।'

সকাল হলে আবু জেহেল এক ভারি পাথর নিয়ে কাবার নিকটে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। কাছাকাছি জায়গায় তার সাথীরাও গিয়ে বসল। প্রত্যেক দিনের মতোই মহানবী এলেন এবং 'রোকনে ইয়ামানী' ও 'হাজরে আসওয়াদ'-এর মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে নামাযে মশগুল হয়ে গেলেন। তারপর মহানবী সিজদায় যাওয়ার সাথে সাথেই আবু জেহেল পাথর উঠিয়ে তাঁর দিকে ধাবিত হল। সাথীরা সেখানে বসে মনোযোগ সহকার দেখতে লাগল কী ঘটতে যাচ্ছে।

কী অদ্ভুত দৃশ্য..........! আল্লাহর এক দুশমন সেই মাথা চূর্ণ করতে যাচ্ছে যার মাথা তার প্রভুরই পদতলে পড়ে রয়েছে। আর সে তাঁর মাথাই চূর্ণ করতে যাচ্ছে যার মাথা রক্ষার দায়ভার স্বয়ং আল্লাহরই হাতে।

সাথীরা ভীতসন্ত্রস্ত চিত্তে আবু জেহেলের এ কর্মকাণ্ড রুদ্ধশ্বাস নেত্রে দেখতে লাগল। হঠাৎ তারা দেখতে পেল আবু জেহেল ফিরে আসছে। তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ভয়ে চোখ উল্টে যাওয়ার মতো অবস্থা। হাতের পাথর পূর্বের মতো হাতেই রয়ে গেল।

সাথীরা ভীতসন্ত্রস্ত চিত্তে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলঃ 'আরে কী হয়েছে ? কী হয়েছে ?'

আবু জেহেল হাঁফাতে হাঁফাতে বলল ঃ

'আরে তোমরা কিছু দেখোনি ? সামনে অগ্নিকুণ্ড। আর একটুখানি এগুলেই জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যেতাম।'

এ কথা শুনে তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তারা মনে করল এসব আবু জেহেলের কারসাজি। আসলে এসব তার লোক দেখানো ব্যাপার। আদৌ সে তাঁকে মারতে যেতে চায়নি। এসব দেখে তার এক সাথীর মনে জেদ চেপে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে পাথর উঠিয়ে সে মহানবী (সাঃ) এর দিকে ধাবিত হল। কিছু দূর গিয়েই সে থেমে গেল এবং আবু জেহেলের মতোই সে ফিরে এলো। লোকেরা দেখল তার চেহারাও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ভয়ে তার চোখ উল্টে যাবার মতো অবস্থা।

আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করলেন। শত্রুদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে গেল। শয়তানদের মনের কথা মনেই রয়ে গেল।

এটা কোন নতুন ঘটনা নয়। কুরাইশরা অনবরত নতুন নতুন চক্রান্তের জাল বুনে যেতে লাগল। কিন্তু তাদের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রয়ে গেল; তারা অনবরত সর্বনাশা চিন্তা করতে লাগল। কিন্তু কোন চক্রান্তই তারা বাস্তবে রূপ দিতে পারল না। তারা তাঁর বিরুদ্ধে কিছুই করতে না পেরে অবশেষে হতদরিদ্র ও দুর্বল মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ নিতে লাগল। এ অপকর্মে কুরাইশদের সাথে সাথে আরো কয়েকটি গোত্রও যোগ দিল। এ গোত্রগুলি এবার দলবদ্ধভাবে অত্যাচারে নেমে পড়ল। তারা একটা চুক্তিও করল। সে চুক্তি অনুসারে তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, যে কোনো জায়গায় যে কোন গোত্র যে যেভাবে পারবে মুসলমানদের তারা ক্ষতবিক্ষত করতে থাকবে।

এ চুক্তি ছিল মুসলমানদের জন্য খুবই যন্ত্রণাদায়ক ও বেদনাদায়ক। তাদের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া তাদের জন্য একটা অসাধ্য ব্যাপার হয়ে গেল। প্রত্যেকটি গোত্র তাদের সুবিধামতো মুসলমানদের উপরে জুলুম অত্যাচার করতে লাগল। তারা ইচ্ছামতো তাদের মারধর করতে লাগল। কারো দাস অথবা দাসী মুসলমান হয়ে গেলে তো কথাই নেই। তাদের উপরে অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যেতে লাগল। আর তাদের দাস-দাসীদের ইসলাম ত্যাগ না করা পর্যন্ত তারা সীমাহীন জুলুম-অত্যাচার চালিয়ে যেতে লাগল।

দিনের পর দিন অত্যাচার বেড়ে চলল। তারা এতই নিষ্ঠুর ছিল যে, তাদের পাষাণ হৃদয় বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। তাদের অত্যাচারে ধরণী কেঁপে উঠল। আকাশ ভেঙে পড়তে চাইল। এ অত্যাচারীরা অসহায় মুসলমানদের বন্দী করল।

প্রচণ্ড মাধর করল। ক্ষুৎ-পিপাসায় কষ্ট দিল। মক্কার তপ্ত মরুভূমিতে শুইয়ে তাদের উপর চরম অত্যাচার চালাল। গরম লৌহশলাকা দিয়ে দাগ দিল। পানিতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে নির্যাতন করল।

এদের মধ্যে একেবারে দুর্বল ঈমান যাদের তারা এ অত্যাচার সইতে না পেরে কেবলমাত্র প্রাণের তাগিদেই তারা পুনরায় ফিরে গেল পূর্বের পৌত্তলিকতায়। আর কিছু লোক প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে মুখে পৌত্তলিকতা স্বীকার করে নিল কিন্তু অন্তরে তারা মুসলমান রয়ে গেল। আর এক শ্রেণীর মুসলমান যাঁরা কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রাণ দিতে রাজি ছিলেন কিন্তু ঈমান দিতে রাজি ছিলেন না কিছুতেই। এ সাহসী মুসলমানরা নিজেদের জীবনের বিনিময়েও জালিমদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করে চললেন।

এই বীর মুসলমান নওজওয়ানদের ও যুবকদের মধ্যে ছিলেন ইয়াসির, তাঁর সহধর্মিনী সুমাইয়া ও তাঁদের কলিজার টুকরো পুত্র সন্তান আম্মার। মক্কার এ তিন ব্যক্তি ছিলেন খুবই গরীব। একেবারে প্রথম দিকে এঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। শত্রুরা তাদের উপর চরম অত্যাচার করল। তারা তাঁদের কাপড় খুলে দিত। প্রচণ্ড রোদে মক্কার তপ্ত মরুভূমিতে তাদের শুইয়ে দিয়ে অত্যাচার করত। কখনো গায়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিত। কখনো বা পানিতে ডুবিয়ে কষ্ট দিত। এমন দুঃসহ অবস্থার মধ্য দিয়ে মহানবী মুহম্মদ (সাঃ) যখন তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করতেন তখন সান্ত্বনা দিতেন এবং বড়ই দরদের সঙ্গে বলতেন– 'ধৈর্য ধরো, ধৈর্য্য ধরো। তোমাদের ঠিকানা জান্নাত।' এ অত্যাচারে অতিষ্ঠ ইয়াসির ছটফট করতে করতে মারা গেলেন। হজরত সুমাইয়া আবু জেহেলের হাতে শহীদ হলেন। আবু জেহেল সদা-সর্বদাই তাঁর উপরে অত্যাচার করত। অত্যাচারে অতিষ্ঠ সুমাইয়া সুযোগ বুঝে আবু জেহেলকে এক আঘাত দিলেন। ক্রোধান্ধ আবু জেহেল তাঁকে বল্লমের আঘাতে খুন করল। সুমাইয়া শহীদ হয়ে গেলেন। ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম শহীদ হওয়ার মর্যাদা লাভ করলেন এই সম্মানিত মহিলা– হজরত সুমাইয়া রাজিয়াল্লাহু আনহা।

এ দুষ্ট লোকেরা হজরত আম্মারের উপর অত্যাচারের চূড়ান্ত করল। তারা তাকে লোহার বেড়ি পরিয়ে প্রচণ্ড রোদে মক্কার তপ্ত মরুভুমিতে ছেড়ে দিত; কখনো বা তপ্ত বালুতে শুইয়ে তাঁকে এমনভাবে মারত যে, তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন। কিন্তু এ মারপিট ও রোদের গরম তাঁর হৃদয়ের ঈমানের চেয়ে বেশী তপ্ত বলে কখনোই প্রতীত হত না।

ইসলামের এ বীরপুরুষদের মধ্যে হজরত খাব্বাবও ছিলেন। ইনি ছিলেন উম্মে আনমারের দাস। এ পাপিষ্ঠ লোহার শিক গরম করে তার মাথায় ছেঁকা দিত। উহ্! কী কষ্টটাই না তিনি পেতেন! একদিন এমনও করল যে, জ্বলন্ত

অঙ্গার বিছিয়ে দিয়ে তাতে শুইয়ে দিল এবং সে অবস্থাতেই সে অঙ্গার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। হজরত খাব্বাব এ অত্যাচারের কথা জানিয়ে মহানবীর কাছে ফরিয়াদ করলে তিনি স্বয়ং আল্লাহর দরবারে হাত তুলে বললেন ঃ

'হে আল্লাহ! তুমি খাব্বাবকে সাহায্য কর।'

মহানবীর দোয়া আল্লাহর দরবারে গৃহীত হল। উম্মে আনমারের মাথায় এক রোগ হল। চিকিৎসকরা চিকিৎসা করতে গিয়ে বললেন, তার মাথায় গরম লোহার শলাকা দিয়ে দাগাতে হবে। অতএব হজরত খাব্বাব লোহাশলাকা গরম করে তার মাথায় দাগাতেন। এ বীর মুসলমানদের অন্যতম হজরত বেলাল ছিলেন খালফের পুত্র উমাইয়ার হাবশী ক্রীতদাস। উমাইয়া তাকে অনাহারে রেখে দিত। ফলে, ক্ষুৎ-পিপাসায় তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠত। দুপুরের সময় তপ্ত পাথরের চাতালে শুইয়ে দিয়ে তাকে পাথর চাপা দিয়ে রাখত এবং বলত ঃ 'হয় মুহম্মদকে ত্যাগ করে লাত উজ্জার পূজা কর নতুবা এভাবে শাস্তি ভোগ কর।'

হজরত বেলাল এসব অত্যাচার নীরবে সয়ে যেতেন। সে সময়ে তাঁর মুখ দিয়ে একটিই মাত্র বাক্য বের হত ঃ

'আহাদ! আহাদ!! আল্লাহ তো এক! আল্লাহ্ এক!!

ঈমান তাঁর রক্তমাংসসহ সমস্ত সত্তার সাথে মিশে গিয়েছিল। শত জুলুম সত্ত্বেও ঈমান ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। পরিপূর্ণ ঈমানী জোশ নিয়ে তাই সর্বান্তঃকরণে তিনি ঐ শব্দটিই বার বার উচ্চারণ করতেন।

প্রিয়নবী মুহম্মদ যখনই তাঁকে এ অবস্থায় দেখতেন, তখনই তাঁকে ভরসা দিতেন আর দরদভরা কণ্ঠে বলতেন ঃ

'বেলাল ভয় পেও না। আহাদ, আহাদই অবিলম্বে তোমাকে মুক্তির স্বাদ দেবেন।'

ওয়ারাকা বিন নওফেল তাঁকে অতিক্রম করার সময় বলতেন ঃ 'আল্লাহর কসম! এ অবস্থায় যদি তোমাদের মৃত্যু হয় তাহলে আমি তোমাদের কবরস্থানগুলোকে জিয়ারতগৃহে পরিণত করব।'

হজরত বেলাল পাহাড়ের মতো ধৈর্য ধারণ করে রইলেন। তারপর হজরত আবুবকর উমাইয়ার কাছে গিয়ে তাকে বললেন ঃ 'আরে উমাইয়া! তোমার মধ্যে কী দয়ামায়া বলে কিছু নেই ? তুমি তাকে তিলে তিলে হত্যা করছ ?' উমাইয়া বলল ঃ 'তোমরাই তো এদের মাথা খারাপ করে দিয়েছো। এখন তুমিই তাকে বাঁচাও।'

হজরত আবুবকর বললেন ঃ 'আমার এক পৌত্তলিক দাস আছে। তুমি তাকে নিয়ে বেলালকে আমাকে দাও।

উমাইয়া বলল ঃ 'ঠিক আছে আমি রাজি। তুমি বেলালকে নিয়ে তাকে আমাকে দাও।'

হজরত আবুবকর তাঁর পৌত্তলিক ক্রীতদাসের বিনিময়ে বেলালকে নিয়ে গিয়ে তাঁকে মুক্ত করে দিলেন।

কেবল হজরত বেলালই নন। এরকম অগণিত ক্রীতদাস ইসলাম গ্রহণের কারণে এভাবে নির্যাতিত হচ্ছিলেন। হজরত আবুবকর সেসব দীনদরিদ্র হতভাগ্য ক্রীতদাসদের প্রতি এ হেন অত্যাচারে বড় ব্যথিত ও মর্মাহত হয়ে উঠলেন। হজরত আবুবকর সে ক্রীতদাসদের কিনে কিনে স্বাধীন করে দিতে লাগলেন। এ সব দেখেশুনে তাঁর পিতা একদিন তাঁকে বললেন–

'পুত্র! তুমি তো যত সব দুর্বল ক্রীতদাসদের মুক্ত করে দিচ্ছ। এমন কিছু ক্রীতদাস মুক্ত কর যারা শক্তিমান ও কর্মক্ষম। প্রয়োজনে যারা কোন কাজে আসতে পারে। বিপদাপদে তোমাকে সাহায্য করতে পারে।

উত্তরে হজরত আবুবকর বললেন ঃ 'আব্বাজান! আমার ইচ্ছা তো শুধু আল্লাহকেই খুশি করা।'

তাঁর এ কথা আল্লাহর দরবারে বড়ই পছন্দের সাথে গৃহীত হল। পরিণামে অবতীর্ণ হল পবিত্র কুরআনের এ প্রত্যাদেশঃ

'আর কারোরই তাদের প্রতি কোন অধিকার নেই, তুমি যাদের মুক্তি দিয়েছ। তা তো কেবলমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহকেই কুশি করার নিমিত্ত এবং আল্লাহ অতি শীঘ্রই তোমার প্রতি খুশি হয়ে যাবেন।' –আল-কুরআন, সূরা- আল লাইল।

২

আবু জেহেল প্রিয়নবী মুহম্মদকে কোন রকমের যন্ত্রণা দিতে পিছপা হল না। সুযোগ পেলেই মহানবীকে সে নানা রকমের কষ্ট দিতে লাগল। মহানবীর নবুয়তের ষষ্ঠ বর্ষের ঘটনা। একদিন মহানবীর পাশ দিয়ে আবু জেহেল হেঁটে যাচ্ছিল। পাপিষ্ঠ আবু জেহেল তাঁকে দেখামাত্রই গালাগালি দেয়া শুরু করল। মুখে যা এলো তাই বলতে লাগল। তার জবাবে তিনি কিছুই বললেন না। কোন প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করলেন না। তা দেখে আবু জেহেলের মেজাজ আরো চড়ে গেল, রাগে লাল হয়ে গেল। এবার পাপিষ্ঠ আবু জেহেল মাটি থেকে মুঠো ভরে কাঁকর তুলে তাঁর পবিত্র মুখে নিক্ষেপ করল। আর সেই সাথে অকথ্য ভাষায় তাঁকে গালাগালি করতে লাগল।

এ ঘটনা অতি নিকট থেকে এক দাসী প্রত্যক্ষ করল। সে ছিল আবদুল্লাহ তাইমীর দাসী। এ হল সেই আবদুল্লাহ তাইমী যে ছিল মহানবীর হিজরতকালে গুহার অভ্যন্তরে মহানবীর সাথে আশ্রিত হজরত আবুবকরের চাচাত ভাই। তাঁকে মক্কার কুরাইশ নেতৃবৃন্দের একজন বলে গণ্য করা হত। সে ছিল মক্কার একজন ধনী লোক। সে দাসী ক্রয় করে তাদের দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করিয়ে ধনোপার্জন করত।

আল্লাহর রসূলের সাথে তাঁর দুশমনের এ ঘৃণ্য আচরণ দেখে এ দাসী খুব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বাস্তবিকই ইসলামের প্রতি তার দরদ ছিল। মহানবীকে সে খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখত। লোকেদের এ খবর জানা ছিল না। সে তার ঈমান গোপন রেখেছিল। কেননা, তা প্রকাশ হয়ে পড়লে তার পৌত্তলিক প্রভুর অত্যাচারে তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠত।

সন্ধ্যাবেলা এক ব্যক্তি কুবাইস পাহাড়ের দিক থেকে হেঁটে আসছিলেন। সে এ দৃশ্য অবলোকন করল। দেখল মাঝারি চেহারার একজন মানুষ। তাঁর চোখ ছিল কালো, বুক চওড়া। গম্ভীর চেহারার এক মেযাজী মানুষ। কোমরে তলোয়ার বাঁধা। ঘাড় থেকে একটা কাপড় পিঠের দিকে ঝুলানো। ইনি আর কেউ নন; সকলের পরিচিত কুরাইশ-ব্যাঘ্র হামজা। আবুদল মুত্তালিবের পুত্র এবং প্রিয়নবীর চাচা। আর এক সম্পর্কে তিনি ছিলেন তাঁর খালাতো ভাই এবং দুধভাইও। তিনি শিকার করে ফিরছিলেন কাবা শরীফ তওয়াফ করার উদ্দেশে। তিনি কোথাও যাওয়ার পূর্বে কাবা পরিক্রমা করতেন আবার ফেরার পথেও তাই করতেন। সেখানে কুরাইশ নেতৃবৃন্দও অবস্থান করতেন। তাদের সাথে সাক্ষাৎ

করে অবশেষে বাড়ি ফিরে আসতেন।

হামজা নিকটে এলেই দাসী বলল ঃ 'আবু উমারা! আপনাদের মধ্যে কী আত্মমর্যাদাবোধ বলে কিছু নেই ? বনী মাখজুম গোত্রের লোকেরা মুহম্মদকে ইচ্ছামতো নির্যাতন করছে অথচ আপনারা কিছু বলেন না!'

হামজা থেমে গিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'আবদুল্লাহর সেবিকা! তুই এ কী কথা বলছিস ?'

দাসী বলল ঃ 'আজ তোমার ভাইপো মুহম্মদকে কী নির্যাতনই না করেছে সে কথা আর কী বলব ? মুহম্মদ এখানেই ছিলেন। আবু জেহেলও কোথা থেকে এলো। ক্রমেই তাঁকে এমন জঘন্য ভাষায় গালি দিতে লাগল যে, তা দেখে আমার মাথা গরম হয়ে গেল। এতেও সে ক্ষান্ত হল না। এবার মুঠি ভর্তি কাঁকর নিয়ে তাঁর মুখে ছুঁড়ে মারল।'

হামজা ঃ 'এ কী তোর স্বচক্ষে দেখা ?

দাসী ঃ 'হাঁ, হাঁ, এ আমার নিজ চোখে দেখা, নিজ কানে শোনা।'

হামজা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। বিলম্ব না করেই চলে গেলেন কাবা ঘরে। সেখানে কাউকেই সালাম করলেন না। কাউকে কিছুই বললেন না। পৌঁছেই আবু জেহেলকে দেখতে পেলেন। সে লোকজনের মাঝখানেই বসে ছিল। হামজা সতেজে অগ্রসর হয়ে কাছের ল্যাঠি দিয়ে তার মাথায় এত জেরে আঘাত করলেন যে, সে আঘাতে তার মাথা ফেটে রক্তের ধারা বয়ে যেতে লাগল। পুরো

চেহারা রক্তে ভিজে গেল। হামজা সক্রোধে চীৎকার করে বললেন ঃ 'মুহম্মদ আমার ভাইপো। তুই যাকে লাওয়ারিশ ভেবেছিস, সে তোর গালি খাওয়ার জন্য সৃষ্টি হয়নি; আর তার চেহারা তোর পাথর নিক্ষেপের জন্য সৃষ্টি হয়নি।'

হামজা ছিলেন অত্যন্ত রাগী ও গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। তাঁকে ক্রোধান্বিত দেখলে ভয়ে সবাই থর থর করে কাঁপত। তিনি ক্ষিপ্ত হলে তাঁকে কেউ ঠেকাতে পারত না।

আবু জেহেল নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য বলল ঃ 'সাহেব! মুহম্মদ তো আমাদের মূর্খ ছাড়া আর কিছুই মনে করে না। তার যা মনে হয় তাই বলে। সে আমাদের ধর্মীয় চেতনায় আঘাত করে। কখনো বা আমাদের পূর্বপুরুষদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে। শুধু তাই নয়; আমাদের দেবদেবীদেরও সে মর্যাদা দেয় না। সেইসাথে আমাদের দাস-দাসীদের আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে।'

হামজা ঃ 'তোর চেয়ে মূর্খ আর কে আছে যে, হাতে-গড়া প্রাণহীন মূর্তির পূজা করে ? কান খুলে শুনে রাখ, আমি আমার ভাইপোর পক্ষে। আজ থেকে আমার জীবন ইসলামের জন্য উৎসর্গিত হল। ইসলামের জন্যই আমার জীবন আর ইসলামের জন্যই আমার মরণ ধার্য হল।'

আবু জেহেল ছিল মাখজুম গোত্রের লোক। সেখানে ঐ গোত্রের আরো কিছু লোক উপস্থিত ছিল। তারা অতি দ্রুত আবু জেহেলের সাহায্যার্থে এগিয়ে এলো এবং বলল ঃ 'হামজা! মনে হচ্ছে, তুমিও তোমার ধর্ম ত্যাগ করেছো। এখন তুমি অন্য ধর্মের কথা চিন্তা করছ।'

হামজা ঃ 'সত্য যখন আমার কাছে সত্য বলে স্পষ্ট হয়ে গেল তখন তাকে কেন স্বীকার করব না ? শুনে নাও। মুহম্মদ আল্লাহর রসূল। তিনি যা কিছু বলেন, তা সর্বৈব সত্য। তাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহর কসম! এখন এ থেকে কেউ আমাকে ফেরাতে পারবে না। আর হাঁ, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, আর সাহস থাকে, তাহলে বাধা দিয়ে দেখো।'

আবু জেহেল হামজার এ মূর্তি দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। বুঝল যে, এর পরিণাম ভালো হবে না। তাই সে তার সাথীদের বলল ঃ 'তোমরা সরে যাও। তাকে যেতে দাও। বাস্তবিকই আমি মুহম্মদের উপর জুলুম করেছি।'

হামজা উপস্থিত লোকেদের সামনে নিজেকে মুসলমান বলে ঘোষণা দিলেন এবং নির্ভয়ে বললেন ঃ 'মুহম্মদের ধর্মই আজ থেকে আমার ধর্ম।'

তারপর তিনি ঘরে ফিরে এসে চিন্তা করতে লাগলেন ঃ 'আমি যা কিছু বলে এসেছি, তা কী সত্য ? আমি ভুল কিছু বলিনি তো ? আমি আবেগের বশে ভেসে যাইনি তো ?'

পুরো রাত জেগেই কেটে গেল। তিনি দোয়া করতে লাগলেন ঃ 'প্রভু আমার! তুমি আমাকে সরল পথ দেখাও। আমার মনের সমস্ত সন্দেহ দূর করে দাও।'

প্রভাত হলে তাঁর মনে হল সব ঠিক আছে। তাঁর হৃদয়ের সমস্ত দরজা উন্মুক্ত হয়ে গেছে। হৃদয় প্রশান্ত হল, বিশ্বাসের আলোয় সমস্ত অন্তর আলোকিত হয়ে উঠল। সকালে দৌড়ে ভাইপো মুহম্মদের কাছে গেলেন। তিনি তাঁকে তাঁর ঈমান আনার সুসংবাদ দিলেন এবং এ সংকল্পও করলেন যে, পবিত্র ইসলাম ও মুহম্মদের জন্য শেষ রক্তবিন্দুটুকু দিয়েও তিনি সংগ্রাম করবেন।

হামজার মুসলমান হওয়ার সংবাদে কাফেরদের পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠল। মিথ্যা ও অসত্য পবিত্র ইসলামের এক বীর-মুজাহিদের সামনে অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হামজার ঈমান আনার সংবাদে তাঁর সমস্ত সত্তা আনন্দে আলোড়িত হয়ে উঠল। তাঁর এ আনন্দের সীমা-পরিসীমা রইল না। লোকেরা দেখল যে, তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে সদ্য ফোটা গোলাপের হাসি খেলে যাচ্ছে। মুখে যেন আকাশের চাঁদ হাসছে। হামজার ঈমান আনার সুসংবাদে তাঁর অবচেতনেই তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো একটিমাত্র বাক্য— 'হে আল্লাহ! তুমি হামজাকে ঈমানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখ।'

হামজা কুরাইশকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন। তাঁর বীরত্বের প্রশংসা সবার মুখে মুখে ফিরত। ছোট বড় সবাই তাঁকে ভয় করত। তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিল পবিত্র ইসলামের জন্য এক শুভসূচনা। সে সময় মহানবী এ দোয়াও করলেন ঃ 'হে আল্লাহ! উমর ও আমরের মধ্যে যে তোমার অধিক প্রিয় তাকে দিয়ে তুমি ইসলামের সহযোগিতা কর।'

উমর ছিল খাত্তাবের পুত্র আর আমর (আবু জেহেল) ছিল হিশামের পুত্র। এরা ছিল কুরাইশকুলের মধ্যে খুবই শক্তিশালী ও প্রভাবশালী দুই গোত্রপতি। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, এদের মধ্য থেকে যে কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে ইসলামের শক্তি বহুগুণ বেড়ে যাবে।

৩

মুসলমানদের শক্তি-সামর্থ্য দিনের পর দিন বেড়ে চলল। তা দেখে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ প্রমাদ গুণতে লাগল আর সেসাথে নয়া নয়া চক্রান্তের জাল বিস্তার করে যেতে লাগল। সেইসাথে হামজার ইসলাম গ্রহণ তাদের জন্য বিরাট এক বিপদ ও তাদের অস্তিত্ব রক্ষার বিরুদ্ধে বিরাট এক হুমকি হয়ে দাঁড়াল। শত্রুরা হামজার ইসলাম গ্রহণের সংবাদে যুগপৎ বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। সর্বত্রই নিরাশার আঁধার ঘনিয়ে এলো। সর্বত্রই নৈরাশ্য ও উদাসীনতার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। একাধিক ব্যক্তি একত্রিত হলেই এ বিষয়ে দুঃখ ও শোক প্রকাশ করতে লাগল। একদিন একদল কুরাইশ একত্রিত হয়ে মহানবীর সম্পর্কে নানা রকম

আলাপ-আলোচনা করছিল। মহানবীকে কীভাবে রোখা যায়– তাই ছিল তাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু। এরই মধ্যে অন্যতম কুরাইশ দলপতি উত্‌বা বিন রবীআ সবার উদ্দেশে বলল ঃ 'ভাইসব! আমি মুহম্মদের সাথে কথা বলব ? আমার ইচ্ছা যে, আমি তার কাছে কিছু প্রস্তাব উত্থাপন করি। হয়তো তিনি আমাদের কোন কথা মেনে নিতে পারেন নতুবা নতুন কোন প্রস্তাব দিতে পারেন।'

সবাই সমস্বরে বলল ঃ 'অবশ্যই যাও আবুল ওয়ালিদ। গিয়ে তাকে যে কোন মূল্যে রাজি করাও।'

উত্‌বা উঠে প্রিয়নবীর কাছে গিয়ে বলল ঃ 'প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি জান যে, তুমি কত মহান ও উচ্চবংশের সন্তান। আমাদের হৃদয়ে তোমার স্থান কোথায় তা তুমি খুব ভালোই জানো; কিন্তু তুমি এমন একটা খারাপ আওয়াজ তুলেছো যে, তাতে পুরো সমাজ-ব্যবস্থাই ভেঙে পড়েছে, সমগ্র জাতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। আচ্ছা শোনো, আমি কিছু প্রস্তাব তোমার কাছে রাখছি। হয়তো তোমার কাছে তা গ্রহণযোগ্যও হতে পারে এবং তুমি এ কাজ ত্যাগও করতে পারো।'

প্রিয়নবী বললেন ঃ 'হাঁ, হাঁ বলুন আবুল ওয়ালিদ! আমি তা মনোযোগ দিয়েই শুনব।'

উত্‌বা বলল ঃ 'ভ্রাতুষ্পুত্র! জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে কী লাভ ? ধনসম্পদ চাও তো বলো, আমরা তার ব্যবস্থা করি। নেতা হওয়ার ইচ্ছা থাকলে বলো, আমরা তোমাকে নেতৃত্বে বরণ করি, বাদশাহী চাইলে বলো, আমরা তার জন্যও প্রস্তুত। তুমিই বলো, তুমি যা চাইবে তাই হবে। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু হবে না। আর হাঁ, তোমার উপরে যদি ভূত-প্রেতের আছর হয় তা-ও বলো, আমরা তার মোকাবিলায় যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করি, তাতে তুমি সুস্থ হয়ে যাবে। আর যতক্ষণ তুমি সুস্থ না হবে ততক্ষণ তোমার জন্য আমরা সম্পদের প্রবাহ বইয়ে দেবো।'

উত্‌বা পূর্ববর্তীদের ন্যায় এভাবে তাঁকে লোভ দেখানোর বৃথা চেষ্টা করে যেতে লাগল।

উত্‌বার কথা শেষ হলে মহানবী বললেন ঃ 'আবুল ওয়ালিদ! আপনার কথা তো শুনলাম। এবার একটু ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনুন!'

মহানবী পবিত্র কুরআনের সূরা সিজদা আবৃত্তি শুরু করলেন। উত্‌বা মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগল। এ সূরার মধ্যে এমন কিছু কথা এলো যা শুনে উত্‌বার হৃদয় আবেগমথিত হয়ে উঠল। মহানবীর সূরা পাঠ শেষ হলে উত্‌বা উঠে কুরাইশদের কাছে চলে গেল। কিন্তু তাঁর চিন্তা-ভাবনা আর আগের মতো রইল না। তাঁর অভ্যন্তরের জগৎ বদলে যেতে লাগল। তার সাথীরা তাকে আসতে দেখে দূর থেকে চীৎকার দিয়ে বললঃ

'আল্লাহর কসম! সে যে চেহারা নিয়ে গিয়েছিল, তার সে চেহারা আর নেই। একেবারেই বদলে গেছে।' কাছে আসতেই তারা বলল ঃ 'বলো আবুল ওয়ালিদ! কী খবর ?'

আবুল ওয়ালিদ বলল ঃ 'আল্লাহর কসম। জীবনে আমি অনেক কবির অনেক কবিতা শুনেছি। বহু জ্যোতিষীর বহু জ্যোতির্বাণী শুনেছি, কিন্তু আজ যা শুনলাম, তা আর কোথাও কখনোই শুনিনি। ভাইসব! তোমরা আমার কথা মেনে নাও। মুহম্মদ যা কিছু করছে তাকে তা করতে দাও। তাকে আরবদের উপর ছেড়ে দাও। যদি সে সফল হয় তাহলে তোমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়ে যাবে এবং তোমরা ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ-বিগ্রহের কবল থেকে রক্ষা পাবে। আর যদি সে বেইজ্জতি হয়, তাহলে তোমাদেরও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। তার মর্যাদার সাথে তোমাদেরও মর্যাদা ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। তার শক্তি তোমাদেরও শক্তি।'

কুরাইশরা বলল ঃ 'আবুল ওয়ালিদ! আল্লাহর কসম! তার যাদুর প্রভাব থেকে তুমিও নিজেকে রক্ষা করতে পারলে না।'

আবুল ওয়ালিদ বলল ঃ 'আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে যা সত্য বলে বুঝেছি, তাই তোমাদের বলেছি। এখন তোমাদের যা মন চায় তাই করো।'

পবিত্র কুরআনের আয়াত কারো মুখ থেকে শুনতে পেলেই তাকে ঠাট্টা মস্করা করা ও যাতনা দেয়া কুরাইশদের একটা সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কাউকে নামায পড়তে দেখলেই তাকে কষ্ট ও আঘাত দিত, এসব কিছুই ছিল তাদের শত্রুতাজনিত হঠকারি অপকর্মের সাধারণ দৃষ্টান্ত। কিন্তু বাস্তবে এমন কিছু লোক ছিল যারা মহানবীর কথা শোনার জন্য মনে মনে খুবই উৎসুক হয়ে থাকত। কুরাআনের আয়াত শুনতেও তারা খুব ভালোবাসত।

মুসলমানরা তখনো পর্যন্ত খুবই গোপনে এবং ধীর আওয়াজে কুরআন পড়তেন এবং মুখস্ত করে নিতেন। একদিন কেউ একজন বললেন ঃ

'কুরআন খুবই ধীর কণ্ঠস্বরে পাঠ করা হচ্ছে। কুরাইশরা এর ফলে কুরআনের বাণী শুনতে পাচ্ছে না। তারা এ মহাবাণীর অন্তর্নিহিত ভাব ও সৌন্দর্য সম্পর্কে কিছুই জানতে পারছে না। আমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে সাহস করে তাদের তা শুনিয়ে আসতে পারে ?'

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ ছিলেন প্রিয়নবীর একজন বিশিষ্ট সাথী। অনেক আগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বললেন ঃ 'আমিই যাচ্ছি। আজ আমি তাদের কুরআন শোনাব।'

সাথীরা পরামর্শ দিল ঃ 'আবদুল্লাহ! এটা তোমার জন্য বিপজ্জনক ব্যাপার। এ কাজের জন্য এমন একজন লোকের প্রয়োজন যে কুরাইশদের মধ্যেকার কেউ হবে। তাহলে পৌত্তলিকদের হামলা হলে তারা তাকে রক্ষা করতে পারে।'

আবদুল্লাহ বললেনঃ 'আমাকেই যেতে দিন আল্লাহই আমাকে রক্ষা করবেন।'

ঠিক দুপুর বেলা। কুরাইশরা কাবাগৃহে বসে ছিল। আবদুল্লাহ উঠে মাকামে ইব্রাহীমের পাশে উচ্চঃস্বরে 'সূরা রহমান' পড়তে লাগলেন। যা ছিল অসাধারণ সাহিত্যগুণ, সৌন্দর্য ও ললিতপূর্ণ।

লোকেরা আবদুল্লাহর দিকে তাকিয়ে একে অন্যকে প্রশ্ন করতে লাগল ঃ 'আবদুল্লাহ বিন মাসউদ এ কী পাঠ করছে ?'

কেউ বলল ঃ 'এসব তো কবি মুহম্মদের বাণী।'

এর পরেই মুশরিকরা আবদুল্লাহর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে চড়-থাপ্পড় মারতে লাগল। আবদুল্লাহ কোন পরোয়া না করেই আরো জোরে জোরে কুরআন পাঠ করতে লাগলেন। প্রাণভরে কুরআন পাঠ করে তিনি তাঁর সাথীদের মধ্যে ফিরে এলেন। তাঁর চেহারায় আঘাতের চিহ্ন।

সাথীরা বললেন ঃ 'আবদুল্লাহ! আমরা এ ভয়টাই করছিলাম।'

তিনি বললেন– 'আল্লাহর শত্রুদের আজকের চেয়ে এতটা দুর্বল আমার আর কখনো মনে হয়নি। বলো তো আগামী কালই আবার শুনিয়ে আসতে পারি।'

সাথীরা বললেন ঃ 'যাক। যথেষ্ট হয়েছে। যে কথা তারা কখনো শোনেনি, তা আজ তাদের কানে পৌঁছে গেল।'

কুরআন– হাঁ, সেই মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআন– যা নিয়ে কুরাইশদের মাথা ব্যথার অন্ত ছিল না তাই শোনার জন্য তারা অধীর হয়ে থাকত এবং গোপনে কান পেতে শুনত। মুহম্মদের মুখনিঃসৃত প্রত্যাদিষ্ট বাণী শোনার আগ্রহ প্রত্যেকের মধ্যেই দেখা যেত। তারা অনুভব করত যে, এ মহাবাণীর কাছে কবির কবিতা আর জ্যোতিষীর জ্যোতর্বাণী রদ্দি ছাড়া আর কিছু নয়। জ্যোতিষীর বাণী ও যাদুকরের যাদুকাঠি সবই তাদের শক্তি হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়ল।

রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে কুরাইশরা লুকিয়ে প্রিয়নবীর বাড়ির দিকে রওয়ানা হত। সেখানে নিকটবর্তী স্থানে তারা একে অন্যকে লুকিয়ে বসে পড়ত। মহানবী একান্ত নিভৃতে নিরালায় পবিত্র কুরাআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে নামায পড়তেন। সে আওয়াজ ছিল বড়ই মিষ্টি-মধুর, বড়ই সুন্দর। উচ্চারণভঙ্গী ছিল ভারী সুন্দর ও মনোরঞ্জক। বার বার তিনি পুনরুচ্চারণ করতেন। এসব লোকেরা নিশ্চুপ হয়ে বসে বসে তা শুনত। আর প্রভাত হয়ে এলে যার যার ঘরে ফিরে যেত। এসব হত রাতের অন্ধকারে। কেউ কারো খবর জানতে পেত না। মহানবীও এসব খবর জানতেন না।

একদিনকার কথা। আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান ও আখনাস নিজ নিজ বাড়ি থেকে রওয়ানা হলেন। চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। এ তিন ব্যক্তি লুকিয়ে মহানবীর বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে গোপনে বসে পড়ল। অন্ধকার রাত

বলে কারো পক্ষে কাউকে দেখতে পাওয়া সম্ভব ছিল না। মহানবী কুরআন পড়ছিলেন। আওয়াজ ছিল ভারী সুন্দর ও মনোহর। শুনতে বড়ই ভালো লাগছিল। গোপনে যার সেই বসে ছিল আর ভাবছিল আমি একাই। প্রভাতে যে যার গৃহপানে ফিরে চলল। কিন্তু হঠাৎ এক জায়গায় তিনজনই একে অন্যের মুখোমুখি হয়ে পড়ল। সবাই সবার উদ্দেশ্যের কথা জেনে ফেলল। সকলেই সকলের কাছে যারপরনাই লজ্জিত হল এবং ঠিক করল যে, এ কথা কেউ কাউকে বলবে না। তারা বলল ঃ 'আমাদের বাইরে যদি আগে ঘটনা কেউ দেখে ফেলে তাহলে বড়ই দুর্ভাগ্যের কারণ হবে। আমাদের সবকিছু ফাঁস হয়ে যাবে আর তা হবে মুহম্মদের জন্য বড়ই সুসংবাদ।'

পরদিন রাতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। আবু জেহেল মুহম্মদের বাড়ির কাছে গোপনে বসে পবিত্র কুরআনের বাণী শুনতে লাগল। সে ভাবল, আজ আর কেউই আসবে না।

কিছুক্ষণ পরে আবু সুফিয়ানও এসে পৌঁছালো। তারপর নিকটবর্তী একস্থানে লুকিয়ে বসে পড়ল। ভাবল, আজ আর কেউ আসবে না।

কিছুক্ষণ বাদেই আখনাসও এসে পৌঁছালো। তারপর সুবিধামতো একটা জায়গায় বসে পড়ল। ভাবল, আজ আর নিশ্চয়ই কেউ আসবে না।

প্রভাতেই সবাই যে যার ঘরে ফিরে চলল। দুর্ভাগ্যবশত, আজও তিনজনের দেখা হয়ে গেল। সবাই খুবই লজ্জিত হল। এ ভুল আর কখনো হবে না। বলে সবাই ঠিক করল।

তৃতীয় দিন রাতেও আবু জেহেল মহানবী (সাঃ) এর বাড়ির দিকে চললেন। ভাবলেন, দুজনে দু'বার এসেছে, দু'বারই ধরা পড়েছে। এখন সেই একই ভুল তারা নিশ্চয়ই আর করতে পারে না। প্রত্যেকেই একই কথা ভাবল এবং পূর্বের দুই রাত্রির ন্যায় গোপনে যার সেই জায়গায় গিয়ে বসল এবং প্রভাতে ফেরার পথে প্রত্যেকেই পুনরায় মুখোমুখি হলো। আবারো লজ্জিত হলো তিনজনেই। এবার তারা আবারো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো এবং শপথ করল যে, এই একই ভুল তারা আর কখনোই করবে না। সকালবেলা আখনাস আবু সুফিয়ানের কাছে এলো। বলল ঃ 'আবু হানজালা! মুহম্মদের মুখনিসৃত বাণী তুমি শুনেছো, বলো, এ বিষয়ে তোমার কী অভিমত ?'

আবু সুফিয়ান বলল ঃ 'আল্লাহর কসম আবু সালবা! এমন কিছু কথা তো শুনেছি, যার মর্মার্থ আমি বুঝি। তার প্রকৃত অর্থও অনুভব করতে পারি। কিন্তু এমন কিছু কথাও আছে যার মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারি না। বুঝতে পারি না যে, এর প্রকৃত অর্থ কী ?'

আখনাস বলল ঃ 'আল্লাহর কসম! আমারও একই অনুভব।'

তারপর আখনাস আবু জেহেলের কাছে এসে একই প্রশ্ন করল।

জবাবে আবু জেহেল বলল ঃ 'তুমি জানো না ? আমরা চিরকালই আব্দে মানাফের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি। এমন কোন কাজ নেই যা তারা করেছে, অথচ আমরা ছেড়ে দিয়েছি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি। তুমি জেনে রাখো যে, আমরা চিরকালই তাদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করেছি। আজ তারা বলছে, তাদের মধ্যে একজন নবী এসেছে। তার উপরে নাকি আকাশ থেকে প্রত্যাদেশ আসে। এখন বলো, তারা এখন কোথায় আর আমরাই বা কোথায় ? আল্লাহর কসম! শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকতে আমি ঈমান আনবো না আর তার একটা কথাও আমি মেনে নেবো না।'

এই ব্যক্তিহিংসা ও বিদ্বেষকে ধিক্কার জানানো ছাড়া আর কী করা যেতে পারে ?

সে জানত যে, মুহম্মদ সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মুহম্মদের প্রতিটি কথাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সে একথাও জানত যে, মুহম্মদ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রসূল। তাঁর উপরে আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়। কিন্তু হিংসা-বিদ্বেষে সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হিংসানলে সে জ্বলেপুড়ে মরছিল। আর ওদিকে অভিশপ্ত শয়তান তার পিঠ চাপড়াচ্ছিল।

সে চাইত যে, মুহম্মদের উপরে যা অবতীর্ণ হচ্ছে তা তাদের উপরেও অবতীর্ণ হোক। নবুয়তের মর্যাদার অধিকারী তারাও হোক। পূর্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতার জের ধরে সে আলে মুত্তালিব থেকে কিছুমাত্র পিছনে থাকতে চায়নি।

ওয়ালিদ বিন মুগীরা তো খোলাখুলি বলত ঃ

'আমাকে ছেড়ে মুহম্মদের উপর আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হতে পারে ? যেখানে আমি কুরাইশদের একজন সম্মানিত নেতা। সবার চোখে আমি অভিজাত ব্যক্তিত্ব। শুধু তাই নয় ছকীফ গোত্রের নেতা আবু মাসউদ কী এ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হতে পারে ?'

কী অদ্ভুত কথা! এ লোকেরা নবুয়তের যোগ্যতা লাভ না করা সত্ত্বেও নিজেদের নবী হবার দাবিদার বলে তুলে ধরতে লাগল। অথচ তারা বুঝল না যে, তাদের এ দাবি কতটা অযৌক্তিক।

কুরাইশদের মধ্যে নজর বিন হারিস নামে এক কুখ্যাত বদমাইশ লোক ছিল। সে কসম খেলো যে, সদা-সর্বদাই সে মহানবীর বিরোধিতা করবে এবং জনসাধারণকে সে সর্বদাই তাঁর বিরুদ্ধে উসকে দেবে। ইয়েমেনের এক নগরের নাম হীরা; নজর সেখানেও গিয়েছিল। সে সেখানে পারস্যের রাজাদের বৃত্তান্ত

অধ্যয়ন করেছিল। সে তাদের উপাসনা-পদ্ধতির কথাও জেনেছিল। সে সদাসর্বদাই মহানবীকে ছায়ার মতো অনুসরণ করত ও তাঁকে অনবরত বিরক্ত করত। মহানবী যেখানেই জনসাধারণকে সত্যের বাণী শোনাতেন, সেখানেই সে জনসাধারণকে বিরক্ত করত, ভয় দেখাত ও তাদের সে কথা শুনতে বাধা সৃষ্টি করত। মহানবী যখনই সেখান থেকে চলে যেতেন সে তখনই তাদের কাছে গিয়ে বলতঃ 'ভাইসব! আমি এর চেয়েও ভালো কথা তোমাদের শোনাচ্ছি। মনোযোগ দিয়ে শোনো।'

সে তাদের ইরানের ঘটনাবলী শোনাত। সেখানকার রাজাদের কাহিনী শোনাত। তাদের ধর্মের কাহিনী শোনাত ও নানা রকমের মনগড়া কাহিনী তাদের শুনিয়ে দিত। তারপর বলত ঃ

'মুহম্মদের কথা আমার চেয়ে ভালো কী করে হতে পারে ? সে কী আমার মতো অতীত কাহিনী শোনাতে পারে ?'

লোকেরা দোটানায় পড়ে যেতো কার কথা সত্য ? কে সত্যের উপরে আর কে অসত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত ? কে আমাদের মঙ্গল চায় ? কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ ? তা বোঝা বড়ই কঠিন হয়ে পড়ত।

নজর-এর এ জঘন্য প্রয়াস জোর কদমে এগিয়ে চলল। সে তার অন্যান্য সাথীদের বলল ঃ

'আবু মুইতের পুত্র উকবাকে সাথে নিয়ে মদীনায় গিয়ে ইহুদি আলেমদের সাথে যোগাযোগ করো। সেখানে গিয়ে মুহম্মদের সমস্ত কথা তাদের শুনিয়ে দাও। এ ব্যাপারে তাদের ধারণা কী তা জেনে এসো। তাঁদের কাছে ঐশ্বরিক গ্রন্থ রয়েছে। নবীদের সম্পর্কে তাঁরা পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখেন। সঠিক কথা তারা বলতে পারবে।'

নজর ও উকবা মক্কায় গিয়ে ইহুদি আলেমদের কাছে তাদের আসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করল। সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়ে ইহুদি আলেমরা বললেন ঃ

'আগের যুগে কয়েকজন যুবক ছিলেন। তাদের বৃত্তান্ত খুবই অদ্ভুত। মুহম্মদকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করো, দেখবে, তিনি কিছু বলছেন। আর এক একজন এসেছিল। সে ধরণীতে কিছু কাজ করে গেছে। মুহম্মদকে প্রশ্ন করো, তিনি এ বিষয়ে কিছু জানেন কি-না ? এবং এ কথাও জিজ্ঞেস করো যে, তাঁরা উপরে কুরআন কোথা থেকে অবতীর্ণ হচ্ছে ? যদি তিনি এ তিনটি প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারেন, তাহলে বুঝে নিও যে, তিনি একজন সত্য নবী।'

তারা দুজনে মক্কায় ফিরে এলো। কুরাইশরা অপেক্ষমাণ ছিল। নিকটে আসতেই তারা প্রশ্ন করল ঃ 'ভাইসব! বলো কী খবর ?'

ইহুদিদের সাথে যেসব কথা হয়েছিল, তার সবটাই তাদের কাছে বর্ণনা করল

এরপর কিছু লোক মুহম্মদের কাছে এসে এ বিষয়ে প্রশ্ন করল। এ কথা শুনে মহানবী (সাঃ) কুরআনের বাণী অবতরণের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ প্রত্যাদেশের মাধ্যমে সমস্ত কথা জানিয়ে দিলেন। ঐ যুবকদের কথাও বর্ণনা করলেন, যা 'সূরা কাহাফ' -এ বর্ণিত হয়েছে। ভ্রমণকর্তার (সাইয়্যাহ) সম্বন্ধেও বলা হল– তিনি ছিলেন জুলকারনাইন। এ ঘটনা ছিল তাঁরই। সে ঘটনাও 'সূরা কাহাফ' -এ বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা হল– 'এদের বলে দাও, প্রত্যাদেশ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর ইচ্ছায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু তোমরা বাহ্যিক কথা ও প্রত্যাদিষ্ট বাণীর পার্থক্য বুঝতে পারো না। আর সন্দেহ করো যে, এ সব মানুষের কথা। কোন মানুষের মনগড়া বাক্য। কারণ, তোমরা অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে আছো এবং বোধ-বুদ্ধি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছ।'

'এবং এসব লোকেরা তোমাকে প্রত্যাদেশ (ওহী) সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। বলে দাও, তা আমার প্রভুর ইচ্ছায় প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয় কিন্তু অজ্ঞানতা বশত তোমরা তা জান না।' – কুরআন

প্রিয়নবী পৌত্তলিকদের কাছে এলেন। তিনি তাদের অনেক প্রশ্নের জবাব দিলেন, যাতে তারা ঈমান আনে। যাতে তারা তাঁকে নবী বলে স্বীকার করে। কিন্তু তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গিয়েছিল। তাদের হৃদয় বিন্দুমাত্র নরম হল না। বরং তারা তাঁর সাথে হঠকারিতার চূড়ান্ত করল।

নজর বলল ঃ 'ভাইসব! তোমরা থামো। মুহম্মদের মতো বাণী আমিও তোমাদের শুনিয়ে দিচ্ছি।'

অন্য এক ব্যক্তি বলল ঃ 'এর কুরআন তোমরা শুনো না। এ পাগলের প্রলাপ। এসব উপহাস করে উড়িয়ে দাও। এর ফলে, মুহম্মদ নিরাশ হয়ে পড়বে।'

আবু জেহেল বলল ঃ 'মুহম্মদের কথায় তোমরা ভয় করো ? যে বলছে, আগুনে তোমাদের জ্বালানো হবে এবং আল্লাহর উনিশ জন রক্ষী আছে। তারা পালাতে দেবে না। তোমরাই বলো, এটা কী কোনো ভয়ের কথা হলো ? তাদের মোকাবিলার জন্য কী আমাদের একশ রক্ষীই যথেষ্ট নয় ?'

আফসোস! দুঃখের কথা!! কী জঘন্যতম কথা!!! অথচ তারা নিজেরাই বিশ্বাস করত যে, এ দুনিয়াটাকে তছনছ করে দেয়ার জন্য আল্লাহর একজন ফিরিশতাই যথেষ্ট।

'এবং আমরা তাদের অগ্নিতে দহন করার জন্য ফিরিশতাদের সৃষ্টি করেছি এবং আমরা তাদের জন্য সে ব্যবস্থাই করেছি যারা কুফরি করেছে।'

–আল-কুরআন, সূরা- মুদসাস্সির

ষষ্ঠ অধ্যায়

দুর্যোগের ঘনঘটা

— হাবশায় হিজরত

— নাজ্জাশীর দরবারে কুরাইশদের প্রতিনিধিদল

— দরবারে মুসলমানদের উপস্থিতি

— হযরত জাফরের প্রভাবশালী ভাষণ

— নাজ্জাশীর প্রতিক্রিয়া

— এক শয়তানী সম্মেলন

— উমর রসূলুল্লাহকে হত্যার আকাঙ্ক্ষায়

— ফাতিমা ও সঈদের ঈমানী শক্তি

— উমর রসূলের সেবায়

— উমরের ঈমানী শক্তি ও স্বাভিমান

— মুসলমানদের পূর্ণ বয়কট

— মুসলমানদের অসাধারণ ধৈর্যশক্তি ও একতা

— আলে মুত্তালিবের স্বাভিমান

— চাচা ও ভাইপোর অন্তিম বাক্যালাপ

— বিবি খাদিজার ইন্তেকাল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দুর্যোগের ঘনঘটা

১

আল্লাহর পথে বাড়ি-ঘর ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে বসবাস করাকেই হিজরত বলে। হিজরত শব্দের অর্থ দেশত্যাগ বা পলায়ন। কাফেরদের অত্যাচারে মক্কায় মুসলমানদের বসবাস করা যখন অসম্ভব হয়ে উঠল তখন প্রিয়নবী (সাঃ) তাঁর নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীদের বললেন ঃ 'আল্লাহর দুনিয়া অনেক বড় জায়গা। তোমাদের নিরাপত্তার জন্য অন্য কোন জায়গা অনুসন্ধান করো। এতে অত্যাচারিদের কবল থেকে অন্যত্র চলে গিয়ে তোমরা অনেক শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।'

সাথীরা বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রসূল! কোথায় যাওয়া যায় আপনিই বলে দিন!'

মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ 'হাবশায় চলে যাও। সেখানকার রাজা একজন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি কারো উপর অত্যাচার হতে দেন না। সে দেশের লোকেরা অনেক সুখে শান্তিতে বসবাস করেন।'

আফ্রিকা মহাদেশের এক বিখ্যাত দেশের নাম হাবশা। দেশটি আরবের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। দু'দেশের মধ্যবর্তী স্থানে লোহিত সাগর প্রবাহিত। সেখানকার সম্রাটের নাম ছিল নাজ্জাশি। তিনি ছিলেন খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী।

পবিত্র রমজান মাস। মহানবীর নবুয়তের পঞ্চম বর্ষ। নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথেই তাঁর বিশ্বস্ত সাথীরা হাবশা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। দু'চারজন করে একে একে সবাই আরব ত্যাগ করলেন। হাবশায় পৌঁছালে নাজ্জাশি তাঁদের স্বাগত জানালেন। তিনি তাঁদের সম্মানজনকভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন আর সেই সাথে যাবতীয় আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করে দিলেন।

এ খবর জানতে পেরে কুরাইশরা অস্থির হয়ে উঠল। তারা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। কিন্তু কেন ? মুসলমানরা তাদের কী ক্ষতি করেছিল ? তারা তো নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছিল। এর ফলে তো কুরাইশদের শান্তি পাওয়ার কথা ছিল।

প্রকৃত সত্য হল কুরাইশরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। তারা চিন্তা করল, মুসলমানরা যদি বাইরের সাহায্য পায় তাহলে উপায় কী হবে ? তখন তো আমরা তাদের কাছে অসহায় হয়ে পড়ব আর ময়দান তো তাদের জন্য সাফ হয়ে যাবে। তারপর, তাদের আহ্বান আরো ছড়িয়ে পড়বে। সর্বত্রই ইসলাম ছড়িয়ে পড়বে। আর এ প্রতিমাকুলের কী অবস্থা হবে ?

এ কথা চিন্তা করে তারা দেরি না করে হাবশার সম্রাটের কাছে দু'জন লোককে তাদের প্রতিনিধি করে পাঠিয়ে দিল। এদের একজন রবীআর পুত্র

আবদুল্লাহ ও অন্যজন আসের পুত্র আমর। এদের হাবশার সম্রাটের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল তাদের বিরুদ্ধে সম্রাটের কান ভাঙিয়ে মুসলমানদের ধরে আবার মক্কায় ফিরিয়ে আনা। সম্রাটকে প্রলোভিত করার জন্য তারা মূল্যবান উপঢৌকনও সাথে করে নিয়ে গেল।

হাবশায় পৌঁছে প্রথমেই তারা সেখানকার পাদ্রিদের সাথে সাক্ষাৎ করল। তাদের পরিকল্পনা ছিল যে, প্রথমেই তাদের রাজি করানো যাক। সে উদ্দেশ্যে তারা পাদ্রিদেরও কিছু উপঢৌকন ঘুষ স্বরূপ দিল।

এরপর তারা দু'জনে রাজদরবারে গেল। সেখানে বড়ই বিনয়-নম্রতার সাথে সম্রাটের কাছে উপঢৌকন পেশ করল। তারপর বলল ঃ 'মহামান্য সম্রাট! আমাদের ওখানকার কিছু দুষ্কৃতকারী দেশ ত্যাগ করে এসে আপনার এখানে আশ্রয় নিয়েছে। তারা তাদের পূর্বধর্ম ত্যাগ করেছে। আপনার ধর্মও গ্রহণ করেনি। সম্পূর্ণ নতুন একটা ধর্ম নিয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। সে ধর্ম সম্পর্কে না আমরা কিছু জানি, না আপনি কিছু জানেন। সে ধর্মের কারণে আরবের ঘরে ঘরে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। তাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের নেতারা আপনার দরবারে আমাদের পাঠিয়েছেন। তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মোটেও ভালো নয়।'

পাদ্রিরা সাথে সাথে তাদের কথায় সায় দিয়ে 'হাঁ, হাঁ করে উঠল এবং সাথে সাথে বলল ঃ 'মাননীয় সম্রাট! এরা সম্পূর্ণ সত্য কথা বলছেন। বাস্তবিকই কিছু অপরাধী এখানে পালিয়ে এসেছে। তাদের অবিলম্বে এদের হাতে তুলে দেয়া হোক।'

কিন্তু নাজ্জাশী এ কথা মানলেন না। তিনি বললেন ঃ 'যারা আমাদের এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছেন এবং এখানে আশ্রয় নেয়াটা নিরাপদ বলে ভেবেছেন, আমি তাঁদের কথাও অবশ্যই শুনব। তাঁরা যেখানেই আছেন, তাঁদের এখানে হাজির করা হোক।'

এর ফলে, চক্রান্তকারী ব্যক্তিদ্বয় যারপরনাই চিন্তিত হয়ে পড়ল। মুসলমানদের হাজির করা হলে সম্রাট তাঁদের কাছে প্রশ্ন করলেন ঃ

'আমি শুনলাম যে, আপনারা আপনাদের জাতীয় ধর্ম ত্যাগ করেছেন। তা ত্যাগ করে আমার ধর্মও গ্রহণ করেননি আবার অন্য ধর্মেরও বিরোধিতা করছেন। আরো শুনলাম যে, আপনারা সম্পূর্ণ নতুন একটি ধর্ম গ্রহণ করেছেন। কী সে ধর্ম? কী তার লক্ষ্য, কী তার উদ্দেশ্য ?'

ঐ মুসলমানদের মধ্যে আবু তালিবের পুত্র হজরত জাফরও শামিল ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে সবার উদ্দেশে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় বললেন ঃ 'মান্যবর সম্রাট! আমরা অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিলাম। হাতে গড়া প্রাণহীন মূর্তির পূজা করতাম, মৃত প্রাণীর মাংস খেতাম। নানাবিধ কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমরা পরস্পর মারামারি ও হানাহানিতে লিপ্ত ছিলাম।

সবলেরা দুর্বলদের উপর নির্মমভাবে অত্যাচার করত। প্রতিবেশীদের উপর অত্যাচার করত। এ অবস্থা থেকে উদ্ধারের নিমিত্তে সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের মধ্যে এক রসূল প্রেরণ করলেন। আমরা তাঁর চরিত্র ও বংশ পরিচয় সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই অবগত। আমরা তাঁর পবিত্রতা ও চারিত্রিক সততা বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত। তিনি আমাদের সত্য ধর্মের দিকে আহ্বান করলেন। তিনি বললেন– 'এসো, আমরা কেবল এক আল্লাহর উপাসনা করি। প্রাণহীন মূর্তির উপাসনা ত্যাগ করো। সত্য বলো। ঈমানদার হও। আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় করো। প্রতিবেশীদের সাথে সদাচরণ করো। জুলুম ও অত্যাচার পরিত্যাগ করো। অনাচার ও ব্যভিচার ত্যাগ করো। অনাথের ধন আত্মসাৎ করো না। সচ্চরিত্র রমণীকে মিথ্যা অপবাদ দিও না। নামায পড়ো। দান-খয়রাত করো।' আমরা তাঁকে সত্যবাদী বলে জানি। তাই তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা ঈমান এনেছি। আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি যা কিছু বলেছেন আমরা তা মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছি। আমরা এ সত্য গ্রহণ করেছি–এটাই আমাদের অপরাধ–আর আমাদের জাতি এজন্যই আমাদের উপর অসন্তুষ্ট। তাঁরা এ কারণে আমাদের উপর নির্মমভাবে অত্যাচার করছে। তারা আমাদের সর্বপ্রকারে কষ্ট দিচ্ছে যাতে আমরা এ ধর্ম ত্যাগ করে পূর্বতন ধর্মে পুনরায় ফিরে আসি। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমরা দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছি যাতে আমরা একটু শান্তিতে নিঃশ্বাস নিতে পারি; আশা যে, আমরা আপনার এখানে একটু শান্তিতে বাঁচতে পারব। জুলুম ও অত্যাচারের কালো মেঘ আমাদের মাথার উপর থেকে সরে যাবে।'

জাফরের কথা শুনে নাজ্জাশী বললেন ঃ 'তাঁর উপরে যে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে তা আমিও শুনতে চাই, আপনারা তা শোনাতে পারবেন ?' হজরত জাফর 'সূরা মরিয়ম' -এর কিছু আয়াত আবৃত্তি করে শোনালেন। এ আয়াতগুলি শুনে নাজ্জাশী এতটা প্রভাবিত হলেন যে, তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তিনি নীরবে এতটা কাঁদলেন যে, সে নয়নাশ্রুতে তাঁর পুরো দাড়ি ভিজে গেল। যে পাদ্রিরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরাও আবেগাপ্লুত হয়ে উঠলেন। তাঁদের আঁখিও অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের দাড়িও ভিজে গেল এবং সে অশ্রুতে সামনে খুলে রাখা গ্রন্থাবলীও ভিজে গেল। এসব আয়াত শোনার পর নাজ্জাশি বললেন ঃ

'আল্লাহর কসম! এ আয়াত ও হজরত ঈসার উপর অবতীর্ণ আয়াত একই উৎস হতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ একই প্রদীপের আলো।'

তারপর তিনি কুরাইশ প্রতিনিধিদ্বয়কে বললেন ঃ 'তোমরা ফিরে যাও। আল্লাহর কসম! আমি কখনোই তোমাদের হাতে এদের তুলে দেবো না।'

মুসলমানদের প্রতি তিনি খুবই সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলেন। সেজন্য তিনি সে জালিমদের হাতে তাঁদের অর্পণ করলেন না। মূল্যবান উপহারসামগ্রী তিনি

ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি ঐ প্রতিনিধিদ্বয়ের একটি কথাও শুনতে আর রাজি হলেন না। কুরাইশ প্রতিনিধিদ্বয় মুখ ভার করে রাজদরবার ত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে গেল আর এদিকে দেশত্যাগী মুসলিম শরণার্থীরা পরম শান্তিতে হাবশায় বসবাস করতে লাগলেন।

২

'মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার পথ খুলে গিয়েছে'– একথা ভেবে পৌত্তলিকরা অশান্ত হয়ে উঠল। তারা একদিন একত্রিত হল। ওয়ালিদ বিন মুগীরাকে সভাপতি করে তারা এক সম্মেলন অনুষ্ঠান করল। ওয়ালিদ বয়োবৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। পুরো জাতিই তাকে মান্য করত। সম্মেলনে মুহম্মদ (সাঃ) এর বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলাপালোচনা শুরু হল। ওয়ালিদ বললেন ঃ 'হজ্জ আগত প্রায়। দূর-দূরান্ত থেকে লোকেরা হজ্জ করতে আসবে। মুহম্মদকে (সাঃ) নিয়ে সর্বত্রই আলাপালোচনা চলছে। এখন সবাই মিলে আপসে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের মধ্যে একই কথা প্রচার করো। তোমরা ভিন্ন ভিন্ন কথা প্রচার করবে না। তাহলে লোকে তোমাদের মিথ্যাবাদী বলবে। তাহলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।' কুরাইশরা বললঃ 'হে ওয়ালিদ! আপনিই এরকম একটি কথা বলে দিন আমরা তাই বলব।'

ওয়ালিদ ঃ 'না। আগে তোমরা বলো। তোমাদের কী মনে হয় ?'

কুরাইশ ঃ 'আমরা বলব, মুহম্মদ একজন তান্ত্রিক।'

ওয়ালিদ ঃ 'আল্লাহর কসম! তিনি তান্ত্রিক নন। আমি বহু তান্ত্রিক দেখেছি; তান্ত্রিকদের গীত ও বাণী অন্য জিনিস।'

কুরাইশ ঃ 'আমরা বলব তিনি পাগল।'

ওয়ালিদ ঃ 'না। তিনি পাগল নন। আমি বহু পাগলকে জানি। তাঁর (সাঃ) মধ্যে এ সবের চিহ্নমাত্র নেই। আর তাঁর কথাও পাগলের প্রলাপ নয়।'

কুরাইশ ঃ 'আমরা বলব মুহম্মদ কবি।'

ওয়ালিদ ঃ 'তিনি কবিও নন। বহু কবিকে আমার জানা আছে। লড়াইয়ের ময়দানে বহু কবি দেখেছি। তাদের সুর, ছন্দ ও কাব্য-কবিতা সম্পর্কেও আমার জানা আছে। তাঁর বাক্যাবলী কবিতা নয়।'

কুরাইশ ঃ 'তাহলে আমরা বলব মুহম্মদ যাদুকর।'

ওয়ালিদ ঃ 'তিনি যাদুকরও নন। আমি বহু যাদুকর দেখেছি। তাদের কলাকৌশলও অনেক দেখেছি। মুহম্মদের বাক্যাবলী যাদু-টোনা ও মন্ত্রতন্ত্র বলেও মনে হয় না।'

কুরাইশরা এবার বিস্মিত হল। তারপর বলল ঃ 'হে ওয়ালিদ! তাহলে আমরা কী বলব তা আপনিই বলে দিন।

ওয়ালিদ ঃ 'আল্লাহর কসম! তার বাণী বড়ই সুমধুর। তা যেন এক বিশাল মহীরুহ যার শিকড় অতি গভীরে প্রোথিত আর তা বড়ই মজবুত। তা অত্যন্ত মধুর ফলফলাদির শাখা-প্রশাখার মতো। আমরা তাকে এসব কিছু বললে লোকে আমাদের মিথ্যাবাদী বলবে। ফলে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। লোকে বলবে, এসব অপপ্রচার; বরং আমরা বলব, তিনি এক বড় যাদুকর। তিনি যাদুকরী বাক্য নিয়েই জনগণকে প্রভাবিত করছেন। এরফলে, পিতা-পুত্র, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, সমাজ-সংসার সর্বত্রই বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়েছে।'

এ পরামর্শ শুনে সকলেই যারপারনাই খুশি হল। সভা সমাপ্ত হল। সিদ্ধান্ত হল যে, হাজিদের কাফেলা মক্কায় পৌঁছাবার সাথে সাথেই সম্মিলিতভাবে অপপ্রচার চালানো হবে।

হজ্জ মওসূম এসে গেল। দেশ-বিদেশ থেকে হাজিদের কাফেলা মক্কায় এসে গেল। তারা সব সময়ই সুযোগের অপেক্ষায় থাকত। সুযোগ পেলেই কান ভারি করতে লাগল হাজি সাহেবদের। দেখামাত্রই তাদের মুখে একটাই বাক্য সমস্বরে উচ্চারিত হতে লাগল– 'মুহম্মদ যাদুকর। তার কথায় যাদু রয়েছে।'

হজ্জের পরে কাফেলা যার সেই স্থানে ফিরে গেল। তিনি সবাইকে সত্যের সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন। এভাবে সমগ্র আরবদেশে তাঁর কথা চর্চিত হতে লাগল। অনেকের মধ্যেই প্রকৃত সত্য সম্পর্কে কৌতুহল জাগল। ফলে তারা তা জানার উদ্দেশে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

থুথু উপরে নিক্ষেপ করলে তা নিজের মুখেই পড়ে। পৌত্তলিকরা মহানবীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল। তা বুমেরাং হয়ে তাদের দিকেই ফিরে এলো। তারা ইসলামকে মুছে ফেলার চক্রান্ত করেছিল। ফল হলো বিপরীতে হিত।

সমগ্র আরবদেশে মুহম্মদ (সাঃ) এর নাম ছড়িয়ে পড়ল। এর প্রভাব দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল। পৌত্তলিকরা এ ভয়টাই করত। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মকে নিজেদের জীবনের বিনিময়েও রক্ষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিল অন্য। ধর্মরক্ষার চেয়ে দুনিয়াদারিটাই ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য। আরবের লোকেরা সম্পূর্ণ স্বাধীন জীবন যাপন করত। তাদের জীবন ছিল আইন-কানুন ও বাধা-বন্ধনহীন। তারা ছিল প্রবৃত্তির দাস। মন যা চাইত তাই করত। অশ্লীলতা ও লজ্জাহীনতা ছিল তাদের জীবনযাত্রার প্রধান বৈশিষ্ট্য। মদ ও জুয়ার মধ্যে তারা ডুবে থাকত। লোকেরা ছিল বেপরোয়া। মহানবীর স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ ছিল এর বিরুদ্ধে এক জোরালো আওয়াজ। শুধু তাই নয়। মক্কা ছিল মূর্তিপূজার আখড়া। লোকেরা দূর-দূরান্ত থেকে জিয়ারত করতে আসত। কুরাইশরা ছিল মঠ ও মন্দিরের অধিরক্ষক। তারা পূজায় প্রসাদ ও উপহার সামগ্রীর একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত। এমন কী নানা রকমের চালবাজি ও

চালাকির দ্বারা জনগণকে ধোকা দিয়ে ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করত। ইসলামের আওয়াজ ছিল এই ব্যবসা-বাণিজ্যের বিরুদ্ধে এক বিরাট বিপদ-সঙ্কেত। তাই তাদের পক্ষে আর নীরবে বসে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

'না–আমরা আর চুপ করে বসে থাকতে পারি না। এ আমরা বরদাশত করতে পারি না। এখন আর দয়াদাক্ষিণ্য আর সহানুভূতির প্রশ্ন নয়। মুহম্মদ হোক অথবা তার সাথীরাই হোক। এর একটা বিহিত ব্যবস্থা হয়ে যাক।'

কিছু মুসলমান ছিলেন পৌত্তলিকদের দাস। এ পৌত্তলিকরা তাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালাত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে কোনো প্রকারে ইসলাম থেকে এদের ফিরিয়ে আনা। মুসলমানদের উপর তাদের এ অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আঘাতে আঘাতে তারা জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। ধনী মুসলমানরা এ ক্রীতদাসদের ক্রয় করে মুক্ত করে দিতেন।

পৌত্তলিকরা দেখল এর ফলে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবার তারা ক্রীতদাসদের বিক্রি করা বন্ধ করে দিল। ভাবল, তাদের এমন অত্যাচার করব যে, তারা বাপের নাম ভুলে যাবে।

যে মুসলমানরা হাবশায় না গিয়ে প্রিয়নবীর সাথে মক্কাতেই রয়ে গিয়েছিলেন, তাদের উপর তারা মনের সুখে প্রতিশোধ নিতে লাগল।

শুধু তাই নয়। সেই সাথে প্রিয়নবী মুহম্মদ (সাঃ)-কেও। যদিও আবু তালিব ও তাঁর বংশের লোকেরা তাঁর পক্ষে ছিলেন তা সত্ত্বেও তাঁর উপরে কম অত্যাচার করা হল না।

৩

প্রিয়নবী মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার বড় খেদ করে প্রাণভরে দোয়া করেছিলেনঃ 'প্রভু! খাত্তাবের পুত্র উমরকে তুমি সুমতি দাও। তার হৃদয়ে ইসলামের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়ে দাও।' তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, উমর ইসলাম গ্রহণ করলে ইসলাম বড় শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

উমর ছিলেন এক নও-জওয়ান। তিনি ছিলেন দৃঢ় চিত্তের এক শক্তিমান যুবক। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্ভীক চরিত্রের মানুষ। প্রতিশ্রুতিশীল এ তরুণ কোনো কাজ শুরু করলে তার শেষ না দেখে ছাড়তেন না। এসব কারণে ইসলামের শত্রু হওয়ার দরুন তিনি ছিলেন তার কট্টর শত্রু এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর এবং নির্মম। কোন দাসী ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি তার প্রতি বড় নির্মম অত্যাচার করতেন। মারতে মারতে অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত তাকে ছাড়তেন না। অজ্ঞান হয়ে থাকলে পুনরায় বলতেন– 'আমি তো অজ্ঞান করে ছেড়ে দিয়েছি। একটু দম নিই। তারপর আবার তোর খবর নেবো।'

উমর একদিকে ছিলেন অত্যন্ত নির্মম, জালিম ও নিষ্ঠুর অন্যদিকে তাঁর ছিল স্পর্শকাতর দরদী একটা হৃদয়। তিনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষায় ছিলেন খুবই

আন্তরিক। পরিবারের সদস্যদের কাছে তিনি ছিলেন এক আদর্শ মানুষ। তিনি যখন জানতে পারেন পৌত্তলিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে একদল মুসলমান হাবশায় পালিয়ে গেছে তখন তিনি ব্যথাহত হন আর যখন শোনেন যে, হাবশার শাসক নাজ্জাশী তাঁদের আশ্রয় দিয়েছেন এবং তাদের ফিরিয়ে আনতে যাওয়া দু কুরাইশ প্রতিনিধি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে তখন তাঁর মাথা গরম হয়ে গেল। রাগে তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। সেই সাথে রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন– 'মুহম্মদই আসল বিষবৃক্ষ। সে-ই কুরাইশদের মধ্যে বিষ ছড়িয়ে তাদের মধ্যে বিভেদ আর হানাহানি সৃষ্টি করেছে। পারস্পরিক হানাহানি, অবিশ্বাস আর সন্দেহের বাতাবরণ সে-ই সৃষ্টি করেছে। আমি সে বিষবৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করে তারপর ছাড়ব।'– উমর নাঙ্গা তলোয়ার হাতে তুলে নিলেন। মুহম্মদকে চিরকালের জন্য দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে জাতির মুক্তি আর অশান্তি দূরীকরণের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মুহম্মদের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁকে দেখা মাত্রই হত্যা করে তারপর শান্ত হবেন।

সরোষে হুঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। পথিমধ্যে দেখা হয়ে গেল বনী আদী গোত্রের এক যুবকের সাথে। তাঁর নাম নুয়াইম বিন আবদুল্লাহ। তিনি প্রথমেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু সে খবর কেউ রাখত না। অত্যাচার ও নিপীড়নের হৃদয়বিদারক দৃশ্যাবলী তিনি স্বচক্ষেই দেখেছিলেন তাই তিনি তাঁর ইসলাম প্রচারের কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করেননি। তিনি দেখলেন, উমর তরবারি হাতে খুব দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছেন। তিনি বললেন ঃ 'খাত্তাব-পুত্র। এত ব্যস্তত্রস্ত হয়ে কোথায় চললে ?'

উমর ঃ 'সেই বিধর্মী ব্যক্তিটিকে খুঁজতে বেরিয়েছি যে আমাদের দেবতাদের অমর্যাদা করে সমাজকে তছনছ করে দিচ্ছে।'

উমরের ভয়ংকর ক্রোধের কথা নুয়াইম জানতেন। আশঙ্কিত হলেন এই ভেবে যে, যদি মহানবীকে সে হত্যা করে ? তাই তিনি উমরকে অন্যদিকে প্রবাহিত করার চিন্তা করতে লাগলেন। তারপর তাঁর মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি বললেন ঃ 'উমর! কী আশায় তুমি মুহম্মদকে হত্যা করতে যাচ্ছো ? তাঁকে হত্যা করলে আব্‌দে মানাফরা কী তোমাকে ছেড়ে দেবে ? ফিরে যাও, আগে তোমার ঘরের খবর নাও।'

উমর ঃ 'কী বললে ? কেন, আমার ঘরে কে ?'

নুয়াইম ঃ 'তোমার বোন ও ভগ্নিপতি মুসলমান হয়ে গেছে। তারা মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেছে। আগে তাদের খোঁজ নাও।'

উমর এ কথা শোনামাত্রই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। তাঁর বোন ও ভগ্নিপতি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের জন্য তাঁরা জীবনমৃত্যু পণ

করেছিলেন। কিন্তু উমরের তা জানা ছিল না। কেননা, তাঁরা সে খবর তখনো পর্যন্ত গোপন রেখেছিলেন। উমর দ্রুত লক্ষ্য পরিবর্তন করে বোনের বাড়ির দিকে দ্রুত এগিয়ে চললেন। তাঁর সমস্ত অঙ্গে রক্ত যেন টগবগ করে ফুটতে লাগল।

বোনের গৃহে পৌঁছাতেই উমর গৃহমধ্য হতে মৃদুমধুর কণ্ঠের একটা সুরেলা আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন। তা দেখে তাঁরা খুব ঘাবড়ে গেলেন।

ভিতর থেকে আওয়াজ এলো ঃ 'কে ?'

উমর বললেন ঃ 'আমি উমর।'

উমরের আগমনের কথা জানতে পেরে তাঁরা সবাই খুবই আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা এখানে ওখানে লুকোতে লাগলেন।

উমরের বোনের নাম ছিল ফাতিমা ও ভগ্নীপতির নাম ছিল সঈদ। খাব্বাবের কাছ থেকে তাঁরা কুরআন পড়তেন। স্বয়ং মহানবী খাব্বাবকে এ কাজে নিয়োগ করেছিলেন। অবতীর্ণ আয়াত তিনি তাঁদের পড়িয়ে শোনাতেন আর তাঁরা তা শুনে মুখস্থ করে নিতেন। খাব্বাব সে সময় তাঁদের 'সূরা ত্বাহা' পড়ে শোনাচ্ছিলেন। উমরের কণ্ঠস্বর শুনেই তিনি ভিতরে লুকিয়ে পড়লেন। কুরআনের কয়েকটি পত্র পড়ে ছিল। ফাতিমা সেগুলোকে লুকিয়ে ফেললেন। সঈদ সাহস ভরে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন।

উমর ভয়ঙ্কর সিংহের মতো গর্জন করে ভিতরে ঢুকে আওয়াজ যেখান থেকে আসছিল সেদিকে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর বোন ফাতিমা ও ভগ্নীপতি সঈদ ছাড়া কাউকে খুঁজে পেলেন না। তিনি ধমক দিয়ে বললেন ঃ 'আওয়াজ কোথা থেকে আসছিল ? তা কীসের আওয়াজ ছিল ?'

সবাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। সত্যি কথা বলার মতো সাহস কারোই হল না। মিথ্যা করে বলা হল ঃ 'কই, এখানে তো কিছু নেই!'

উমর গর্জন করে বললেন ঃ 'গোপন করো না। তোমরা কী মনে করেছো তোমাদের ইসলাম গ্রহণের খবর আমি জানি না ?'

একথা বলে তাঁর ভগ্নীপতি সঈদকে সজোরে আঘাত করতে লাগলেন। ফাতিমা এ দৃশ্য দেখতে না পেরে তাঁর স্বামীকে বাঁচানোর চেষ্টা করতেই উমর তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বোন ফাতিমাকে মারতে লাগলেন। মারের চোটে ফাতিমার মাথা ফেটে গেল। ক্রোধান্ধ উমর ভয়ঙ্কর রকমের মারধর করলেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে ঈমানের আগুন নির্বাপিত হল না। তা আরো বহুগুণে বহ্নিশিখার ন্যায় জ্বলে উঠল। ফাতিমা ও সঈদ নির্ভীকভাবে উদাত্ত কণ্ঠে বললেন– 'হাঁ, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। ইসলামেই আমাদের জীবন আর ইসলামেই আমাদের মরণ। দুনিয়ার কোনো শক্তি এ বিশ্বাস থেকে আমাদের নিবৃত্ত করতে পারবে না। হাঁ,

আমরা মুসলমান। আমরা ইসলামের অমৃত সুধা পান করেছি। ইসলামের জন্য আমরা যে কোনো রকমের ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। তোমার যা ইচ্ছা তা-ই করো!!'

এতটা দুঃখকষ্ট ও আঘাতের পরেও তাদের এ দৃঢ় প্রত্যয়দীপ্ত জবাবে উমর স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাদের এ দৃঢ়কণ্ঠস্বর উমরের হৃদয়কে আঘাত করল। তিনি উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। তাঁর নিষ্ঠুর হাত চলতে চলতে থেমে গেল। বোন ফাতিমার মাথা ফেটে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছিল। এ বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখে উমরের হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তাঁর কৃতকর্মের জন্য নিজের প্রতি ধিক্কার উপস্থিত হল। লজ্জায় মুখ লুকাতে চাইলেন। হঠাৎ পবিত্র কুরআনের একটি ছিন্নপত্রের উপর তাঁর দৃষ্টি আটকে গেল, খাব্বাব ঐটি পড়ছিলেন।

'তোমরা দু'জনে এটাই পড়ছিলে ? দাও না আমি একটু দেখি!'– উমরের কণ্ঠস্বর খুবই নরম হয়ে এলো।

বোন ঃ 'আমার ভয় হচ্ছে। তুমি এটা নিলে আবার ফিরিয়ে দেবে তো ?'

উমর আশ্বাস দিলেন। সেইসাথে শপথ করলেন। বললেন ঃ 'আমি অবশ্যই ফিরিয়ে দেবো।'

ফাতিমা ছিন্নপত্রটি উমরের হাতে তুলে দিলেন। ফাতিমা আশা করলেন ইসলামের এ মহাসম্পদের মালিক হওয়ার গৌরব উমরও অর্জন করুন।

উমর এ পত্র হাতে নিয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তেই বিধর্মীদের মন্দকর্মের আয়োজন দেখে তাঁর হৃদয় কেঁপে উঠল। তাঁর মনোজগতের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেল। তিনি চীৎকার করে বলে উঠলেন ঃ 'কী অপূর্ব সুন্দর আর পবিত্র এ বাণী!'

খাব্বাব নিকটেই লুক্কায়িত থেকে এসব দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এবার তিনি বেরিয়ে এসে বড় খুশি ও আনন্দের সাথে বললেন– 'উমর! আল্লাহর রসূল বড় আক্ষেপ করে দোয়া করেছিলেন– 'হে প্রভু! হিশামের পুত্র আবুল হাকাম অথবা খাত্তাবের পুত্র উমরকে দিয়ে তুমি ইসলামের সাহায্য কর।' উমর! আল্লাহর কসম! তোমার দাবীতে কৃত এ আক্ষেপভরা দোয়া আল্লাহ শুনেছেন। উমর! তুমি প্রভুর সাথে একাত্ম হয়ে যাও, তাকে ত্যাগ করে আর কোথাও যেওনা।

উমর বললেন ঃ 'আচ্ছা খাব্বাব! তুমি আমাকে বলবে, মুহম্মদ কোথায় আছেন? আমি সেখানে যাবো। আমি মুসলমান হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ইসলামের জ্যোতিতে আমার হৃদয় জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। আমার মধ্যে সত্যের আলো প্রস্ফূটিত হয়ে উঠেছে। আমি এতদিন ভুলপথে পথহারার মতো ঘুরে বেড়িয়েছি। আমার এখন পূর্ণ বিশ্বাস জন্মেছে যে, বাস্তবিকই মুহম্মদ নবী। তিনি যে বাণী পেশ করছেন, বাস্তবিকই তা আল্লাহর বাণী।'

উমরের মুখ থেকে এ বাক্য শুনে খাব্বাবের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তিনি উমরকে মহানবীর অবস্থান জানিয়ে দিলেন। বললেন ঃ 'তিনি এখন সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী স্থানে আরকামের বাড়িতে অবস্থান করছেন।'

ফাতিমা ও সঙ্গীদের জীবনে এ-আনন্দময় মুহূর্তের কোন তুলনা ছিল না। ফাতিমার ভাই আর সঙ্গীদের প্রিয়তম আত্মীয় ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন!! উমর এসেছিলেন পৌত্তলিক অবস্থায়–মুহম্মদের রক্তপানের নেশায়–আর ফিরে যাচ্ছেন মহান প্রভুর বান্দা হয়ে মুহম্মদের রক্ষাকারী হয়ে! উমর দৌড়ে যাচ্ছেন মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে তাঁর পদতলে আশ্রয়ের উদ্দেশে— নিজেকে নিবেদনের জন্য।

উমর আরকামের বাড়ি পৌঁছে দেখলেন, ভিতর থেকে তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ। তিনি দরজায় খটখট করে আওয়াজ করলেন। ভিতর থেকে বেলালের কণ্ঠস্বর ভেসে এলোঃ 'কে ?'

জবাব এলো ঃ 'খাত্তাবের পুত্র উমর।'

সে সময়ে আল্লাহর রসূলের (সাঃ) কয়েকজন অতি প্রিয় ও বিশ্বস্ত সাহাবি ছাড়াও সঙ্গে ছিলেন হামজা, আবুবকর, বেলাল ও আলি।

বেলাল এসে মহানবী (সাঃ)-কে বললেন ঃ 'আল্লাহর রসূল! দরজার বাইরে খাত্তাবের পুত্র উমর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। তিনি ভিতরে আসতে চান। দরজা যদি খুলে দেয়া হয় তাহলে ভিতরে এসে অশান্তি করার আশঙ্কা আছে।'

মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ 'আসতে দাও। উদ্দেশ্য সৎ-ও তো হতে পারে।'

হামজা বললেন ঃ 'আর যদি উদ্দেশ্য হীন হয় তাহলে তার জবাব দেয়া শুধু আমার বাম হাতেরই কাজ।'

বেলাল দরজা খুলতে গেলেন। হামজাও গেলেন উমর হামলা করলে তার জবাব দেওয়ার জন্য।

দরজা খুলতেই উমর ভিতরে প্রবেশ করলেন। হামজা ও বিলাল তাঁর দুই হাত জাপটে ধরে রেখেছেন।

উমরকে দেখেই মহানবী (সাঃ) দোয়া করলেন ঃ 'হে আল্লাহ! উমরের মধ্যেকার সমস্ত সন্দেহ দূর করে দাও। তার হৃদয়ে তুমি ঈমানের আলো জ্বালিয়ে দাও।' তারপর বললেন ঃ 'হামজা! উমরের হাত ছেড়ে দাও। বেলাল, তুমিও ছেড়ে দাও।'

হামজা ও বেলাল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। উমর এগিয়ে গিয়ে মহানবীর (সাঃ) সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। মহানবী (সাঃ) তাঁকে বললেন ঃ 'উমর! বেদনাদায়ক কোনো আজাব আসমান থেকে না আসা পর্যন্ত কী তোমাদের পরিবর্তন হবে না ? বলো, কী চিন্তা করছ ?'

উমর অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জবাব দিলেন ঃ 'আমি ঈমান আনার জন্য এসেছি। এখন আমি মুসলমান। আপনার সেবক। আল্লাহর বান্দা। সত্য প্রচারের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আপনার সেবায় উপস্থিত হয়েছি।'

এ কথা বলার সাথে সাথেই মুসলমানরা খুশিতে ডগমগ করে উঠলেন। সম্মিলিত কণ্ঠের 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি সে গৃহের দেওয়াল ভেদ করে পাহাড় হতে পাহাড়ান্তরে, দিক হতে দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হল। সর্বত্রই এক তেজোদ্দীপ্ত আলো ছড়িয়ে পড়ল।

আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবর!! আল্লাহু আকবর!!! সমস্বরে নিনাদিত হল এ পবিত্র ধ্বনি। তা মূলত খুশি ও আনন্দেরই প্রকাশ। তাঁদের মন আজ বড়ই শান্ত, হৃদয় আজ বড়ই প্রশান্ত। তাঁদের প্রাণভরে এ আনন্দ প্রকাশের একটাই কারণ– মহানবীর (সাঃ) মহাশত্রু উমর আজ মুসলমানদেরই একজন। আজ মুসলমানদের শক্তি অনেক বেড়ে গিয়েছে। প্রিয়নবী এ জন্য আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন এবং উমরের বুকের উপর তাঁর পবিত্র হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন ঃ 'হে আল্লাহ! তুমি উমরকে সুমতি দান কর! হে প্রভু! তুমি তাকে ইসলামে সমাসীন রাখ।'

উমর মুসলমানদের দলে বসে গেলেন এবং তাঁদের সাথে আলাপ করতে লাগলেন। তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহর রসূল! আমরা কী সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নই? সত্যের জন্য কী আমাদের জীবন নিবেদিত নয়? এতেই জীবন, এতেই মৃত্যু?' মহানবী (সাঃ) উত্তর দিলেন ঃ 'কেন নয় ? সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন ও মরণ নিহিত। তুমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।'

উমর বললেন ঃ 'তাহলে আর গোপনীয়তা কেন ? আল্লাহর রসূল ?'

মহানবী (সাঃ) ঃ 'আমাদের সংখ্যা কম। শত্রুসংখ্যা অনেক বেশি।'

উমর বললেন ঃ 'আল্লাহর উপাসনা গোপনে করতে হবে, এটা অসহ্য। আল্লাহর কসম, তা হবে না। সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যনবী করে প্রেরণ করেছেন। যে লোকেদের মধ্যে থেকে আমি এতদিন বিধর্মী কার্যকলাপ চালিয়ে এসেছি, এখন সেখানে ইসলামের আওয়াজ তুলব।'

প্রিয়নবী (সাঃ) তাঁর সাথীদের দু দলে বিভক্ত করে দিয়ে এক দলকে উমরের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত করলেন, আর অন্য দলের নায়ক করে দিলেন হামজাকে।

বীর সেনানীদের দল কাবাগৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে জয়ধ্বনি দিয়ে দলবদ্ধভাবে নামায পড়লেন। আবার 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দেয়া হল। সে আওয়াজে মক্কার আকাশ-বাতাস, পাহাড়-পর্বত প্রকম্পিত হয়ে উঠল।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'– আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, মুহম্মদ আল্লাহর রসূল।

আজ ইসলামের সূর্য স্ব-বৈশিষ্টমণ্ডিত হয়ে উদিত হয়েছিল–আজ প্রথম বারের মতো ইসলাম স্বশক্তিতে প্রকাশমান হল।

এত বড় দুঃখ ও আঘাত কুরাইশরা আর কখনো পায়নি। মুসলমানরা আজ যতটা খুশি হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি খুশি হয়েছিলেন স্বয়ং উমর। কেননা, তিনিই আজ প্রথম অন্ধকার থেকে আলোয় এসেছিলেন আর তাঁরই প্রেরণায় ইসলাম আজ প্রকাশ্যে শক্তি প্রদর্শন করল।

হজরত উমর সারা রাত ধরে লোকেদের মধ্যে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রচার করলেন আর সেই সাথে জনসাধারণকে ইসলামে আহ্বান করলেন। যে বীরত্ব ও নির্ভীকতা একদা ইসলামের বিরুদ্ধে নিয়োজিত ছিল–সেই বীরত্ব ও সেই নির্ভীকতা আজ ইসলামের প্রচার-প্রসারে নিয়োজিত হল।

আবু জেহেল ছিল তাঁর মামা। তিনি তাঁর ওখানেও গেলেন। এ সেই আবু জেহেল ইসলামের নাম শুনলেই যে জ্বলে-পুড়ে মরত। উমর তার বাড়িতে গিয়ে দরজায় ঘা দিতেই সে বেরিয়ে এলো। খুবই স্নেহের সুরে বললঃ 'বলো কী উদ্দেশ্যে এসেছো ?' উমর উত্তরে বললেন ঃ 'এ কথাই বলতে এসেছি যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। মুহম্মদকে নবী বলে মেনে নিয়েছি এবং তাঁর প্রচারিত বাণী সত্য বলে বিশ্বাস করেছি।' এ কথা শুনে যেন আবু জেহেল বজ্রাহত হল। সে খুব জোরে দরজায় চাপড় মেরে কড়া ধমক দিয়ে বলল ঃ 'তুইও গোল্লায় গেছিস ? তুইও ধর্ম ত্যাগ করেছিস ? ধ্বংস হয়ে যা তুই।'

কুরাইশরা উমরের উপর জুলুম শুরু করল। তারা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। উমরও তাঁর তরবারির প্রত্যাঘাতে তাদের মোকাবিলা করলেন। তিনি বার বার সিংহের মতো গর্জন করে বলতে লাগলেন ঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই; মুহম্মদ তাঁর রসূল। এর বিরোধিতা করলে তার মুণ্ডু উড়িয়ে দেবো।' সে সময়ে প্রিয়নবী (সাঃ) তাঁকে 'ফারুক' উপাধিতে ভূষিত করলেন। যার অর্থ সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী।

এই হল নবুয়তের ষষ্ঠ বর্ষের ঘটনা। হজরত হামজার ইসলাম গ্রহণের মাত্র তিনদিন পরে হজরত উমর ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেন।

৪

দিনের পর দিন ধরে মুসলমানদের শক্তি-সামর্থ্য বেড়ে চলেছিল। লোকেরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিল। এমতাবস্থায় কি কুরাইশরা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে ? তাই তারা মুসলমানদের সর্বপ্রকারে আঘাত ও যন্ত্রণা দেয়ার সুযোগ খুঁজতে লাগল। যে কোনো মূল্যে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে মহানবী

(সাঃ) এর প্রতি কিভাবে বিমুখ করে দেয়া যায় তার ফিকির খুঁজতে লাগল। এ উদ্দেশ্যে তারা আবার এক বৈঠকে মিলিত হল। সবাই মিলে পরামর্শ করতে লাগল যে, এর বিহিত ব্যবস্থা কী করা যায় ? যাতে মুহম্মদের (সাঃ) অনুসারীদের উপর নিরাশার কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। তাঁর জন্য নিবেদিতপ্রাণ অনুসারীদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা যাতে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে ধূলায় মিশে যায় সে চক্রান্তে তারা লিপ্ত হয়ে পড়ল। তারা চিন্তা করতে লাগল, অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। সবশেষে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, মুহম্মদ (সাঃ) কে সর্বপ্রকারে বয়কট করতে হবে— সম্পূর্ণ বয়কট। মুহম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সাথীদের সাথে কোনো প্রকার সম্পর্ক রাখা হবে না। তাদের সাথে না বিয়ে-শাদী, না বেচাকেনা, না খাওয়া-দাওয়ার সামগ্রী লেনদেন— কিছুই না। তাদের সাথে কোনো রকমের লেনদেন করা যাবে না।

এ সিদ্ধান্তে সবাই একমত হল। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কতিপয় শর্তসাপেক্ষে একটি চুক্তিও সাক্ষরিত হল। তাতে কিছু মন্দ আকাঙ্ক্ষার কথাও ব্যক্ত করা হল। এ লিখিত চুক্তিপত্র কাবার দরজায় লটকিয়ে দেয়া হলো সতর্কতাস্বরূপ, যাতে সবাই এ চুক্তির প্রতি অনুগত থাকে এবং তাঁর সাথে কেউ কোনো রকমের সহযোগিতার হাত বাড়ানোর সাহস না রাখে।

এরপর কয়েকজন কুরাইশ গোত্রপতি মুত্তালিবের বংশের লোকেদের কাছে গেল এবং বলল ঃ 'এখন মাত্র দুটি পথ খোলা আছে। হয় মুহম্মদকে (সাঃ) আমাদের হাতে তুলে দাও আমরা তাঁকে হত্যা করি এবং তোমরাও স্বস্তিতে থাকো; এতে আমরা রক্তপণ বাবদ তোমাদের অনেক সম্পদও দেবো; রাজি থাকো তো ভালো নতুবা আমরা সম্মিলিতভাবে তোমাদের বয়কট করব। না আমরা তোমাদের কাছে কিছু বিক্রি করব, না কোনো লেনদেন তোমাদের সাথে করব। বলো, পরিণাম কী হবে ? ভেবে দেখো। তোমরা ধুকে ধুকে মারা যাবে। এখন বলো, তোমরা কী চাও ?'

মুত্তালিবের বংশের লোকেরা একথা কোনো দিন কল্পনাও করতে পারেননি যে, মুহম্মদ (সাঃ) কে তাঁরা নির্মমভাবে শত্রুদের হতে তুলে দেবেন, আর শত্রুরা তাঁকে হত্যা করে তাদের আশা পূরণ করবে। মুহম্মদ (সাঃ) ছিলেন তাঁদের নয়নের মণি, হৃদয়ের আলো। তিনি ছিলেন তাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয়পাত্র। নিজেদের প্রাণের বিনিময়েও তাঁরা তাঁকে রক্ষা করতে দৃঢ়সংকল্প। সেখানে কুরাইশদের এ হুমকির জবাব কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন– 'আমরা সমস্ত রকমের কষ্ট সইতে প্রস্তুত কিন্তু কখনোই মুহম্মদ (সাঃ)-কে ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই।'

কুরাইশরা বলল ঃ 'তাহলে ঠিক আছে। আজ থেকে আমরা তোমাদের চিরশত্রু আর তোমরা আমাদের চিরশত্রু হয়ে গেলে। আজ থেকে আমরা

তোমাদের সর্বপ্রকারে অবরোধ করে রাখবো।'

কুরাইশরা অবরোধ জারি করল। তাঁদের ক্ষুৎ-পিপাসায় মারার পরিকল্পনা সফল করার কাজে লেগে পড়ল। হাশিমের বংশের লোকেরা মুত্তালিবের বংশের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন বলে তাঁরা তাঁদের সাথে রয়ে গেলেন।। কেবল বাকি রইল আবু লাহাব। সে বরাবরই নিজের বংশের লোকদের সাথে বিরোধিতা করে কুরাইশদের সহযোগিতা করে এসেছে। এ বিপদের দিনে তাই সে বড়ই খুশি হয়েছে। তাছাড়া বয়কটের পরামর্শ সেই প্রথম দিয়েছিল এবং তাদের এ বলে উত্তেজিত করেছিল যে, মুহম্মদের (সাঃ) সাথে সকল প্রকারের লেনদেন বন্ধ করে দেয়া হোক।

এ ছিল নবুয়তের সপ্তম বর্ষের ঘটনা। মুহররম মাস। আবু তালিব তাঁর সমস্ত আত্মীয় স্বজনদের সাথে এক উপত্যকায় নজরবন্দী হয়ে গেলেন। এ উপত্যকা 'শেআবে আবু তালিব' নামে সুখ্যাত হয়ে গেল। এ সমস্ত লোকেরা দিনরাত সেখানে অবরুদ্ধ রইলেন। কারো সাথে কোনো সম্পর্ক ও লেনদেন রইল না। এ ছিল জেলের মতোই বন্দীদশা। কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠিত[১] বা নিষিদ্ধ মাসগুলোতে তাঁরা বাইরে আসতে পারতেন। কারণ এ মাসগুলোতে আরবদেশে সমস্ত রকমের মারামারি ও হানাহানি থেমে যেত। সমস্ত মানুষই স্বাধীন এবং সার্বভৌম হয়ে যেত।

এ মাসেই প্রিয়নবী মুহম্মদ (সাঃ) ও বাইরে আসতেন এবং সত্যধর্ম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করতেন।

এ সময়ে হাজীরা মক্কায় আসতেন। ব্যবসায়ীরা মক্কার নিকটেই বাজার বসাতেন এবং পণ্যসামগ্রী সাজিয়ে রাখতেন। প্রিয়নবী (সাঃ) তাঁদের কাছে যেতেন। তাঁদের ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতেন। বড়ই দরদ ও গভীর আন্তরিকতার সাথে তাদের বলতেন ঃ 'আল্লাহর ধর্ম গ্রহণ করো। তিনি তোমাদের প্রতি খুশি হবেন। তিনি তোমাদের প্রতি দয়াশীল হবেন এবং

তোমাদের উপর করুণা বর্ষণ করবেন। কিন্তু তোমরা যদি এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান কর এবং খোদাদ্রোহিতা ও অংশীবাদে লিপ্ত থাকো তাহলে তিনি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন এবং তোমাদের কঠিন শাস্তি দেবেন।'

হাবশায় আশ্রিত মুসলমানরা খবর পেলেন যে, খাত্তাবের পুত্র উমর ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এখন সর্বত্রই ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছে সেজন্য তাঁরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। মুসলমানরা এখন অবলীলাক্রমে কুরাইশদের কাছেও ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাতে লাগলেন। ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে তাদের সতর্ক করে দিতে লাগলেন। মক্কার সর্বত্রই এখন ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ল। কেবলমাত্র মক্কা নয়; বরং মক্কার বাইরেও ইসলামের বিজয়ডঙ্কা বেজে উঠেছে। একথা শুনে হাবশায় আশ্রিত মুসলমানরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন

এবং তাঁরা এতটা আবেগাপ্লুত হয়ে উঠলেন যে, তাঁরা হাবশা ছেড়ে পুনরায় মাতৃভূমি মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

মক্কার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছে তাঁরা জানতে পারলেন মুসলমানদের অবরোধ করে রাখা হয়েছে।

কুরাইশরা তাঁদের পাহারা দিচ্ছে। এমতাবস্থায় অনভিপ্রেত কোনো অশান্তির মুখোমুখি হতে হবে। সেজন্য তাঁরা মক্কায় না গিয়ে পুনরায় হাবশায় ফিরে গেলেন।

মহানবীর (সাঃ) সাথে কেবলমাত্র নিবেদিতপ্রাণ অনুচররাই রয়ে গেলেন। এক মাস নয়, দু'মাস নয়, ছয় মাস বা এক বছর নয়– একটানা তিন বছর যাবৎ অবরুদ্ধ হয়ে রইলেন। দিনের পর দিন ধরে তাঁরা কঠিন হতেও কঠিনতর পরিস্থিতির মোকাবিলা করে চললেন। কষ্টের সীমা ছাড়িয়ে গেল। এমতাবস্থায় মহানবী (সাঃ) নিজে এবং সেইসাথে তাঁর নিবেদিতপ্রাণ অনুচরদেরও হিজরত করার অনুমতি দিয়ে দিলেন। তাঁরা হাবশায় গিয়ে তারপর শান্তি পেলেন। অবশেষে মক্কায় কয়েকজন মাত্র মুসলসমান রয়ে গেলেন। কোন অবস্থাতেই তাঁরা মহানবী (সাঃ) সঙ্গ পরিত্যাগ করলেন না।

যে মুসলমানরা রয়ে গেলেন শত্রুরা তাঁদের পদে পদে লক্ষ্য রাখতে লাগল। এমন কি এক মুহূর্তও তাঁদের দৃষ্টির অগোচর হতে দিল না। এঁদের স্বাভিমান, শক্তি ও সাহসের কোনো তুলনা ছিল না। সমস্ত দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা ছিল একদিকে আর আব্দুল মুত্তালিবের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের ধৈর্য ও সাহসিকতা ছিল অন্যদিকে। ক্ষুধা ও পিপাসার চরম সংকটাপন্ন অবস্থাতেও তাঁরা মহানবীর প্রতি বিন্দুমাত্র ধৈর্য হারালেন না; বরং তাঁরা তাঁকে সর্বপ্রকার সেবা ও সুরক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ হয়ে দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন। চাচা আবু তালিবেরও ধৈর্য, স্নেহ ও ভালোবাসার অন্ত ছিল না। সার্বিকভাবে তাঁকে রক্ষার জন্য তিনি সদা-তৎপর থাকতেন। এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর তত্ত্বাবধানের ঘাটতির অবকাশ ছিল না। এমন কী তিনি যখন ঘুমাতেন তখনো তিনি তাঁকে কাছে নিয়ে ঘুমাতেন। কোনো ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটলে তিনি তার বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে তাঁর কোনো পুত্রকে রাত জেগে পাহারা দেয়ার কাজে নিয়োজিত রাখতেন।

কী দুঃসহ অবস্থা তাঁকে অতিক্রম করতে হচ্ছিল! চারিদিকে নাগিনীদের বিষাক্ত নিঃশ্বাস আর তাদের ছোবলের আশঙ্কা, অন্যদিকে আত্মীয়-স্বজনদের শত্রুতা, সাথে খাদ্য-পানীয় নেই। লোকজনদের সাথে লেনদেন নেই। এ যেন এক নিঃসঙ্গ মৃত্যু উপত্যকা! কী কঠিন পরিস্থিতি! গাছের পাতা খেয়ে বন্দীরা ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা করতে লাগলেন। হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস নামে এক বিখ্যাত সাহাবি ছিলেন। তিনি ঐ সময়ে মহানবী (সাঃ)-এর সাথে এ দুঃসহ অবস্থা অতিক্রম করেছিলেন। সে দুঃসহ অবস্থা প্রসঙ্গে তিনি বর্ণনা করেন–

'অবস্থা এমন হল যে, এক রাত্রের জন্য খালি একটি শুকনো চামড়াই অবশিষ্ট ছিল। আমি তা পানি দিয়ে ধুয়ে নিলাম। তারপর আগুনে ঝলসিয়ে পানিতে মাখিয়ে তাই দিয়ে আমরা ক্ষুধা নিবারণ করলাম।'

এ চরম দুরবস্থার মধ্যে আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের সাহায্য করলেন। দুঃখ-কষ্ট নিবারণের সুযোগ দিলেন। কিছু লোক তাঁদের এ দুরবস্থা দেখে মর্মাহত হয়ে পড়ল। মুসলমানদের এ দুঃখ-কষ্ট দেখে তারা প্রমাদ গুণল। তারা লুকিয়ে তাঁদের কাছে আসতে লাগল। পানাহারও পৌঁছে দিতে লাগল তাঁদের মধ্যে। এদের মধ্যে হিজামের পুত্র হুকাইমও ছিল। খাদিজা ছিলেন তাঁর ফুফু। সে তার ফুফু খাদিজাকে প্রয়োজনীয় পানাহারাদি দিয়ে যেতো। হজরত খাদিজা তা নিজে খেতেন এবং সঙ্গী-সাথীদের খাওয়াতেন। এরকমই উমরের পুত্র হিশামও মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তিনি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য-বস্ত্রাদি দিয়ে যেতেন। রাতের বেলায়ই তিনি মুসলমানদের কাছে আসতেন। উটগুলোকে বাইরে রেখে তাদের পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে ভিতরে পৌঁছে দিতেন। হিশাম বরাবর এমনই করতে লাগলেন। কিছু দিনের মধ্যে কুরাইশদের মধ্যে এ খবর ছড়িয়ে পড়ল। এবার তারা তাদের উপর আক্রমণ করতে লাগল কিন্তু তারা সহানুভূতি থেকে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হল না। হিশাম আরো একটি কাজ করল। সে আবু উমাইয়ার পুত্র জুহাইয়ের কাছে গেল। সে ছিল আতিকার পুত্র ও আবদুল মুত্তালিবের সাথে আত্মীয়তার সাথে সম্পর্কিত। হিশাম তাকে বললঃ 'জুহাইর! তুমি তো বেশ স্বস্তিতে আছো। ভালো-মন্দ খাবার খাচ্ছো, ভালো ভালো পোশাক পরছ আর তোমার মামা ওদিক দিনের পর দিন অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। সত্যি করে বলো তো, এতে কী তুমি খুশী ? আল্লাহর কসম, লোকেরা যদি আবুল হাকামের (আবু জেহেল) মামা হতো আর তুমি যদি এমন করার জন্য অনুরোধ করতে তাহলে কখনোই তারা তা করতে রাজি হত না।'

জুহাইর বলল ঃ 'আমি একা কী করতে পারি ? আল্লাহর কসম! আমাকে কেউ সহযোগিতা করলে আমি এ চুক্তি ভেঙে দিতাম।'

হিশাম বলল ঃ 'যদি সহযোগিতা পাও ?'

জুহাইর ঃ 'কে ?'

হিশাম ঃ 'আমি।'

জুহাইর ঃ 'আচ্ছা, আরো একটা লোকের সন্ধান করো, যদি পাওয়া যায় তাহলে বেশ ভালোই হবে।'

এ চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য এরা কোমর বেঁধে নেমে পড়ল। এ চুক্তি ছিল সমস্ত কুরাইশদের চুক্তি। এখন তারা তৃতীয় ব্যক্তির সন্ধানে নেমে পড়ল। আল্লাহ সাহায্য করলেন। কেবল একজন নয়– তিনজন বীর যুবকের সন্ধান পাওয়া গেল।

এরা কুরাইশকুলের তিনজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। এদের একজন আদীর পুত্র মুত্‌ইম, দ্বিতীয় জন হিশামের পুত্র আবুল বুখ্‌তারী ও তৃতীয় জন আসওয়াদের পুত্র জমআ।

সকাল হলে হিশাম, মুত্‌ইম, আবুল বখতারী ও জমআ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। কাবার নিকটবর্তী স্থানে কুরাইশরা বসে ছিল। এ চার ব্যক্তি তাদের কাছে গিয়ে বসল। তারপর জুহাইর গিয়ে পৌঁছাল। তারা প্রথমে কাবাঘর প্রদক্ষিণ করল এবং তাদের কাছে এসে বলল ঃ 'মক্কাবাসিগণ! আমরা তো প্রাণভরে মজা করে ভালো-মন্দ খাচ্ছি আর ওদিকে বনী হাশিম গোত্রের লোকেরা অর্ধাহারে অনাহারে তিলে তিলে শেষ হয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা না পারছেন কোনো রকমের লেনদেন করতে আর না পারছেন কোনো কিছু বেচাকেনা করতে। এটা কী উচিত-সঙ্গত হচ্ছে ? এটা কী মনষ্যত্ব ও মানবতার পরিপন্থী কাজ নয় ? আল্লাহর কসম! যতক্ষণ না এ চুক্তি ভেঙে ছিন্ন ভিন্ন করা হবে, ততক্ষণ আমরা আর চুপ করে বসে থাকব না।'

এ কথা শোনামাত্র আবু জেহেল তার স্বভাব-সুলভ চিরপরিচিত ভঙ্গীতে চীৎকার করে বলে উঠল ঃ 'তুই ভুল বলেছিস। তা কখনোই হবে না।'

সেইসাথে জুহাইয়ের সব সাথী সমস্বরে বলে উঠলঃ 'হাঁ, অবশ্যই ঠিক। এটাই হবে। অবশ্যই হবে। হবেই হবে।'

আবু জেহেল বুঝল যে, এ সব পূর্ব-পরিকল্পিত ব্যাপার। এর মধ্যে কথা বলে আর সুবিধা করা যাবে না। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে চুপ করে বসে পড়ল।

মুত্‌ইম চুক্তিপত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল, কিন্তু এর যে স্থানে 'হে আল্লাহ, তোমার পবিত্র নামে' লেখা ছিল, সেটা অক্ষত রাখল।

চুক্তিপত্র টুকরো টুকরো করে ফেলার পর প্রিয়নবী মুহম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীসাথীর উপত্যকা থেকে বেরিয়ে এলেন এবং নতুন উদ্যমে ইসলাম প্রচারের কাজে নেমে পড়লেন। এটা ছিল নবুয়ত প্রাপ্তির দশম বর্ষের ঘটনা।

৫

অবরোধ থেকে মুক্তি পাওয়া গেল ঠিকই কিন্তু দুর্যোগের ঘনঘটা এখানেই শেষ হয়ে গেল না। এরপরেও যেসব অত্যাচার তাঁদের উপর শুরু হল তা পূর্বের চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক এবং প্রাণঘাতী। এ ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই আবু তালিব বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ক্রমশঃ তাঁর অবস্থার অবনতি হতে লাগল। কুরাইশরা বুঝল আবু তালিব এখন মৃত্যুপথযাত্রী। তাঁর বাঁচার আশা খুবই ক্ষীণ। তারা এবার সিদ্ধান্ত নিল যে, মৃত্যুপথযাত্রী আবু তালিবের কাছে গিয়ে মুহম্মদের সাথে তাদের একটা ফয়সালা করার অনুরোধ জানাবে। কেননা,

তাঁর মৃত্যুর পরে মুহম্মদকে উৎপীড়ন করলে লোকে বলবে, আবু তালিবের মৃত্যুর পূর্বে এ সাহস কারো হয়নি; আবু তালিবের অবর্তমানে তারা এখন সিংহবিক্রম লাভ করেছে।

আবু তালিব মৃতুশয্যায় শায়িত। এখন শুধু শেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগ করার অপেক্ষা। এমতাবস্থায় কুরাইশরা তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হল এবং বলল ঃ 'আবু তালিব! আপনি আমাদের কাছে কতটা সম্মানের পাত্র তা আপনি ভালোই জানেন। এখন আমাদের অনুরোধ যে, আপনার ভাইপোর ব্যাপারে আমাদের প্রতি একটু ন্যায়বিচার করুন। আপনি তাঁকে বলে দিন, তিনি যেন আমাদের ধর্ম সম্পর্কে কিছু না বলেন; আমরাও তাঁর ধর্ম সম্পর্কে কিছুই বলব না।'

আবু তালিব মুহম্মদ (সাঃ)কে কাছে ডেকে কুরাইশদের বক্তব্য তাঁকে জানালেন।

এর জবাবে মুহম্মদ (সাঃ) বললেন ঃ 'আপনারা কেবল একটি মাত্র কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করুন। আমি এ ছাড়া আর কিছুই চাই না।'

কুরাইশ ঃ 'কী কথা ? একটি কেন, আমরা দশটি কথা বলতেও রাজি আছি।'

মুহম্মদ (সাঃ) ঃ 'আপনারা শুধু এতটুকুই বলুন– 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।' ব্যস, এ ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না।'

এ কথা বলতেই তারা সমস্বরে হইচই শুরু করে দিল এবং রাগে গরগর করতে লাগল। তারপর 'এ ব্যক্তি তোমাদের কোন কথাই রাখতে প্রস্তুত নয়। এখন তাঁর সাথে যা ইচ্ছা তাই করতে পারো। তোমাদের ভালো-মন্দ যা ইচ্ছা তা-ই কর' বলতে বলতে সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেল।

কুরাইশ গোত্রপতিরা চলে গেলে তিনি তাঁর চাচা আবু তালিবকে বললেন ঃ 'চাচাজি আমার আকুল অনুরোধ, আপনি সবার অলক্ষ্যে মুখে শুধু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'– এতটুকু উচ্চারণ করুন। তাহলে কিয়ামতের দিন যেন আমি আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য দিতে পারি।'

আবু তালিব ঃ 'আরবের লোকেরা প্রচার করবে আবু তালিব মৃত্যুভয়ে পূর্ব পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করেছে। যদি এ সন্দেহ আমার না হত তাহলে তোমার কথা আমি মেনে নিতাম। আমি পূর্বপুরুষের ধর্ম নিয়েই মরতে চাই।'

চাচা আবু তালিবের প্রতি মহানবীর গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল। তিনি তাঁর ইহকাল ও পরকাল উভয় কালের মঙ্গলের জন্য বড়ই চিন্তিত ছিলেন। আবু তালিব ইসলাম গ্রহণ না করে মৃত্যুবরণ করাতে তিনি খুবই ব্যথিত ও মর্মাহত হলেন। বুকে বড়ই আঘাত পেলেন এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। এ অবস্থাদৃষ্টে পবিত্র কুরআনের এ প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হল ঃ

'তুমি যাকে পছন্দ করো, তার সুমতি না-ও আসতে পারে; বরং আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন তাঁকে সুমতি দান করেন।' —কুরআন—কাসাস।

আবু তালিব চলে গেলেন। যিনি ছিলেন তাঁর সাহায্যকারীও নিরাপদ আশ্রয়। মুহম্মদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও সংবেদনশীলতার কোনো সীমা ছিল না। এখন তিনি কুরাইশদের পীড়ন-অত্যাচার সইবার জন্য একাই রয়ে গেলেন।

এ দুর্ঘটনার অল্প কয়েকদিন পরেই আর এক দুর্ঘটনা ঘটল। এ যেন তাঁর বুক ভেঙে দিয়ে গেল। তাঁর জীবনসঙ্গিনী বিবি খাদিজাও জীবনের পরপারে পাড়ি দিলেন। যিনি ছিলেন তাঁর সুখ-দুঃখের সাথী আর জীবনপথের প্রেরণাদাত্রী দায়িত্বশীল জীবনসাথী। স্নেহ, মায়া-মমতা আর ভালোবাসার প্রতিমূর্তি। বিবাহিত জীবনের প্রথম দিন থেকেই খাদিজা ছিলেন তাঁর অতি বিশ্বস্ত জীবনসঙ্গিনী, তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারিনী প্রথম এবং মহিমান্বিত নারী। স্বয়ং প্রভু সালাম পাঠিয়ে তাঁকে জান্নাত বাসের সুসংবাদ দান করলেন। এসব ছিল মহানবীর (সঃ) জন্য বড়ই মর্মবেদনাদায়ক ব্যাপার।

কিন্তু ইসলামের আলো মক্কার বাইরেও অপ্রতিহত গতিতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল আর ওদিকে পৌত্তলিকদের নিভু-নিভু বাতিগুলো অতি দ্রুত নিভে যেতে লাগল। পৌত্তলিকরা কল্পনাও করতে পারেনি যে, এভাবে তাদের দিন শেষ হয়ে আসতে পারে। এসব আল্লাহরই ইচ্ছা। বিধর্মীরা যতই চীৎকার চেঁচামেচি করুক না কেন।

'আল্লাহর ধর্ম ছড়িয়ে পড়তেই থাকবে। তা বিধর্মীরা চাক বা না চাক।' —কুরআন।

বিঃ দ্রঃ—নবুয়তের দশম বছরে আবু তালিবের মৃত্যু হয়। এ যুগটা ছিল মুসলমানদের জন্য বড়ই দুঃখ ও কষ্টের। খাদিজার ঐ বছরেই রমজান মাসে ৬৫ বছর বয়সে মৃত্যু হয়। হাজান নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। প্রিয়নবী (সাঃ) নিজে কবরে নেমে তাঁকে শুইয়ে দেন।

সপ্তম অধ্যায়

দুঃখদায়ক পরিস্থিতি

— দয়ার নবী জুলুম ও অত্যাচারের শিকার

— আয়েশা ও সওদার (রাঃ) প্রিয়নবীর সহধর্মিনীর মর্যাদা লাভ

— তায়েফ যাত্রা

— তায়েফবাসীদের লজ্জাজনক আচরণ

— পবিত্র নবীর (সাঃ) বেদনাদায়ক ফরিয়াদ

— জ্বিন সম্প্রদায়ের ইসলামের সংস্পর্শে আগমন

— কুরাইশদের চক্রান্ত

— মুতাইমের আশ্রয়ে— মর্ত্য থেকে স্বর্গ পর্যন্ত

— আবু জেহেলের উপহার

— মিরাজের প্রভাব

— আবু বকরের (রাঃ) 'সিদ্দিক' খিতাব লাভ

— এক নজরে মিরাজ ভ্রমণ।

সপ্তম অধ্যায়

দুঃখদায়ক পরিস্থিতি

১

বিধর্মীরা প্রাণপণ চেষ্টা চালাল যাতে মুহম্মদ (সাঃ) আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম প্রচার বন্ধ করে দেন এবং প্রত্যাদিষ্ট বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া হতে বিরত থাকেন; কিন্তু কোনো কার্যক্রমেই তারা সফল হল না। ইসলামের আলো নির্বাপিত করার সমস্ত প্রচেষ্টা নিরন্তর ব্যর্থ হতে লাগল। শত্রুদের জন্য এ ছিল বড়ই দুঃখদায়ক ব্যাপার। নিরন্তর ব্যর্থতায় তারা হয়রান হয়ে পড়ল। পরিণামে শুধু হতাশা আর হতাশা। এখন কী করা যায় ? তার মোকাবিলায় এখন কী চাল চালা যায় ? ....কিন্তু আফসোস......আবু তালিব পরলোকে যাত্রা করেছেন। যে আবু তালিব ছিলেন তাঁর নিশ্চিন্ত আশ্রয়দাতা, সহানুভূতিশীল ও সাহায্যকারী। ভয়ংকর ঝড়-তুফানে যিনি ছিলেন সিসার প্রাচীরের মতো; তাঁর সাথে জুড়েছিলেন সমগ্র গোত্রের মানুষ। সে সাথে বংশের অভিভাবকস্থানীয় সকল ব্যক্তিই ছিলেন বিশ্বস্ত আশ্রয়। শোকে-দুখে-সুখে সর্বাবস্থাতেই তাঁরা তাঁর পাশেই থাকতেন।

কুরাইশদের সুবর্ণ সুযোগ। পৌত্তলিকদের সব পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার উপযুক্ত সময়। এখন আর দয়া-দাক্ষিণ্যের কোন প্রশ্ন নেই। এখন শুধু জুলুম আর অত্যাচারই হবে তার উপযুক্ত জবাব। শত্রুরা তাঁকে দুঃখ-কষ্ট ও আঘাত দেয়ার নতুন চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে পড়ল। এ ব্যাপারে যে যত জুলুম করতে পারত সে ততটাই গর্ব অনুভব করত। একদিন তারা মহানবী (সাঃ) কে অত্যাচারের এক উপযুক্ত সুযোগ পেল। মহানবী (সাঃ) কাবা প্রাঙ্গনে নামায পড়ছিলেন। যেই তিনি সিজদায় গিয়েছেন দুষ্কৃতিরা তৎক্ষণাৎ মৃত ছাগলের পচাগলা নাড়িভুঁড়ি তাঁর ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দিল। এ অসহ্য ও ঘৃণ্য অপকর্ম কি মুখ বুঁজে সহ্য করা সম্ভব ? কিন্তু ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতিমূর্তি মুহম্মদ (সাঃ) কি তাদের গালিগালাজ করলেন ? তাদের এ ঘৃণ্য অপকর্মের জন্য তাদের বদদোয়া করলেন? না। তিনি শুধু এতটুকুই বললেন ঃ ‘হে মানাফের বংশধর। প্রতিবেশীর সাথে তোমাদের এ কী ধরনের আচরণ?’

এ রকমই তিনি একদিন কোথাও যাচ্ছিলেন। কয়েকজন বদমাইশ এসে তাঁর মাথায় মাটি ঢেলে দিল। এ অবস্থায় তিনি বাড়ি ফিরে এলেন। এ দৃশ্য দেখে কলিজার টুকরো কন্যা ফাতিমা দৌড়ে গিয়ে পানি এনে তাঁর মাথা ধুয়ে দিতে লাগলেন। তাঁর পিতার প্রতি এ হেন নিষ্ঠুর আচরণে ফাতিমার কোমল প্রাণ ডুকরে কেঁদে উঠল। তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা নামতে লাগল। ফাতিমা

কাঁদতে লাগলেন। তা দেখে মহানবী তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন ঃ 'কেঁদো না মা। আল্লাহ তোমার পিতাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন।'

আবু তালিবের মৃত্যুর পর আবু লাহাব কিছুদিন নীরব থাকার পর পুনরায় তার পূর্বের স্বভাব প্রকৃতি অনুযায়ী তাঁকে নির্মমভাবে কষ্ট দিতে লাগল। তার ও তার স্ত্রীর এ ঘৃণ্য অপকর্ম এক সময় সীমা ছাড়িয়ে গেল।

বাকি থাকল আবু জেহেল। সেও কম গেল না। দিন রাত তাঁর পিছনে লেগে থাকল। এমন কি তাঁর পিছনে গুণ্ডাও লেলিয়ে দিতে লাগল। কখনো বা লম্পটদের ইশারা করত। আর তারা বদমাইশির চূড়ান্ত করত। কখনো বা বদচরিত্রের মহিলাদের দিয়েও সে তাঁকে বেইজ্জতি করার চেষ্টা করত। যখন তিনি নামায পড়তে আসতেন তখন সে দলবল নিয়ে তাঁকে হত্যা করারও পরিকল্পনা করত। হজরত আবুবকর তাদের প্রতিরোধ করতেন। তাদের এ নোংরা আচরণের প্রতি ক্ষোভ ও ধিক্কার জানাতেন এবং বড়ই বেদনাভারাক্রান্ত চিত্তে বলতেন ঃ 'তোমরা কি শুধু তাকে এ কারণেই হত্যা করতে চাও যে, তিনি বলেছেন আমার প্রভু আল্লাহ! এবং তিনি স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকে প্রকাশ্য প্রমাণ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন ?'

একথা বলার পর তারা আবুবকরের উপরও জুলুম শুরু করল। চারিদিক থেকে এসে তাঁকে আঘাত করল। তাদের অত্যাচার থেকে আবুবকরও রেহাই পেলেন না। কিন্তু এ অত্যাচারীদের পরোয়া করতেন না আবুবকর। কারণ, তিনি মহানবীর একজন নিবেদিতপ্রাণ ভক্ত ও বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। নিজের প্রাণের চেয়েও তিনি রসূল মুহম্মদকে ভালোবাসতেন। নিজের প্রাণপ্রিয় বন্ধু ও ইহ-পরকালের নেতার জন্য এ জুলুম ছিল তাঁর আত্মার কাছে পরম সুখ ও শান্তিদায়ক।

এ দুঃসহ অবস্থার পরেও মহানবী বড়ই দুঃখ ও বেদনার সাথে বলতেন ঃ 'আল্লাহর কসম! আবু তালিবের জীবদ্দশায় কুরাইশরা এতটা কষ্ট আমাকে আর কখনো দেয়নি।'

২

আল্লাহর রসূলের উপর কুরাইশদের জুলুম-অত্যাচার দিনের পর দিন বেড়ে চলল; বরং এভাবে বলা যায় যে, মহানবী (সাঃ) পৌত্তলিকদের সমস্ত রকমের বদমাইশির একটা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলেন। তাদের রসনার বিষাক্ত তীরের ফলা সদা-সর্বদাই তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল। এসব দেখে শুনে তিনি বড়ই বিষণ্ন হয়ে পড়লেন। এদিকে মানসিকভাবে দুটি ব্যাপারে তিনি আরো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। চাচা আবু তালিব ও পত্নী খাদিজার মৃত্যুতে তিনি খুবই শোকাহত হয়ে পড়েছিলেন। অন্তরে তিনি বিরাট এক শূন্যতা অনুভবও

করছিলেন। একদিকে পৌত্তলিকদের নির্মম অত্যাচার অন্যদিকে পৌত্তলিকদের জুলুম-অত্যাচার। অধিকাংশ মুসলমান চলে গিয়েছিলেন হাবশায়। মক্কায় রয়ে গেলেন হাতে গোনা কয়েকজনমাত্র অনুচর। এমতাবস্থায় তাদের মোকাবিলা করে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা খুব কঠিন হয়ে পড়েছিল। সামর্থ্যের বিচারে বলা যায়, মুসলমানদের শক্তি তখন সিন্ধুর কাছে বিন্দুর সমান। কীভাবে তাদের মোকাবিলা করা সম্ভব–একথা ভেবে তিনি অনেকটা বিষণ্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর চেহারায় চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। অত্যাচারের এ ঝড়-তুফানের মধ্যে নিজেদের রক্ষার জন্য তাই আল্লাহর ভরসায় ধৈর্যধরে তিনি দিন গুজারা করতে লাগলেন।

মুসলমান মহিলারাও তাঁর এ অবস্থা দেখে অন্তরে বড়ই বেদনা অনুভব করতে লাগলেন। একদিন হজরত খাওলা তাঁর সেবায় উপস্থিত হলেন। ইনি ছিলেন হুকাইমের কন্যা ও উসমান বিন মাজউনের স্ত্রী। তিনি মহানবীকে বললেন ঃ 'আপনি বিয়ে করছেন না কেন ? এতে সন্দেহ নেই যে, খাদিজার মতো কেউ নেই তবুও তো কিছুটা শান্তি পাবেন। মনের ভারও কিছুটা লাঘব হবে।'

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ 'তুমি কার প্রতি ইঙ্গিত করছ হুকাইম কন্যা ?'

খাওলা (রাঃ) ঃ 'কুমারী বা বিধবা যেমনটি চান ?'

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ 'কুমারী কে ?'

খাওলা (রাঃ) ঃ 'আবুবকরের কন্যাই আপনার সবচেয়ে বড় হকদার।'

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ 'আর বিধবা কে ?'

খাওলা ঃ 'জামআর কন্যা সওদা। সে আপনাকে নবী বলে মেনে নিয়েছে এবং ঈমান এনেছে। হাবশায় হিজরতকারীদের মধ্যে তার স্বামীও ছিল। সেখান থেকে ফেরার পর সে মারা গেছে।'

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ 'আচ্ছা যাও। দু'জনের জন্যই কথাবার্তা বলো।'

খাওলা প্রথমে সওদার কাছে গেলেন। বললেন ঃ

'তোমার সৌভাগ্যের কথা আর কী বলব ? তুমি জানো, তোমার উপরে কতটা বরকত ছায়া হয়ে বিরাজ করছে ?'

সওদা বিস্মিত হলেন। গভীর প্রশান্তির সাথে বললেন ঃ 'আপনি কী বলতে চাচ্ছেন ? আপনার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

খাওলা ঃ 'আল্লাহর রসূল তোমাকে বিয়ে করতে চান।'

সওদার চেহারা খুশিতে চমকিত হয়ে উঠল। বললেন ঃ 'অভিনন্দন। একটু আসুন। আমার আব্বার সাথেও কথা বলুন। দেখুন কী বলেন ?'

খাওলা সওদার পিতার কাছে গিয়ে প্রস্তাব রাখলেন। একথা শোনামাত্রই তাঁর চেহারায় খুশির ঝলক বয়ে গেল। সহসা তাঁর মুখ দিয়ে বের হল– 'দুজনের কী মত ?'

পরে খাওলা উম্মে রুমানের কাছে গেলেন। তিনি ছিলেন হজরত আবুবকরের স্ত্রী এবং আয়েশার জননী। খাওলা বললেন ঃ 'কী সৌভাগ্য! আপনাদের উপর রহমতের বর্ষণ শুরু হয়েছে। আল্লাহর রসূল আয়েশাকে বিয়ে করতে চেয়েছেন!'

রুমান বললেন ঃ 'আহা, কী সৌভাগ্য আমাদের। কী সুন্দর প্রস্তাব। একটু অপেক্ষা করো। কন্যার পিতাকে একটু আসতে দাও!'

দেখতে দেখতে আবুবকর এসে পড়লেন।

অবশেষে, আয়েশা ও সওদার সাথে মহানবীর বিয়ে হয়ে গেল। এভাবে দুটি বংশের সাথে তাঁর মজবুত আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে উঠল। বিয়ের পরে সওদা মহানবীর গৃহে এসে গেলেন। আয়েশা এলেন কিছুকাল পরে।

৩

সত্যধর্ম বিরোধীরা মহানবী ও তাঁর অনুসারীদের উপর অত্যাচারের পাহাড় চাপিয়ে দিল। আবু তালিবের মৃত্যুর পর কুরাইশরা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, মুহম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা যতদিন পর্যন্ত না ইসলাম ত্যাগ করে পূর্বপুরুষদের ধর্মে ফিরে আসবে ততদিন পর্যন্ত তাঁদের উপর জুলুম-অত্যাচারের তুফান বইয়ে দেয়া হবে। হজরত মুহম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের জীবন দুর্বিসহ করে তোলা হবে। এ ছিল নবুয়তের দশম বর্ষের কথা। জমাদিউল উখরা বা শাওয়াল মাস চলছিল। কুরাইশদের জুলুম-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মহানবী মুহম্মদ (সাঃ) তায়েফে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এ সময়টা ছিল তাঁর জীবনের বড় দুঃখজনক ও দুর্বিষহ একটা সময়। তাঁর ব্যথিত হৃদয়ের সে অনুভূতির কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

সবার অজান্তে তিনি তায়েফে চলে গেলেন। তাঁর আশা ছিল সেখানে গেলে সেখানকার মানুষদের কাছ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা পেতে পারেন এবং কিছুটা স্বস্তিও পেতে পারবেন।

তায়েফ তাঁর জন্য মোটেই স্বস্তি ও শান্তিদায়ক হল না। তায়েফবাসীরা তাঁকে সাহায্য করা তো দূরের কথা তারা সেখানে তাকে থাকতে দেয়াটাই পছন্দ করল না। তারা তাঁর সত্যবাণীকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করল এবং তাঁকে নবী বলে মানতে নির্লজ্জের মতো অস্বীকার করল। কারণ, তারা ছিল কুরাইশদের মতো অন্ধ ও স্বার্থপর। কায়েমী স্বার্থের প্রতিভু হয়েই বাতিল বা মিথ্যাকে তারা অন্ধের মতো আঁকড়ে ধরে রইল। তায়েফের আবহাওয়া ছিল খুব সুন্দর। ফুল, ফসল ও সবুজে ভরা ছিল সেখানকার মাঠ, ঘাট ও প্রান্তর। আঙুর ও অন্যান্য সুস্বাদু ফলের বাগ-বাগিচায় পূর্ণ ছিল সে উপত্যকা। সেজন্য কুরাইশকুলের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা গরমের সময় সেখানে প্রমোদ-ভ্রমণে যেতো; দিন অতিবাহিত করত। আরবের বিখ্যাত 'লাত' দেবতার মূর্তিও সেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাবা গৃহের মতোই

তারা সেই দেবতাকে পরিক্রমা করত। সুন্দর প্রাকৃতিক বাতাবরণ ও 'লাত' দেবতার কারণে তায়েফ একটা তীর্থ কেন্দ্রেও পরিণত হয়েছিল। তায়েফবাসীরা আশঙ্কা করল যে, তারা মহানবীকে আশ্রয় দিলে মক্কার কুরাইশরা তাদের সাথে শত্রুতা করবে এবং মক্কাবাসীদের কাছে তারা তাদের গ্রহণযোগ্যতা হারাবে।

তায়েফবাসীরা তাঁর সাথে কী আচরণ করেছে তা তিনি গোপন করতে চাচ্ছিলেন; কেননা, তাঁর ভয় ছিল তা যদি তারা জানতে পারে তাহলে তারা তাঁকে ঠাট্টা-মস্করা করবে এবং আগের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে তাঁকে যন্ত্রণা দেবে।

মহানবী তায়েফ ত্যাগ করার পূর্বে তায়েফের প্রভাবশালী ছকীফ গোত্রের এক প্রধান নেতাকে অনুরোধ করলেন– 'তোমরা তো আমার কথা মানলে না। কিন্তু পারতপক্ষে এ ব্যাপারটা কুরাইশদের কাছে গোপন রেখো।'

কিন্তু এ কথা তো সে মানলই না উল্টো তায়েফের গুণ্ডা-বদমাইশদের তাঁর পিছনে লেলিয়ে দিল। এ দুশ্চরিত্র ও জঘন্য বদমাইশেরা পাথর ছুড়ে তাঁর পায়ে এমন আঘাত করল যে, তাঁর জুতো দুটো রক্তে ভরে গেল। অনবরত পাথর বর্ষণের ফলে কাবু হয়ে তিনি বসে পড়লেন কিন্তু তবুও অত্যাচারীদের মনে কোনো দয়া-মায়া ও সহানুভূতি জাগল না। তারা তাঁর হাত ধরে খাড়া করে দিল। আবার পথ চলতেই আবার পাথর বর্ষণ শুরু করল। সেই সাথে বদমাইশেরা তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে লাগল। সেই সাথে দিতে লাগল হাততালি। আফসোস! মানব সমাজের জন্য এর চেয়ে জঘন্যতম দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে!! কী মর্মান্তিক দৃশ্য ছিল এ!!

তিনি ছিলেন ধৈর্য ও করুণার প্রতিমূর্তি। যে দৃষ্টান্ত জগতে কোনোকালেও ছিল না, আজো নেই, ভবিষ্যতেও হবে না। এরা কত বড় মূর্খ ও হতভাগ্য যে, মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম অভিভাবককে এভাবে আঘাত দিয়ে মজা পেতে লাগল।

হে মুহম্মদ! নবুয়তের মহান দায়িত্ব কাঁধে নেয়ার পর যত জুলুম ও অত্যাচার আপনার উপরে হয়েছে, তার বদলায় স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ আপনার হয়ে গেছেন!

পথ চলতে চলতে তিনি এক লোকালয়ের নিকটবর্তী স্থানে এসে গিয়েছেন। সেখানে ছিল বিরাট বড় একটা বাগান। সেখানে ছিল অসংখ্য ফলবতী আঙুর লতা। সর্বত্রই থোকা থোকা পাকা আঙুর ঝুলছিল। তিনি সে বাগানে গিয়ে পৌঁছালেন যাতে পিছু লাগা শয়তানদের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

তারপর তিনি আকাশের পানে তাকালেন এবং তিনি অনুভব করলেন তাঁর সামনে মহাকাশ যেন তার স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়েছে। তিনি বড়ই আবেগাপ্লুত হয়ে উঠলেন এবং তিনি খোদাতা'লার উদ্দেশে দু'হাত তুলে আকুল কণ্ঠে ফরিয়াদ করতে লাগলেন ঃ

"প্রভু! অজ্ঞ, অশিক্ষিত, অবুঝ এ হতভাগ্যদের জন্য তোমার কাছে দু'হাত তুলে প্রার্থনা করছি।

'মহাপ্রভু! তুমি দীনদরিদ্র হতভাগ্যদের একান্ত সহায়। তুমি তো আমারও দয়াময় প্রভু!

তুমি আমাকে কাদের দায়িত্বে অর্পণ করেছো ? যারা আমাকে দেখে অত্যাচার শুরু করেছে; এমন দুশমনদের তুমি আমার উপর যদৃচ্ছা অধিকার দিয়েছো।

'হে প্রভু! তুমি যদি আমার উপর অসন্তুষ্ট না হও তাহলে আমি কাউকে কোনো পারোয়া করি না। আর যদি তোমার পক্ষ থেকে সাহায্য পাই তাহলে তার জন্য আমি প্রাণপাত করতে রাজি আছি।

আমি তোমার সেই সত্তার আশ্রয় প্রার্থনা করে বলছি, যা অন্ধকার বিদূরিত করে আলোর প্রকাশ ঘটায়, আর যে সত্তা ইহ-পরলোক–সর্বলোকেই প্রকাশমান।

আমি তোমার সেই সত্তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, যা তোমাকে ক্ষুব্ধ করে, বা আমার উপর নারাজ হয়।

যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমার উপর খুশি হবে ততক্ষণ আমি তোমাকে খুশি করার চেষ্টায় রত থাকব। আমার সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে তোমাকে খুশি করা থেকে আমি বিরত হব না।"

যে বাগানটিতে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তা ছিল দুজন সৎ ভাইয়ের। এদের একজনের নাম ছিল উৎবা ও অন্যজনের নাম ছিল শওবা। এরা ছিল রবীআ'র পুত্র। পুরো ঘটনাই দু'ভাই খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেছিল। তারা স্বচক্ষে দেখেছিল যে, তিনি (সাঃ) রক্তে একেবারেই ভিজে গিয়েছিলেন এবং গুণ্ডারা তাঁকে পাথর ছুড়ে আহত করেছিল এবং তিনি আহত অবস্থায় টলতে টলতে এ বাগানে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। দু' ভাই-ই খুব ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তাঁর প্রতি এ অত্যাচার দেখে তারা খুবই আবেগপ্রবণ, ও সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ল। অনতিবিলম্বে তারা তাদের খ্রিস্টান চাকরকে ডাক দিল– 'আদ্দাস! তাড়াতাড়ি গাছ থেকে আঙুর পেড়ে একটি পাত্রে করে নিয়ে এসে এ আহত ব্যক্তিকে খেতে দাও।' আদ্দাস শোনামাত্রই আদেশ পালন করল। সে পাত্রভর্তি আঙুর এনে তাঁর সামনে রেখে বলল– 'এগুলো খেয়ে নিন।' মহানবী (সাঃ) 'বিসমিল্লাহ' (আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি) বলে হাত লাগিয়ে আঙুর খেতে লাগলেন। আদ্দাস বিস্মিত হয়ে গেল। আদ্দাস বিস্ময়ের সুরে বলল ঃ 'আল্লাহর কসম! এরকম কথা কারো মুখে তো শুনিনি!'

প্রিয়নবী (সাঃ) বললেন ঃ 'তোমার দেশ কোথায় ? তুমি কোন ধর্মাবলম্বী ? তোমার নাম কী ?'

আদ্দাস বলল ঃ 'আমার নাম আদ্দাস। আমি খ্রিস্টধর্মাবলম্বী।'

মহানবী (সাঃ) ঃ 'ইউনুস বিন মাত্তার দেশে থাকো ? তিনি তো সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন।'

এ কথা শুনে আদ্দাস আরো বিস্মিত হল। বলল ঃ 'ইউনুস বিন মাত্তার খবর আপনি কী করে জানেন ?'

মহানবী বললেন ঃ 'ইউনুস আমার ভাই তিনিও নবী ছিলেন; আমিও নবী।'

একথা শুনে আদ্দাস আরো বিস্ময়াভিভূত হল। সাথে সাথে ঝুঁকে পড়ে সে মহানবীর হাত, পা, ও কপাল চুম্বন করল।

উৎবা ও শওবা সমস্ত ব্যাপারটাই লক্ষ্য করছিল। তারা এর পরবর্তী ঘটনা দেখার জন্য খুবই উদ্বেগের সাথে অপেক্ষা করতে লাগল। আদ্দাস ফিরে গেলে তারা বলল ঃ ' আরে আদ্দাস! তুমি যাঁর হাতে পায়ে চুম্বন দিচ্ছিলে উনি কে ?'

আদ্দাস বলল ঃ 'মালিক! এ পৃথিবীতে তাঁর চেয়ে ভালো লোক আর কেউ নেই। ইনি যে কথা বলেছেন, সে কথা নবীরা ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না।'

উৎবা ও শওবা বলল ঃ 'আরে আদ্দাস! তাঁর কথা শুনে তোমার ধর্ম কখনোই ত্যাগ করো না। তোমার ধর্ম এঁর ধর্মের চেয়ে অনেক ভালো।'

প্রিয়নবী (সাঃ) ছকীফ গোত্রের কাছ থেকে একেবারে নিরাশ হয়ে গেলেন। বুঝলেন যে, তাদের সহযোগিতার আশা দুরাশা মাত্র। তিনি তায়েফ ত্যাগ করে এগিয়ে চললেন। সামনেই পড়ল মরুভূমি। তিনি মক্কা অভিমুখে খুব দ্রুতপদক্ষেপে এগিয়ে চললেন। সেই মক্কা, যে স্থান ত্যাগ করে তিনি তায়েফে এসেছিলেন, ভেবেছিলেন, তাদের সাহয্য-সহযোগিতাও পাওয়া যাবে, একটু শান্তিতেও দিন গুজারা করা যাবে; কিন্তু সেখানে নিরাশ হয়ে আবার ফিরে চললেন মক্কায়। তায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম নাখলা। চলতে চলতে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে সেখানেই বিশ্রামের জন্য অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিলেন। দেখতে দেখতে রাত হয়ে গেল। রাত গভীর হলে তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অত্যন্ত মর্মস্পর্শী কণ্ঠে পবিত্র কুরআন পাঠ করতে লাগলেন। জ্বিনদের একটা দল সে সময় সে স্থান অতিক্রম করছিল। পবিত্র কুরআন পাঠের আওয়াজ তাদের কানে পৌঁছাতেই তারা যাত্রা বিরতি করল। এ আওয়াজ তাদের কাছে আশ্চর্যজনক মনে হল। তারা খুব মনোযোগ সহকারে কুরআন শুনতে লাগল। তাদের উপর আল্লাহর করুণা হল। তারা সুমতিপ্রাপ্ত হল। তারা গিয়ে তাদের সম্প্রদায়কে বলল ঃ

"আমরা এক মনমনোহর কুরআন শ্রবণ করেছি। তাতে সঠিক পথের সন্ধান রয়েছে। এসো, আমরা তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করি। আমরা আর কখনো আমাদের প্রভুর সাথে কাউকে অংশীদার বলে মানব না।" –কুরআন।

নামাযের মধ্যে মহানবী তন্ময় হয়ে কুরআন পাঠে মগ্ন ছিলেন। জ্বিনদের বিরাট একটা দল ঐ স্থান অতিক্রম করার সময় এ হৃদয়-মন-প্রাণ উতলা করা মহাবাণী শুনতে পেয়েই থমকে যায় এবং গভীর মনোযোগ সহকারে তা শুনতে শুনতে আত্মমগ্ন হয়ে ওঠে আর সেইসাথে তারা প্রভাবিত হতে থাকে। তারপর তারা ঈমান আনল এবং নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে ঈমান আনার আহ্বান জানাল এবং তাদের হুশিয়ার করে দিল। মহানবী এ সবের কিছুই জানতে পারেননি। এমন সময় আল্লাহর তরফ থেকে পবিত্র কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

'এবং স্মরণ করো সে সময়ের কথা যে সময় আমি জ্বীনদের তোমার দিকে চালিত করি যাতে তারা পবিত্র কুরআন শ্রবণ করে। তারা যখন তোমার কাছে পৌঁছায় তখন তারা বলে নিঃশব্দে তাঁর কণ্ঠস্বর মনোযোগ দিয়ে শোনো। তারপর যখন কুরআন পড়া শেষ হলো তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি সতর্ককারী হিসেবে প্রত্যাবর্তন করল।' –কুরআন।

তায়েফের সমস্ত ঘটনা কুরাইশরা জেনে ফেলেছিল। তারা জানতে পারল যে, মহানবী সেখানে দুঃখজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। ছকীফের দুশ্চরিত্র গুণ্ডারা তাঁর উপরে চরম অত্যাচার করেছে। এ জন্য তারা খুব খুশি হল আর সাথে সাথে বেশ উপহাস করল। তারা একত্র হয়ে শপথ করে সিদ্ধান্ত নিল ঃ 'মুহম্মদ যদি মক্কায় ফিরে আসে তাহলে আমরা তাঁকে শুধু মারব তাই নয়; তাকে শান্তিতে বসতেও দেবো না।'

তারা মনে করেছিল যে, মুহম্মদ যেখানে তায়েফেও ব্যর্থ হয়েছে সেখানে তার সমস্ত উৎসাহে ভাটা পড়ে যাবে আর ধর্মপ্রচারের সাধও চিরতরে মিটে যাবে। এভাবেই তিনি আপনা-আপনিই কাবু হয়ে যাবেন আর সে অবস্থায় তাঁকে নির্মূল করাটা তখন শুধু হবে সময়ের ব্যাপার মাত্র।

কুরাইশদের এ চক্রান্তের ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ মহানবী নাখলা থেকে মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। হেরা নামক স্থানে পৌঁছাতেই কুরাইশদের কিছু লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তাদের কাছ থেকে তিনি কুরাইশদের সমস্ত চক্রান্তের কথা জানতে পারলেন। তাদের পরিকল্পনা কী কী ? তিনি সে লোকদের মধ্যেকার একজনকে বললেন ঃ 'তোমরা কী আমার একটা সংবাদ পৌঁছে দিতে পারো ?'

তারা বলল ঃ 'খুব পারব।'

মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ 'শুরাইকের পুত্র আখনাসকে গিয়ে বলো যে, মুহম্মদ জানতে চেয়েছেন, আপনারা যদি নিরাপত্তা দেন তাহলে তিনি প্রভুর বাণী পৌঁছে দিতে পারেন।'

তারা আখনাসের কাছে গিয়ে মহানবী (সাঃ) এর খবর শোনালেন। এর জবাবে আখনাস বলল ঃ 'আমি তো কুরাইশদের সাথে সপ্রতিজ্ঞ। তাদের সাথে আমার সহযোগিতা চুক্তি রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে আমি কীভাবে তাঁকে নিরাপত্তা দিতে পারি ?'

তারা মহানবীর কাছে ফিরে এলো। তখনো তিনি হেরা উপত্যকায় অবস্থান করছিলেন। তারা আখনাসের সমস্ত কথা তাঁকে জানিয়ে দিল।

মহানবী (সাঃ) ঃ 'তোমরা আর একটু কষ্ট করতে রাজি আছো ?'

তারা বললঃ 'হাঁ।'

মহানবী (সাঃ) ঃ 'তোমরা আমরের পুত্র সুহাইলের কাছে যাও। তাকে গিয়ে বল যে, তিনি যদি মুহম্মদকে আশ্রয় দিতে রাজি থাকেন তাহলে তিনি আল্লাহর নির্দেশ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন।'

তারা এ সংবাদ নিয়ে সুহাইলের কাছে গেলে সে জবাব দিল ঃ 'আমীর বিন লুইয়ের গোত্র আলে কাবের বিরুদ্ধে কোন প্রশ্রয় দিতে পারে না।'

তারা ফিরে আবার হেরায় মহানবীর (সাঃ) কাছে এলো। সুহাইল যা বলেছিল, হুবহু তাই তাঁকে জানিয়ে দিল। মহানবী বললেনঃ 'তোমরা আর একটু কষ্ট করবে?'

তারা বলল ঃ 'হাঁ, অবশ্যই যাবো।'

মহানবী (সাঃ) ঃ 'এবার তোমরা আদীর পুত্র মুত্ইমের কাছে যাও। তাঁর কাছে একই কথা বলো।'

তারা মুত্ইমের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলঃ 'আপনি মুহম্মদকে নিরাপত্তা দিতে রাজি আছেন ?'

মুত্ইম বলল ঃ 'হাঁ, অবশ্যই দেবো। আনন্দের সাথে দেবো। তাঁকে নিশ্চিন্তে আসতে বলো।'

সকাল হতেই মুত্ইম[১] নিজেই প্রস্তুত হলেন। নিজের ছেলেদের সাথে তাঁর ভাইপোদেরও প্রস্তুত করিয়ে নিলেন যাতে মক্কায় প্রবেশ করলে মুহম্মদের বিরুদ্ধে কেউ বাড়াবাড়ি করলে তার যথাযথ জবাব দিতে পারে। সবাই যুদ্ধের পোষাক পরে নিলেন। কোমরে তরবারি ঝুলিয়ে নিলেন আর হাতে তুলে নিলেন ধারালো বল্লম। তারপর তাঁরা সদলবলে কাবা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। সে সময়ে কয়েকজন কুরাইশও কাবা প্রাঙ্গনে উপস্থিত ছিল। সে দলে আবু জেহেলও ছিল। তাঁদের দেখেই আবু জেহেল বলল– 'নিরাপত্তা দিয়ে কী ঈমান এনেছো ?'

---

১. বদর যুদ্ধের পূর্বে মুত্ইমের মৃত্যু হয়েছিল। সে সময়ের মধ্যে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি।

মুত্ইম ঃ 'আশ্রয় দিয়েছি।'

আবু জেহেল ঃ 'যাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছো, তাকে আমরাও আশ্রয় দিলাম।'

আল্লাহর রসূল মক্কায় প্রবেশ করলেন। যেহেতু মুত্ইম তাঁর দায়িত্ব নিয়েছিল সেহেতু কুরাইশরা তাঁকে কিছু বলার সাহস পায়নি।

মহানবী সোজা কাবাগৃহে চলে গেলেন। কয়েকজন কুরাইশও আগে থেকে সেখানে বসে ছিল। তাদের মধ্যে হাশিম পরিবারেরও কিছু লোক ছিল। আবু জেহেল তাদের উদ্দেশ্যে বিদ্রূপ করে বলল ঃ

'ওহে মানাফের আত্মীয়-পরিজন! ইনি তোমাদের নবী!'

রবীআ'র পুত্র উত্বাও সেখানে উপস্থিত ছিল। সে-ও হাশিমী বংশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং তখনো পর্যন্ত সে কুরাইশদের একজন ছিল। সাথে সাথে সে জবাব দিল– 'আমাদের মধ্যেকার কোনো ব্যক্তি যদি নবী হয় অথবা কেউ বাদশাহী পায় তাহলে এতে তোমাদের হিংসার কী আছে ?'

মহানবী (সাঃ) এ কথা শুনেই তাঁর কাছে এসে বললেন ঃ 'আশ্চর্যজনক ব্যাপার উত্বা! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ব্যাপারে তুমি একেবারেই বেখেয়াল ছিলে কিন্তু তোমার মনের অগোচরেই তুমি তার সম্পর্কে সঠিক কথা উচ্চারণ করলে!'

তারপর তিনি আবু জেহেলকে উদ্দেশ্য করে বললেন– 'শুনে রাখো আবু জেহেল! সেদিন অতি দ্রুত এগিয়ে আসছে যেদিন তোমাদের সমস্ত হাসি-ঠাট্টা কর্পূরের মতো উড়ে যাবে। সেদিন তোমাদের ঐ মুখ দিয়ে শুধু কান্না আর কান্নার আওয়াজই শোনা যাবে। আর দুচোখ দিয়ে রক্তের অশ্রু বয়ে যাবে।'

তারপর তিনি কুরাইশ গোত্রপতিদের সম্বোধন করে বললেন ঃ 'কুরাইশ নেতৃবৃন্দ! তোমরাও শুনে রাখো। মনোযোগ দিয়ে শুনে রাখো। সেদিন আর দূরে নয় যেদিন তোমাদের এ বিপজ্জনক আচরণ তোমাদের উপর বুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে।'

এ কথা শোনার পর কুরাইশদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়; কিন্তু তাঁকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছিলেন মুত্ইম তাই তারা কিছু বলতে বা করতে সাহস পেলো না। কারণ, পরিণামটা খুব মধুর হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

তিনি এবার কুরাইশদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তাদের আমন্ত্রণ জানানোও ছেড়ে দিলেন। এবার তিনি অন্যান্য গোত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সত্যের সংবাদ পৌঁছে দিতে লাগলেন। তাদের হাট-বাজার, বসতি সর্বত্রই গেলেন। গিয়ে গিয়ে তাদের আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানালেন। তিনি তাদের কাছে নিজের নবুয়তের কথাও প্রচার করলেন। তিনি

তাদের সত্যধর্মের প্রতি বিশ্বাস এনে তাঁর অনুসারী হতে উদ্বুদ্ধ করলেন। তাদের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাও কামনা করলেন যাতে সম্পূর্ণ নির্বিবাদে ও নির্ভয়ে সত্যধর্মের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। বিভ্রান্ত ও বিপথগামী মানুষদের যাতে সৎ ও সত্যপথের সন্ধান দিতে পারেন।

৪

মহানবীর এক চাচাতো বোন ছিল। তার নাম ছিল হিন্দা। সে ছিল আবু তালিবের কন্যা। লোকেরা তাকে উম্মে হানী নামেও অভিহিত করত। তাঁর নবুয়তের দশম বৎসরের কথা। তখন ছিল রজব মাস। একদিন তিনি তার ঘরে ঘুমিয়েছিলেন। প্রভাত হতেই তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি উঠে বসলেন। তা দেখে উম্মে হানীও উঠে বসল। তিনি অজু করলেন এবং নামায পড়লেন। তারপর তাকে বললেন ঃ 'উম্মে হানি! আমি তো এখানে এশার নামায তোমার সাথেই পড়েছিলাম। তুমি তো তা দেখেওছিলে। তারপর আমি বায়তুল মুকাদ্দাস গেলাম। সেখানে নামায পড়লাম। তারপর এখন আবার তোমার সাথে নামায পড়লাম।'

উম্মে হানী এ কথা শুনে তাঁর পানে বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল ঃ 'বিস্তারিত বলুন, কী কী হয়েছিল আর কী করে হয়েছিল ?'

মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ 'উম্মে হানি! আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। তারপর হঠাৎ আমি অনুভব করলাম কেউ যেন আমাকে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। তারপর আমার চোখ খুলে গেল। তারপর দেখলাম, হজরত জিব্রাঈল ঘরের ছাদ আলগা করে আমার কাছে এসেছেন। আমার জন্য এটা একটা সম্পূর্ণ নতুন ঘটনা। এর আগে তো এরকম কিছু আর কখনো দেখিনি। জিব্রাঈল এর আগে আমার সামনে আর কখনো এভাবে উপস্থিত হননি। সর্বাবস্থাতেই তিনি সামনে দিয়ে আসতেন। কিন্তু এবারে এলেন সম্পূর্ণ অন্যভাবে। তিনি আমার হাত ধরলেন। তারপর কাবাঘরের পাশে হাতিমের স্থানটিতে নিয়ে এসে ওখানেই আমাকে শুইয়ে দিলেন। তারপর আমার বক্ষ বিদারণ করলেন। তারপর একটি সোনার থালা আনলেন। সেটি ছিল জ্ঞান ও ঈমানে পূর্ণ একটি পাত্র। তারপর সেটি আমার বক্ষ-পিঞ্জরের মধ্যে ঢেলে দিয়ে আমার বুকটি বন্ধ করে দিলেন। তারপর একটি সাদা বর্ণের চতুষ্পদ প্রাণী এলো। সেটি ছিল খচ্চরের চেয়ে সামান্য ছোট ও গাধার চেয়ে কিছুটা বড়। তার উপর আমরা দু'জন আরোহণ করলাম। চোখের পলকেই সেটি বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে গেল। সেখানে পৌঁছে আমি নামায পড়লাম। নামাযে ইমামতি করলাম আমি আর সমস্ত নবী আমার পিছনে নামায পড়লেন।'

উম্মে হানী গভীর মনোযোগ সহকারে এ অলৌকিক বৃত্তান্ত শুনতে লাগলেন। বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। মহানবীর (সাঃ) মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অনেকগুণে

বেশি হয়ে ধরা পড়ল। কিন্তু সাথে সাথে তাঁর মনে সন্দেহও জাগল। বললঃ 'সম্মানিত ভাই সাহেব। একথা আর কারো সাথে কখনো বলবেন না। তাহলে যারা ঈমান এনেছে তারাও শেষ পর্যন্ত ঈমান ত্যাগ করবে।'

মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ 'না, না। একথা তো আমি কুরাইশদের সাথেও বলব।'

সে বলল ঃ 'ভাইজান! আমি কসম খেয়ে বলছি, কুরাইশদের সাথে এ কথা কখনোই বলবেন না। তাহলে তারা তা মিথ্যা বলে প্রচার করবে; উল্টো আপনার আরো ক্ষতি করবে।'

মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ 'না, না। আমি অবশ্যই বলব।'

তিনি উঠলেন এবং কুরাইশদের মজলিসের প্রতি ধাবমান হলেন। উম্মে হানীর মন মানছিল না। তাই সে তার এক দাসীকে মহানবীর পিছন পিছন পাঠিয়ে দিল যাতে সেখানে কী ঘটেছে তা দেখে এসে তাঁর কাছে বর্ণনা করতে পারে।

কাবা প্রাঙ্গনে কুরাইশদের কিছু লোক বসে ছিল। তিনি সেখানে গিয়ে বসে পড়লেন। ভাবলেন, যা কিছু দেখেছি সব তাদের সাথে বর্ণনা করি। তারপর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, এ ঘটনা যদি তাদের বলি, তাহলে তাদের পক্ষ থেকে এর কী প্রতিক্রিয়া হবে ? আমার কথা কি লোক মেনে নেবে ? না মিথ্যা প্রতিপন্ন করে হাসি তামাশা করবে ?

আর আমি কী পুরো ঘটনা শুনিয়ে দেবো ? আমি কী তাদের সাথে বলব যে, গত রাতে আমি বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়েছিলাম ? আর আমি একথাও কী বলব যে, ওখান থেকে আমি আকাশ পথে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলাম ? নাকি শুধু সে কথাটি বলব, যা আমি উম্মে হানীকে বলেছিলাম ?

চিন্তা করতে করতে অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। তাঁর মনে মুহূর্মুহূ সে কথাটিই ঘুরে ফিরে আসতে লাগল।

সে কথা মনে করে আনন্দে ও আবেগে তাঁর তন-মন-প্রাণসহ সমস্ত সত্তা উচ্ছ্বসিত ও উদ্বেলিত হয়ে উঠতে লাগল। তিনি ভাবতে লাগলেন, আমার প্রভু সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাকে কত বড় সৌভাগ্য দান করেছেন। মহাপ্রভু আমার মর্যাদা কতটা বাড়িয়ে দিয়েছেন। এক রাতেই তিনি আমাকে মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গেলেন, তারপর আমাকে মহাকাশ পরিভ্রমণ করালেন। যেখানে রয়েছে আল্লাহর আরশ আর সেখান থেকেই তিনি সমগ্র সৃষ্টিকুলে তাঁর শাসনকার্য অব্যাহত রেখেছেন।

অন্যদিকে তার মনে আবার সন্দেহের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসতে লাগল এটা ভেবে যে, মানবকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ এ কীর্তিকর্ম যা স্বয়ং খোদাতা'লা আমাকে দিয়ে

করিয়ে নিয়েছেন। সে কথা শুনে অবিশ্বাসীরা হাসি-তামাশা করবে না তো ? তিনি ভাবতে লাগলেন– 'কুরাইশদের যখন একথা শোনাব তখন তারা আমাকে উপহাস করবে। আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করবে। অথচ আমার অন্তর আর সমস্ত সত্তা দিয়ে স্বচক্ষে যা দেখেছি, আল্লাহ্ আমাকে যা দেখিয়েছেন, তা আমি তাদেরও জানিয়ে দিই। আল্লাহর যে সৃষ্টিকুলরাজি আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তা তাদের অবগত করাই।'

কাবায় তিনি চিন্তিতভাবে ঘাড় ঝুঁকিয়ে বসে রইলেন। যদিও এমনিভাবে সাধারণত সেখানে কেউ বসে থাকে না।

উপস্থিত লোকেরা দেখল যে, মহানবী রীতি বহির্ভূতভাবে চুপচাপ বসে রয়েছেন। ওই মজলিসে আবু জেহেল ও আদীর পুত্র মুত্ইমও বসে ছিল। মহানবীকে এমন উদাসভাবে বসে থাকতে দেখে আবু জেহেল উঠে তাঁর কাছে এসে বলল ঃ 'মুহম্মদ! এভাবে চুপচাপ বসে আছো কেন ? তোমার কী হয়েছে ? আজ কোনো নতুন কথা আসেনি ?'

এবার মহানবী (সাঃ) কথা বলার সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ। আজ আমাকে পরিভ্রমণ করানো হয়েছে।'

আবু জেহেল ঃ 'কোথায় ?'

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ 'বায়তুল মুকাদ্দাসে।'

এ কথা শুনেই আবু জেহেল হেসে কুটিকুটি হয়ে গেল। মজা করার বিরাট একটা সুযোগ পেয়ে গেল আবু জেহেল। কেননা, মহানবীকে ব্যর্থ করে দেয়ার একটা জোরালো হাতিয়ার ধীরে ধীরে তার হাতে এসে যাচ্ছিল। জনগণকে বিমুখ, বিপথগামী ও সন্দিগ্ধ করার ব্যাপারে সে অগ্রণী ভূমিকা পালন করত।

সে মহানবী (সাঃ) কে সাহস বাড়িয়ে দিয়ে মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে বলল ঃ 'যদি আরো লোকজন ডাকি, তাহলে তোমার কথা তুমি তাদেরও শোনাবে তো?'

মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ 'হ্যাঁ।'

আবু জেহেল বেশ জোরে চীৎকার করে বললঃ 'ওহে কা'ব বিন লুইয়ের আত্মীয় স্বজন। তোমরা তাড়াতাড়ি চলে এসো।'

দেখতে দেখতে অনেক লোক এসে জড়ো হল। আবু জেহেল বলল ঃ 'আবুল হাকাম!' সে মহানবী (সাঃ) এর দিকে ইঙ্গিত করে বলল ঃ 'তুমি যা শোনালে তা ঐসব লোকদেরও শুনিয়ে দাও।'

মহানবী (সাঃ) সবার উদ্দেশ্যে বললেন ঃ 'আজ রাতে বুরাক নামক এক প্রাণী এলো। তার পিঠে সওয়ার হয়ে আমি বায়তুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ করেছি। সেখানে আমার পূর্ববর্তী নবীরাও এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইব্রাহীমও ছিলেন। সেই সাথে ঈসা ও মূসা নবীও ছিলেন। আমি ইমামতী করে নামাযও পড়িয়েছি।'

একথা শুনে উপস্থিত লোকেরা হতভম্ব হয়ে পড়ল। সাথে সাথে একদল লোক ঠাট্টা করল। আবু জেহেল উপহাস করে বলল ঃ 'আচ্ছা। সমস্ত নবীকে জীবিত করে তোমার কাছে আনা হয়েছিল ? তাদের রূপ-চেহারার একটু বর্ণনা দাও।'

মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ 'ঈসা ছিলেন মাঝারি ধরনের মানুষ। বুক চওড়া। দেহের রঙ লাল আভা যুক্ত ফর্সা। তাঁর মাথার চুলও কিছুটা লালাভ। মূসার শারীরিক গঠন ভারিক্কি ধরনের এবং তাঁর গায়ের রং শ্যামলা। ঘাড় কিছুটা উঁচু। আর আল্লাহর কসম! ইব্রাহীমের চেহারার সাথে আমার চেহারার বিরাট মিল রয়েছে। চেহারা, কর্মে সবদিক দিয়েই আশ্চর্য মিল।'

একথা শুনে সবাই দাঁতে আঙুল চাপলো। মুহম্মদ এ সব কী বলছেন ? তিনি যা কিছু বলছেন, এ সব কী সত্যি ? না কি মিথ্যা ও মনগড়া গল্প ?

কিছু লোকের মনে তাঁর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এক গভীর শ্রদ্ধার ভাব জাগরিত হল। কিছু লোকের মাথা চক্কর মারতে লাগল। কারো বা বিদ্যাবুদ্ধি লোপ পাওয়ার মতো অবস্থা হল। আর কিছু লোক সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়ল আর কিছু লোক জোর উপহাস করতে লাগল। আর কিছু লোক তাঁর প্রিয় বন্ধু আবুবকরকে এ খবরটি শোনাতে গেল। গিয়ে বলল ঃ 'আবুবকর! আপনার নবীর কথা একটু শুনুন! তিনি বলছেন, আজ রাতে তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ করানো হয়েছে।'

আবুবকর বললেন– 'তিনি কী সত্যিই একথা বলেছেন ?'

পৌত্তলিক ঃ 'হাঁ।'

আবুবকর বললেন ঃ 'তিনি যদি তা বলে থাকেন তাহলে তা যে সত্য– তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

পৌত্তলিক ঃ 'এটা কী বিশ্বাসযোগ্য কোনো কথা ? তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে গেলেন এবং সকালেই ফিরে এলেন– এটা কী সম্ভব ?'

আবুবকর ঃ 'আচ্ছা! তাতে কী আছে ? এ ছাড়া আরো অনেক আশ্চর্য বিষয়কে আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি। তিনি (সাঃ) বলছেন, দিনে হোক বা রাতেই হোক আমার কাছে উপর হতে প্রত্যাদেশ আসে। তা যে আসে তাতে আমি কোনো সন্দেহ পোষণ করি না। এতে তোমাদের সন্দেহের কারণ তো বুঝি না। বল, এটা তোমাদের কেমন কথা ?'

তারপর আবুবকর মহানবীর কাছে এলেন। তখন তিনি কাবা প্রাঙ্গনে অবস্থান করছিলেন আর পৌত্তলিকরা তাঁকে বলছিলঃ 'মুহম্মদ! এতদিন পর্যন্ত আমরা তোমাকে শুধু সন্দেহই করে এসেছি, এখন দেখছি, তুমি একটা আস্ত মিথ্যাবাদী! তোমার মনে যা আসে তাই তুমি গড়গড় করে বলে যাও। আমরা তো উটের পিঠে সওয়ার হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস যাই; সেখানে আমাদের পৌঁছাতে এক মাস

সময় লাগে আর ফিরে আসতে লাগে আরো এক মাস। তুমি বলছ, সেখানে তুমি এক রাতের মধ্যে গিয়েই আবার ফিরে এসেছো। লাত ও উজ্জার শপথ, তোমার কথা আমরা কখনোই বিশ্বাস করতে পারি না। একেবারেই বাজে কথা, মিথ্যা কথা।'

আবুবকর বললেন ঃ 'মুহম্মদ মিথ্যা বলেন না। তিনি প্রকৃতই সত্য কথা বলছেন।'

মুত্ইম ঃ 'মুহম্মদ! বায়তুল মুকাদদাসের নকশাটা একটু বর্ণনা করো তো!'

আবুবকর বুঝতে পারলেন যে, মুত্ইম মহানবীকে অপদস্ত করতে চাইছে। সেজন্য তিনি আকাঙ্ক্ষা করলেন যে, মহানবী তা বর্ণনা করুন যাতে তার সততা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে যায়। তিনি মহানবীর কাছে নিবেদন করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি বর্ণনা করুন। আমি তো বায়তুল মুকাদ্দাস দেখেছি।'

মহানবী বায়তুল মুকাদ্দাসের গঠনপ্রকৃতি বর্ণনা করতে লাগলেন যদিও তিনি এ ঘটনার পূর্বে আর কখনো যাননি। সেখানে যেসব চিহ্ন বিদ্যমান ছিল, তিনি যা যা দেখেছিলেন, তা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। তাঁর বয়ান শুনতে শুনতে সবাই অবাক বিস্ময়ে তাঁর মুখপানে তাকিয়ে রইল।

তাঁর বর্ণনা শেষ হতে না হতেই তাদের মধ্যেকার সুপ্ত হঠকারিতা আবার চাঁগাড় দিয়ে উঠল। বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে তারা বলল ঃ 'এসব কথা কেউ তোমাকে বলে দিয়েছে। প্রকাশ্য প্রমাণ হাজির করো।'

মহানবী (সাঃ) সে পথ অতিক্রম করতে করতে পথে যা কিছু দেখেছিলেন তা সবিস্তারে বর্ণনা করতে লাগলেন। বললেন ঃ 'অমুক অমুক কাফেলার সাথে অমুক অমুক জাগায় সাক্ষাৎ হয়েছিল। অমুক অমুক জনবসতির পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি। এত এত উট দেখেছি। এসব কাফেলা অতি সত্বরই যার যার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে। কেউ কেউ পৌঁছে গিয়েছে। কোন কাফেলার সাথে কী কী মালপত্র ছিল তা-ও তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করলেন এবং বললেন, তাতে এ সকল চতুষ্পদ প্রাণী রয়েছে।'

পৌত্তলিক ঃ 'তোমার কথা আমরা কীভাবে বিশ্বাস করব ? একটু অপেক্ষা করো, কাফেলাগুলোকে আসতে দাও। তাদেরও জিজ্ঞেস করি যে, ঐ রাতে তারা কোথায় ছিল ? যে সকল চিহ্নের কথা তুমি বর্ণনা করছ তা খোঁজ নিয়ে জেনে নিই।'

আবুবকর বলে উঠলেন ঃ 'আল্লাহর রসূল! আপনি ঠিক বলেছেন।'

মহানবী (সাঃ) মাথা ঝুঁকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইলেন। তারপর আবুবকরের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ 'আল্লাহ তোমাকে 'সিদ্দীক' উপাধি প্রদান করেছেন।'

সভা শেষ হল। লোকেরা এদিক ওদিক চলে গেল। কিন্তু সর্বত্রই একথা চর্চিত হতে লাগল। সর্বত্রই একই কথা। দুটো লোক একত্রিত হলেই এ কথা

শুরু হয়ে যায়। বলতে থাকে– 'তোমরা কী এ ঘটনা শুনেছো ? একথা তোমাদের বোধগম্য হয় ? এত কম সময়ের মধ্যে সেখানে গিয়ে আবার ফিরে আসা যায় ? কী মনে হয়? মুহম্মদ কী সত্য কথা বলছেন ?'

কয়েক দিন যেতে না যেতেই ঐ সব কাফেলা ফিরে এলো। যাদের কথা মহানবী উল্লেখ করেছিলেন। দেখা গেল যে, তাতে ঐ সকল মালপত্রই রয়েছে যা মহানবী বলেছিলেন। চতুষ্পদ প্রাণীদের কথাও নির্জলা সত্য।

এ সব দেখার পরেও পৌত্তলিকরা মহানবীর সত্যবাক্য মেনে নিল না। তাদের হঠকারিতা নতুন পথ ধরল। বলল– 'মুগীরার পুত্র ওয়ালিদ ঠিক বলেছিল যে, মুহম্মদ যাদুকর। সে মোটেই মিথ্যা বলেনি। দেখ, এ ঘটনাই তার প্রমাণ। বাস্তবিকই সে কী সত্যি কথাই না বলেছিল!'

এ ছিল পৌত্তলিকদের অবস্থা। মুসলমানদের জন্যও তা মোটেই মামুলি ব্যাপার ছিল না। তা ছিল বিরাট এক বিশ্বাসজনিত সিদ্ধান্ত যা নিজেদের মধ্যেকার সমস্ত দোদুল্যমানতাকে দূর করে দিয়েছিল। এখানেই প্রমাণ হয়ে গেল যে, কার ঈমান মজবুত আর কার ঈমান দুর্বল। যার ঈমান সুদৃঢ় ছিল, এ ঘটনার পর তা আরো চমৎকৃত ও মজবুত হয়ে উঠল। কিন্তু যাদের ঈমান দুর্বল ছিল তাদের মধ্যে তা ভ্রমাত্মক ও সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠল। তাদের মধ্যে সন্দেহের কালো মেঘ আরো ঘনীভূত হয়ে উঠল এবং অবশেষে ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল।

প্রিয়নবী মুহম্মদ (সাঃ) তাঁর সাচ্চা ও নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীদের মধ্যে গিয়ে বসলেন। আল্লাহ তাঁকে যে মহাসৌভাগ্যের অধিকার দান করেছিলেন তা তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। ঊর্ধ্বলোকে যাওয়ার ঘটনাও বর্ণনা করলেন। সেখানে তিনি আল্লাহর কুদরতের যেসব অসীম দান প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাও বর্ণনা করলেন। মহানবী বললেন ঃ

'জিব্রাঈল আমাকে সাথে করে ঊর্ধ্বলোকে একের পর এক আকাশ অতিক্রম করে ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে গিলেন। সেখানে মানবজাতির আদি পিতা হজরত আদম (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হল। তাঁর ডান দিকটাতে অনবরত আনন্দের স্বর্গীয় ও বাম দিকটাতে বেদনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। এর কারণ, তাঁর সন্তানদের একদিকে ছিল মহত্ত্ব ও সুকর্মের প্রকাশ– এটি তাঁর দিকের ইঙ্গিতবহ এবং বামদিকে বেদনার বহিঃপ্রকাশ যা তাঁর সন্তানদের অন্যায় ও পাপকর্মের ইঙ্গিতবহ। আদম (আঃ) তাঁকে বললেন– 'হে পবিত্র সন্তান, হে পবিত্র নবী! তোমাকে শুভেচ্ছা।'

তিনি (সাঃ) বললেন ঃ 'জিব্রাঈল! ইনি কে ?'

জিব্রাঈল বললেন ঃ 'ইনি হজরত আদম (আঃ)। মানবজাতির আদি পিতা।'

এরপর জিব্রাঈল তাঁকে দ্বিতীয় আকাশে নিয়ে গেলেন। তারপর তৃতীয়, তারপর আরো এগিয়ে যেতে লাগলেন। তারপর যে নবীদের তিনি অতিক্রম

করছিলেন–তাঁরা তাঁকে বলছিলেন– 'হে পবিত্র নবী, পুণ্যাত্মা ভাই! তোমাকে শুভেচ্ছা।'

এভাবে তিনি সপ্তম আকাশে পৌঁছে গেলেন। সেখানে হজরত ইব্রাহীমের (আঃ) সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তাঁকে দেখেই ইব্রাহীম বললেন– 'সু-স্বাগতম হে পবিত্র নবী, পবিত্রাত্মা পুত্র!'

তিনি (সাঃ) এগিয়ে চললেন। অনবরত এগিয়ে চললেন। চলার পথে তিনি সুন্দর-অসুন্দর অসংখ্য দৃশ্য দেখলেন। দেখলেন সুন্দরের সৌন্দর্য আর অসুন্দরের হৃদয় বিদারক দৃশ্য। হাজার হাজার ফিরিশতা স্বচক্ষে দর্শন করলেন। তারা সিজদায় অবনত হয়ে মহিমাময় আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন ছিল। এগুতে এগুতে তিনি আল্লাহর আরশের একেবারে নিকটে পৌঁছে গেলেন। সেখানে তাঁর এবং তাঁর উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরজ হল। ফেরার পথে হজরত মূসা (আঃ) এর সাথে দেখা হল। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ 'বলুন, আপনার উম্মতের উপর কী ফরজ হয়েছে ?'

মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ 'পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায।'

মূসা (আঃ) বললেন ঃ 'ফিরে যান। গিয়ে প্রভুর কাছ থেকে কমিয়ে আনুন।'

মহানবী (সাঃ) ফিরে এসে নিবেদন করলেন। আল্লাহ নামায অর্ধেক ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। ফেরার পথে পুনরায় মূসা (আঃ) এর সাথে দেখা হল। এ কথা শুনে মূসা বললেন ঃ 'আবার ফিরে গিয়ে কমানোর জন্য আবেদন করুন। উম্মতের জন্য এত নামাযও সুকঠিন হবে।'

মহানবী (সাঃ) পুনরায় ফিরে গেলেন এবং কমানোর জন্য আবারো অনুরোধ করলেন। আল্লাহ সে অনুরোধ মেনে নিয়ে নামায কিছু কমিয়ে দিলেন।

আবার ফেরার পথে মূসা (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ হল। মূসা (আঃ) আবার বললেন ঃ 'ফিরে যান। আরো কমানোর আবেদন করুন।'

মহানবী (সাঃ) পুনরায় ফিরে গেলেন। আল্লাহ এবার তা থেকে কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করে দিলেন এবং বললেন ঃ 'এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিধান দেয়া হল আপনার উম্মতের জন্য। এ থেকেই পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের পুণ্য লাভ করা যাবে। এ আমার শেষ বিধান। এর আর পরিবর্তন নেই।'

সারা রাত অতিবাহিত হয়ে গেল। মহানবী (সাঃ) তাঁর প্রিয় নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীদের সাথে বসে রইলেন। উর্ধ্বলোকে যাওয়া-আসার পথে যা কিছু দেখেছিলেন তা বড়ই আন্তরিকতার সাথে বর্ণনা করছিলেন। সাথীরা গভীর মনোযোগ সহকারে তা শুনছিলেন। তিনি জান্নাতে যা কিছু দেখেছিলেন তা বড়ই আন্তরিকতার সাথে বর্ণনা করলেন। তিনি তাঁর নিবেদিতপ্রাণ সাথীদের এ সুসংবাদও শোনালেন যে, পবিত্র জান্নাত সৌভাগ্য ও শান্তির ডালি সাজিয়ে তোমাদের জন্য অপেক্ষমাণ রয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়

আলোর পথের যাত্রী

— মিরাজের ঘটনা ও কমজোরী মুসলমান

— কাফেলাদের সাথে আল্লাহ্‌র রসূলের সাক্ষাৎ

— কিছু ভাগ্যবান আত্মার ইসলামে আগমন

— খ্রিস্টানদের প্রতিনিধিদল ও তাদের প্রতিক্রিয়া

— বিভিন্ন সম্প্রদায়ে রসূলের দৌত্য

— আউস ও খাজরাজের গৃহযুদ্ধ

— খাজরাজ গোত্রে ইসলামের আলো

— আকবার প্রথম বাইয়াত

— মদীনায় ইসলামের চন্দ্রোদয়

— চাচা আব্বাসের ভাষণ

— মদীনাবাসীদের উল্লাস

— আকবার দ্বিতীয় বাইয়াত

— পৌত্তলিকদের বিভ্রান্তি।

অষ্টম অধ্যায়
আলোর পথের যাত্রী

১

'মন্দের জবাব দাও সুকর্মের দ্বারা। এর ফলে, যে তোমার শত্রু ছিল সে এমন হয়ে যাবে যেন তোমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু।' –কুরআন।

শত্রুরা যখন চারদিক থেকে অন্ধকারের মতো ঘিরে আসে তখন মুমিনের কী করা কর্তব্য? শত্রুদের সাথে কেমন ব্যবহার করা উচিত ? শত্রু মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে কীভাবে ইসলামে শিক্ষা পৌঁছে দেয়া উচিত ? পবিত্র কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে এসব প্রশ্নেরই জবাব এসেছে। আল্লাহ বলেন ঃ 'হে নবী! এরকম নাজুক পরিস্থিতিতে ধৈর্য ও বিচার-বিবেচনা সহকারে কাজ করতে হবে। শত্রুদের সাথে মধুর মনোরঞ্জক ভাষায় কথা বলুন। দুর্ব্যবহারের জবাব দিন অতি সুন্দরভাবে এবং কাউকে বোঝাতে হলে তা গভীর আন্তরিকতার সাথে করতে হবে। যদি জুলুম-অত্যাচারের পরিমাণ পাহাড়তুল্যও হয় তবুও ধৈর্য সহকারে কাজ করতে হবে। কেননা, ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে আল্লাহ সাহায্য করেন।'

বহু লোক বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে দিন গুজারা করছিল। তাদের অন্তর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছিল এবং বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে তারা ছিল অক্ষম। সেজন্য মিরাজের বিস্ময়কর ঘটনা শুনে এসব লোকেরা আল্লাহর বিজ্ঞানময় সত্তাকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে শয়তানের ফাঁদে পা দিয়ে সত্য ধর্মের বিরোধিতায় নেমে পড়ল। এতে মুসলমানরা বড়ই ব্যথিত ও দুঃখিত হলেন। কিন্তু এর ফলে পৌত্তলিকদের হাত শক্ত হল এবং তাদের শয়তানি বুদ্ধি এক সময় আকাশচুম্বী হয়ে উঠল। তারা মহানবীর (সাঃ) বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করল। সিদ্ধান্ত নিল যে, কারো প্রতি সামান্যতম সহানুভূতিও দেখানো হবে না। মুসলমানদের সাথে অব্যাহতভাবে সংগ্রাম চলবে। পরিবেষ্টিত করে তাদের উপর অত্যাচার চালানো হবে যাতে মুসলমানরা মুহম্মদের শিক্ষা ও ধর্ম ত্যাগ করে পুনরায় পূর্বপুরুষদের ধর্মে ফিরে যায়। আল্লাহর রসূল সমস্ত অত্যাচার নীরবে সয়ে যেতে লাগলেন। বিনিময়ে তিনি তাদের সাথে সমস্ত রকমের সদাচরণ করে চলতে লাগলেন। তিনি সত্য ও মঙ্গলের প্রদীপ্ত আলোক শিখার ন্যায় নিজে ঊর্ধ্বে তুলে নিলেন। আরবে তিনটি বিখ্যাত মেলা বসত। এগুলো উকাজ, মিজান্না ও জিলমাযায নামে পরিচিত ছিল। হাজিরা মক্কায় যাওয়ার পূর্বে প্রথমে এ মেলাগুলোতে যেতেন। মহানবীও সেখানে পৌঁছে যেতেন। তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং মীনা ও আকবা যাওয়ার পথে হাজিদের কাফেলা যেখানে গিয়ে

অবস্থান করত তিনি সেখানে গিয়েও তাঁদের সাথে মিলিত হতেন। তিনি তাদের সত্যধর্মের বাণী শোনাতেন। পবিত্র কুরআনের আয়াত শোনাতেন। এ আয়াতগুলোতে অংশীবাদ ও মন্দকর্ম সম্পর্কে ভয় ও শাস্তির কথা বর্ণিত থাকত। তারপর তিনি তাদের সত্যধর্মে আহ্বান জানাতেন। তিনি আকাঙ্ক্ষা করতেন যে, কুরাইশদের বদমাইশি থেকে মুক্ত থাকতে; যাতে স্বাধীনভাবে জনসাধারণের কাছে ধর্মের আহ্বান বাণী পৌঁছে দিতে পারেন।

কিন্তু মহানবীর এভাবে ধর্মপ্রচারকে কুরাইশরা মোটেও ভালো চোখে দেখল না। এভাবে ইসলাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তিনি লোকদের অনবরত আহ্বান করে যেতে লাগলেন। দিনের পর দিন মহানবীর নিবেদিতপ্রাণ ও সাহায্যকারী ব্যক্তিদের সংখ্যা বাড়তে দেখে তারা হিংসায় জ্বলতে লাগল। তা দেখে আবু লাহাব আরো হিংস্র হয়ে উঠল। সেজন্য মহানবী যেখানেই যান সেখানেই সে গুণ্ডা ও দলবল নিয়ে গিয়ে হাজির হয়। মহানবী (সাঃ) কে জনসাধারণের সাথে কথা বলতে দেখলেই সে সেখানে চড়াও হয়ে তাদের বিভ্রান্ত করতে লাগল। তাঁর বক্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য আবু লাহাব বলতে লাগলঃ 'ভাইসব! এ লোকটা মিথ্যাবাদী, যাদুকর। সে নিজে উদ্ভ্রান্ত হয়েছে এবং জনসাধারণকেও উদ্ভ্রান্ত করছে। ওর কথা তোমরা শুনো না। ওর কথা বিশ্বাস করো না।'

একথা শুনে কাফেলার লোকেরা কানে হাত দিয়ে কান বন্ধ করল। তাঁকে উল্টো-পাল্টা বলে গালি দিতে লাগল। কিন্তু শত শত মানুষের মধ্যে কিছু এমন লোকও ছিল যারা তাঁর কথা মেনে নিয়ে তাঁর প্রচারিত সত্যকে গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেল। সে সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিদের মধ্যে তুফায়েল দৌসিও ছিলেন। ইনি ছিলেন খুব উচ্চ স্তরের কবি। খুবই বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন হজ্জ করার জন্য কাবা প্রাঙ্গনে এলেন তখন কুরাইশরা তার কান ভারি করে দিল এই বলে যে, তিনি যেন মুহম্মদ থেকে সদা-সর্বদাই দূরে দূরে থাকেন। তিনি কুরাইশদের কথা সরলভাবে বিশ্বাস করে নিলেন এবং কাবা প্রদক্ষিণের সময় তিনি যথারীতি দু'কান বন্ধ করে নিলেন যাতে মুহম্মদের (সাঃ) মুখ দিয়ে উচ্চারিত কোনো কথা তাঁর কানে না আসে। মহানবী (সাঃ) সে সময় কাবা প্রাঙ্গনে উচ্চৈঃস্বরে আয়াত পাঠের মাধ্যমে নামাজ পড়ছিলেন। সে সময় কাবা প্রদক্ষিণ করতে করতে তুফাইলের কানে কোনো না কোনো আয়াতের আওয়াজ আসতে লাগল। সে আয়াতের মর্মবাণী তাঁর কাছে অতীব সুন্দর ও মনোহর বলে মনে হল। তিনি মনে মনে বললেন– 'উহ্! আমি কত বোকা! আমি তো এক প্রসিদ্ধ কবি। বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞান-প্রজ্ঞারও অধিকারী। ভালো-মন্দ পরে বিবেচনা করা যাবে, কিন্তু তাঁর কথা আমি শুনব না কেন ? ভালো হলে ভালো। নইলে প্রত্যাখ্যান করব !'

মহানবী (সাঃ) গৃহাভিমুখে যাত্রা করলে তোফায়েলও তাঁর সাথী হলেন। তিনি তাঁর নবুয়ত প্রাপ্তির কাহিনী শোনালেন। কুরআনের আয়াত শুনে তাঁর হৃদয় ভাববিহ্বল হয়ে পড়ল। তাঁর সমস্ত সত্তা এক গভীর পরিতৃপ্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠল। তাঁর মনে হল এমন তৃপ্তিদায়ক ও শান্তিবর্ধক বাণী তিনি আর কখনো শোনেননি। তিনি যেন এক নতুন পথের সন্ধান অনুভব করলেন। মহানবী (সাঃ) তাকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। তোফায়েল বিলম্ব না করেই ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং বললেন ঃ 'আল্লাহর রসূল। আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার খুবই অনুগত। তারা আমার জন্য নিবেদিতপ্রাণ। আমার আদেশ-নির্দেশকে তারা গর্বভরে গ্রহণ করে। আমি গিয়ে তাদেরও ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাব।'

তোফায়েল ফিরে গিয়ে প্রথমে নিজের পরিবারের কাছে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁর প্রতি সকলেরই ভরসা ও পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তাঁর পরিবার পরিজন তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করল। তারপর তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে আমন্ত্রণ জানাতেই তারাও ইসলাম গ্রহণ করল।

আরবের সর্বত্রই মহানবীর (সাঃ) প্রচারিত ধর্মের কথা ছড়িয়ে পড়ল। খ্রিস্টানরা একথা জানতে পেরে অবিলম্বে একটি প্রতিনিধিদল পাঠালো। মহানবী তাদের পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত পাঠ করে শোনালেন। তা শুনেই তাদের হৃদয় ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে উঠল। আঁখি অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। তারা আর এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে ইসলাম গ্রহণ করল। মহানবী (সাঃ) তাদের যা কিছু বললেন, তা সাথে সাথে স্বীকার করে মুসলমান হয়ে তারা স্ব-ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করল।

ফেরার পথে আবু জেহেল ও কয়েকজন কুরাইশের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হতেই তারা গর্জন করে উঠল এবং বলল– 'আল্লাহ তোমাদের ধ্বংস করুক। তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা তোমাদের পঠিয়েছিল। তাদের কছে পুরো খবর না জানিয়ে তোমরা এ কী করলে ? বসতে না বসতেই তেমরা তার জাদুর ফাঁদে পড়ে গেলে ? আর নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে বসলে ?'

প্রতিনিধিদল তাদের কথায় কান না দিয়ে নিজেদের গন্তব্যে এগিয়ে চলেছিলেন। তাদের হৃদয় ঈমানী ঐশ্বর্যে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তারা খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছিল নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে। এক মহান ধর্মের সুসংবাদ তারা অতি দ্রুত বয়ে নিয়ে চলেছিল।

মহানবীর ধর্মপ্রচারের কথা শুনে যারা পবিত্র ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁর একজন বিশিষ্ট সহযোগী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে সামিতের পুত্র সুবাইদও ছিলেন। তিনি মদীনার অন্যতম সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন।

কবি হিসেবেও পরিচিতি ছিল তাঁর। বীরত্বেও তাঁর তুলনা ছিলেন তিনি নিজেই। নিজ বংশের লোকদের প্রতিও ছিল তাঁর অপ্রতিহত গৌরব। সেজন্য সমাজে তিনি 'কামিল' নামে অভিহিত হতেন। তিনিও হজ্জ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় এলেন। মহানবীর কথা জানতে পেরেই তিনি তাঁর কাছে গেলেন। মহানবী ইসলামের শিক্ষা তাঁর সামনে পেশ করলেন এবং তাঁকে ইসলামে আহ্বান জানালেন। আল্লাহর ইবাদতের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। সুবাইদ বললেন ঃ 'সম্ভবত, আমার কাছে যা আছে, আপনার কাছেও তাই আছে।'

মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ 'আপনার কাছে কী আছে ?'

সুবাইদ ঃ 'হাকিম লুকমানের প্রদত্ত বাণী।'

সুবাইদের স্মৃতিতে যা কিছু ছিল সবই শুনিয়ে দিলেন। মহানবী মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগলেন। তারপর বললেন ঃ 'এ তো ভারি সুন্দর কথা। কিন্তু যে বস্তু আমার কাছে আছে। তা আল্লাহর শেষ গ্রন্থ। তা সত্য, সুন্দর ও জ্ঞানালোকে আলোকিত মহাগ্রন্থ।'

মহানবী তাঁকে কুরআন শোনালেন এবং ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। সুবাইদ প্রস্তুত হলেন এবং বললেন ঃ 'বাস্তবিকই তো এ বড়ই উত্তম।'

তারপর সুবাইদ মদীনায় ফিরে গেলেন। তিনি যা কিছু শুনেছিলেন তা তাঁর মস্তিষ্কে সুরক্ষিত করে নিলেন। তিনি বারবার চিন্তা করতে রাগলেন। পরে তিনি মুসলমান অবস্থায় নিহত হলেন। ঘটনা হল মদীনায় কিছু ইহুদি বসবাস করত। এরা ছিল খুবই জঘন্য চরিত্রের লোক। পরস্পরের মধ্যে লাগালাগি, কানভারি করা ও পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টিতে তারা ছিল খুবই দড়। এদেরই লাগালাগি ও চক্রান্তের কারণে আউস ও খাযরাজ গোত্র পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হয়ে যায়। এর ফলে, মদীনায় গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। এ যুদ্ধে সুবাইদ (রাঃ) নিহত হন।

মদীনা থেকে এসে যেসব ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আয়াস (রাঃ) ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন মাআজের পুত্র। তখন তাঁর বয়স ছিল খুবই কম। সে সময়ে আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে অব্যাহতভাবে যুদ্ধ চলছিল। সে সময়ে প্রত্যেকেরই কামনা ছিল যে, আরবের প্রতিটি গোত্রই তাদের পক্ষে যোগ দিয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করুক। এঁদের মধ্যে আয়াসও ছিলেন। মহানবীর খবর শুনে তিনিও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলে মহানবী তাঁকে ইসলামে আহ্বান করলেন এবং কুরআনের কিছু আয়াতও শোনালেন। আয়াস এসব কথা শুনে তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশে বললেন ঃ 'হে আমার সম্প্রদায়! যে কারণে আপনারা এসেছেন, তার চেয়ে এ বাণী কী শ্রেষ্ঠ নয় ?'

আয়াসের সম্প্রদায় তখন ছিল প্রচণ্ড মারমুখী। রাত দিন তারা যুদ্ধের চিন্তায় সময় অতিবাহিত করছিল। কাফেলার দলপতি ছিল আবুল হাইস। সে জমীন

থেকে কাঁকর তুলে তাঁর মুখে নিক্ষেপ করে বলল ঃ 'চুপ কর। আমরা এসব কথা শোনার জন্য আসিনি।' কিন্তু আয়াস[১] সে সময়েই পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করল। এর কিছু দিন পরেই আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল।

মহানবী (সাঃ) নিজেই প্রত্যেক গোত্রের কাছে গেলেন। তিনি তাদের ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। সকলের কাছে সাহায্য ও সহযোগিতার আকুল আবেদন জানালেন। কিন্তু লোকেরা সে কথায় কর্ণপাতই করলো না। সকলেই যেন তা না শোনার ভান করে রইল। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে নানা রকমের প্রতিক্রিয়া কাজ করছিল।

কেউ চিন্তা করল আমাদের নগর সকলের জন্যই একটা পছন্দনীয় স্থান। যদি আমরা মুহম্মদকে (সাঃ) সাহায্য সহযোগিতা করি তাহলে অন্যেরা তা অপছন্দ করবে এবং এর ফলে, আমাদের সেখানে যাওয়া-আসা বন্ধ হয়ে যাবে। ছকীফ গোত্রের জন্য এটাই ছিল মূল কারণ। তায়েফের আবহাওয়া ছিল বড়ই মনোর ক। তা প্রত্যেকেই পছন্দ করত। গরমের মওসুম এলেই সেখানে ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকেদের মেলা বসে যেতো। ছকীফ গোত্রের ধারণা ছিল যদি আমরা মুহম্মদকে (সাঃ) সহযোগিতা করি তাহলে আমাদের তায়েফ ত্যাগ করতে হবে। আরবের বিখ্যাত 'লাত' দেবতার মন্দিরও অবস্থিত ছিল সেখানে। যে কারণে তায়েফ একটা তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। সেজন্য ঈমান আনাও ছিল তাদের স্বার্থের পক্ষে বিপজ্জনক।

এমন কিছু গোত্রও ছিল যাদের নেতাগিরি করার তীব্র বাসনা ছিল। বনু আমীর গোত্রের লোকদের অবস্থা ছিল এরকমই। তারা মহানবীকে বলল ঃ 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করতে রাজি আছি, কিন্তু আপনার পরে নেতৃত্ব করব আমরা।'

মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ 'শাসন ও নেতৃত্বের পূর্ণ ক্ষমতা দানের এখতিয়ার আল্লাহর। তিনি যাকে মনে করেন তাকে তা দান করেন।'

একথা শুনেই তারা মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বললঃ 'আমরা আপনার জন্য প্রাণ দেবো অথচ বিজয়ের পরে অন্য লোক এসে নেতৃত্ব করবে। যান । আপনার সাথে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই।'

আরবের কয়েকটি বিখ্যাত গোত্র ছিল কিন্দা, কল্ব, বনু হুনাইফা ও বনু মুজর। এরা এবং ছোটখাট কয়েকটি গোত্রও মুখ ফিরিয়ে নিল। কেউই মহানবীকে সাহায্য ও সহযোগিতা করল না। তারা বলল যে, গৃহস্বামীই গৃহবাসীদের খবর সবচেয়ে বেশি জানে। এতে যদি সামান্যতমও মঙ্গল নিহিত থাকত তাহলে তাকে তাড়াবার কোনো প্রয়োজন তো তারা মনে করত না।

---

১. আয়াস (রাঃ) মহানবীর (সঃ) মদীনায় হিজরতের পূর্বে ইন্তিকাল করেছিলেন। লোকেরা দেখেন যে, মৃত্যুর পূর্বে তাঁর মুখ দিয়ে পবিত্র কালিমা উচ্চারিত হচ্ছে।

এভাবে তিনি সর্বত্রই ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এলেন। কেউই তাঁকে আশ্রয় দিল না। অনেকেই তাঁর সাথে বড়ই নির্মম আচরণ করল এবং দৃঢ়তার সাতে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল। যদি কোনো গোত্র তাঁর সাথে সদাচরণের ভাব দেখাতো এবং সহানুভূতি প্রকাশ করত তাহলে সাথে সাথে আবু লাহাবও সেখানে গিয়ে হাজির হয়ে তাদের বিরুদ্ধে মুহম্মদের (সাঃ) ভয় দেখিয়ে বলত– 'সে চায় যে, তোমরা 'লাত' ও 'উজ্জা' দেবতাকে ত্যাগ করো এবং তার বাজে কথার মধ্যে তোমরা ফেঁসে যাও। এ কথা তোমরা কখনোই শুনো না। তোমরা তার ধোকার মধ্যে পেড়ো না।'

আবু লাহাবের একথা শুনে লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করতে লাগল।

২

আস ও খাযরাজ নামে মদীনায় দুটি বিখ্যাত গোত্র ছিল। এ দু' গোত্রের মধ্যে এক যুগ ধরে শত্রুতা চলে আসছিল। মুহম্মদের (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির সময়ে এ বিরোধ তুঙ্গে অবস্থান করছিল তা বর্তমানে এক বিস্ফোরণোন্মুখ অবস্থায় এসে পৌঁছালো। এ বিরোধে নতুন মাত্রা যোগ করল ইহুদিরা। সেজন্য তাদের মধ্যে লড়াই লেগেই থাকত। কখনো বা আস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে, কখনো বা আস ও ইহুদিদের মধ্যে, কখনো বা খাযরাজ ও ইহুদিদের মধ্যে। কখনো বা আস, খাযরাজ ও ইহুদিদের মধ্যে এ লড়াই বেধে যেতো। এভাবে মদীনায় কারো না কারো সঙ্গে লড়াই লেগেই থাকত। এক যুদ্ধের আগুন নিভতে না নিভতেই আর এক যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠত।

ইহুদিরা সমাজে সবচেয়ে দুষ্কৃতকারী ও চক্রান্তকারী বলে পরিচিত ছিল। তারা চিন্তা করল যে, আস ও খাযরাজ গোত্র একসাথে মিলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আমাদের লোকেরা তাদের হাতে খুন হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সমস্ত সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে। মদীনার নেতা ছিলাম আমরা। এখন সে নেতৃত্বও যেতে বসেছে। এমতবস্থায় এমন চাল চালা উচিত যে, দুটি পক্ষের মধ্যে চিরশত্রুতা সৃষ্টি হয়। তারা একে অন্যের মধ্যে থেকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে যে, ভবিষ্যতে তারা আর কখনো মিলে-মিশে থাকবার নামও করবে না। তারা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-লড়াই করে নিঃশেষ হয়ে যাক, অথচ আমাদের গায়ে যেন আঁচড় না লাগে। ইহুদিদের এ পরিকল্পনা সফল হল। তারা যা চেয়েছিল তা-ই হল। আস ও খাযরাজ এখন থেকে আর একে অন্যকে সহ্য করতে পারে না। এখন তারা একটাই মাত্র লক্ষ্য স্থির করল যে, একে অন্যকে তারা নির্মূল করে দেবে। সামান্য বিরোধ থেকেই শুরু হতো রক্তক্ষয়ী লড়াই। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে চলত। তা থামবার কোনো লক্ষণ দেখা যেতো না।

পরিণামে অগণিত মানুষ নিহত হত, রক্তের বন্যা বয়ে যেতো, নিহতের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে কান্না আর শোকের কোনো সীমা পরিসীমা থাকত না। এভাবে চলতেই থাকত। মনে হতো যেন এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও হাঙ্গামা বোধ হয় আর কখনো শেষ হবে না।

ইহুদিদের চক্রান্ত কত গভীর ছিল। তারা পরাজিত পক্ষের বিরোধিতা করত আর বিজয়ী পক্ষের পিঠ চাপড়াত; যাতে দু'পক্ষই লড়াই করতে করতে দুর্বল হতেও দুর্বলতর হয়ে যায়, আর এরই ফাঁকে তাদের শক্তি বাড়তে বাড়তে তুঙ্গে উঠুক। এভাবে তারা দু'পক্ষের উপর তাদের আধিপত্য কায়েম রাখার চেষ্টা করত। তারপর তারা লাভজনক কাজগুলোর উপর নিজেদের আধিপত্য কায়েম করত। তারা ব্যবসা কেন্দ্রগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তার করত এবং সবচেয়ে কম লাভজনক ক্ষেত্রগুলোকে তাদের ছেড়ে দিত। তারা হযরত মূসার (আঃ) অনুসারী। তাদের কাছে ঐশী গ্রন্থ ও ঐশী আইন-কানুন মজুদ থাকত। আর আস ও খাযরাজ গোত্র ছিল মূর্তিপূজক। তাদের কাছে কোনো ঐশী গ্রন্থ ছিল না। এ কারণে ইহুদিদের খুব গর্ব ছিল। তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে তাদের লজ্জা দিত। তাদের সামনে তাদের আচার-আচরণের সমালোচনাও বড় নির্মমভাবে করত। তারা তাদের গ্রন্থ থেকে মুহম্মদ নামক একজন নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী শোনাত এবং বলত৷ 'একজন নবী আসবেন। তাঁর আগমন অতি নিকটবর্তী। তিনি এলেই তোমরা দেখো কীভাবে আমরা তোমাদের উড়িয়ে দিই। আমরা তাঁর সাথী হয়ে যাবো আর তোমরা আদ জাতির মতো বরবাদ ও ধ্বংস হয়ে যাবে।'

কিছুকাল যাবৎ মদীনায় এ অবস্থা অব্যাহত রইল। আস গোত্রের প্রতিনিধিদলের কুরাইশদের সহযোগী হিসেবে পাওয়ার জন্য মক্কায় আসার সময়ও এ অবস্থা চলছিল। সে সময়েই মহানবী মুহম্মদ (সাঃ) এর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি তাদের ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। আয়াস বিন মা'আজ সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করেন এবং অন্যান্য সঙ্গীসাথীরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। কেননা, সে সময়ে তারা যুদ্ধের নেশায় মত্ত ছিল। সে সময় অন্য কোনো দিকে মনোযোগ দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আস গোত্রের লোকেরা যদিও সে সময় ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তা সত্ত্বেও ঘরে ফেরার পরে তাদের মন-মগজে এর প্রভাব রয়ে গিয়েছিল এবং সে কথা তাদের মনে বার বার গুঞ্জরিত হয়ে উঠছিল। আস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে যুদ্ধের আগুন আবারো জ্বলে উঠল। এ যুদ্ধ এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত একটি জনবসতিই নির্মূল হতে চলেছিল; কিন্তু সে ফাঁকে ইহুদিরা আস গোত্রের সাথে একীভুত হয়ে গেল। এর ফলে আস গোত্রও যুদ্ধে জয়লাভ করল এবং যুদ্ধও থেমে গেল। এবার দু' গোত্রই পরস্পর

মুখোমুখি হয়ে নিজেদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। এরপর দুই বিধ্বস্ত পক্ষ অবশেষে অনুভব করল যে, এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে কেবলমাত্র তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অগণিত লোক ক্ষয় হয়েছে, প্রচুর সম্পদ ধ্বংস হয়েছে। সেই সাথে তাদের শক্তি বিনাশ হয়েছে। তাদের মান-মর্যাদা বিনষ্ট হয়েছে। তারা চূড়ান্তভাবে অনুধাবন করল যে, এর ফলে, তারা উভয়পক্ষই ইহুদিদের গোলাম হয়ে গেছে। বিজয়ী পক্ষও যেমন, পরাজিত পক্ষও তেমনই।

এ ভয়ংকর যুদ্ধটি আরবের ইতিহাসে 'বুয়াসের যুদ্ধ' নামে খ্যাত হয়ে আছে। যুদ্ধের ধ্বংস ও ক্ষয়ক্ষতির কথা আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

যুদ্ধের এ ভয়াবহ অবস্থা দেখে দু'পক্ষই চমকিত হয়ে ওঠে। দু'পক্ষই একত্রিত হয়ে শপথ করল যে, 'এবার থেকে আমরা পরস্পরের বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক বজায় রেখে চলব এবং দুঃসময়ে একে অন্যের সহযোগী হব।'

এ সন্ধি চুক্তির পর দু'পক্ষই সিদ্ধান্ত নিল যে, আস ও খাযরাজ গোত্রের নেতা হবেন একই ব্যক্তি। নেতা হিসেবে তারা আবদুল্লাহ্ বিন উবাইকে মনোনীত করল। এ ছিল খাযরাজ গোত্রের লোক। বিচার-বিবেচনা ও বুদ্ধিমত্তায় সে ছিল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এসব কিছুর বিবেচনায় সে-ই ছিল নেতা হওয়ার উপযুক্ত লোক। তা ছাড়া জনসাধারণের প্রতি তার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সবশেষে সবাই তাকে নেতা হিসেবে স্বীকার করে নিল। এবার তার অভিষেক হবার তারিখ নির্দিষ্ট হল। কিন্তু চলমান সময় ও পরিস্থিতি এ অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন করে দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসছিল। ফলে, তার অভিষেক আর সম্পন্ন হতে পারল না। কেননা, মানসম্মান, ইজ্জত-সম্ভ্রমের একমাত্র মালিক, একমাত্র অধিপতি সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মদীনার মানুষদের ভাগ্যলিপিতে অন্য কিছু লিখে রেখেছিলেন। তা পরিপূর্ণরূপে সম্পন্ন হওয়ার জন্য সেখানে অন্য ব্যক্তির নাম লেখা হয়ে গিয়েছিল। যিনি ছিলেন সর্বলোকের প্রিয়জন, মানবজাতি ও মানবসভ্যতার সবচেয়ে দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও অভিবাবক, যাঁর নাম ও ধ্যান সৃষ্টির অভ্যন্তরে সৃষ্টিকুলের মধ্যে চেতন-অবচেতনে উচ্চারিত হয়ে চলেছিল, তৌহিদ বা একেশ্বরবাদের পতাকা-উত্তোলনকারী মহামানব মহানবী মুহম্মদ মুস্তফা (সাঃ) জাতির ভাগ্যাকাশে মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তি নিয়ে উদিত হতে চলেছিলেন। সে জন্য সেখানে আর কারো প্রভাব-প্রতিপত্তি ও নেতৃত্বের সুযোগ ছিল না। মধ্যাহ্ন সূর্যের আলোক দীপ্তিতে তিনি অতি দ্রুত উদয় হচ্ছিলেন।

৩

নবুয়তের দশম বছরের কথা। 'বুয়াসের যুদ্ধ'-র পর পবিত্র মাসগুলোতে মক্কায় ধর্মপ্রাণ লোকদের আগমন শুরু হয়ে গেল। সে সময়ে মদীনা থেকে খাযরাজ গোত্রের চার ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশে মক্কার পথে রওয়ানা দিল। তাদের সাথে বনু নাজ্জার গোত্রের দু'ব্যক্তিও ছিলেন। সম্পর্কের দিক দিয়ে এঁরা ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের মামা সম্পর্কিত। সেই আবদুল মুত্তালিব যিনি মুহম্মদ (সাঃ)

এর দাদা ছিলেন। মক্কায় যাওয়ার পথে আকাবা নামক স্থানে মহানবীর (সাঃ) সাথে এদের সাক্ষাৎ হল। তাদের দেখেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ

'আপনারা কারা ? কোন গোত্রের লোক ? কোথা থেকে আসছেন ?'

তারা বলল ঃ 'আমরা খাযরাজ গোত্রের লোক। মদীনা থেকে আসছি।'

মহানবী (সাঃ) ঃ 'ইহুদিরা কী আপনাদের প্রতিবেশী ? মদীনার ইহুদিরা তো সেখানেই বাস করে!'

দল ঃ 'হাঁ, ইহুদিরা আমাদের প্রতিবেশী তারা সেখানেই বসবাস করে।'

মহানবী (সাঃ) ঃ 'সময় থাকে তো অনুগ্রহ করে একটু বসুন। আপনাদের সাথে মতবিনিময় করা যাক।'

দল ঃ 'হাঁ, হাঁ। কেন নয় ? আমরা আপনার সাথে কথা বলতে পারলে খুবই খুশি হব।'

তারা মহানবীর (সাঃ) কাছে বসে পড়ল। তিনি তাদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন। ইসলামের মর্মবাণী তিনি তাদের সামনে পেশ করলেন। কুরআন পাঠ করেও শোনালেন এবং বললেন– 'আমি আল্লাহর রসূল।'

তারা তাঁর কথা শুনে বিস্মিত হল। তাঁর কথায় তারা যারপরনাই প্রভাবিত হল। তারা বললঃ

'আল্লাহর কসম! ইনি সেই নবী যাঁর কথা উচ্চারণ করে ইহুদিরা আমাদের ধমক দেয়। আল্লাহর কসম! তারা ঈমান আনার ব্যাপারে আমাদের সাথে আর পাল্লা দিতে সাহস পাবে না।'

এ লোকেরা তৎক্ষণাৎ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে আশ্রয় নিল। মহানবী (সাঃ) তাদের সামনে যা কিছু উচ্চারণ করেছিলেন তা তাদের কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করল।

তারপর তারা বলল ঃ 'আল্লাহর রসূল! আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে যত অত্যাচার আর অনাচারের স্রোত বয়ে যাচ্ছে বোধ হয় দুনিয়ার আর কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে তেমন নেই। আল্লাহ চায় তো কেবলমাত্র আপনারই কল্যাণে আমাদের সমাজে সুখ-সমৃদ্ধি, শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের বাতাবরণ সৃষ্টি হতে পারে। কেননা, আপনার মতো সদালাপী ও সর্বজনমান্য ব্যক্তি আর কল্পনাও করা যায় না।'

ইসলাম গ্রহণের পর তারা শান্তস্নিগ্ধচিত্তে হজ্জ সমাপন করে যথারীতি মদীনায় স্ব-স্ব গৃহে ফিরে চলল। সেখানে পৌঁছেই প্রিয়নবীর (সাঃ) সুসংবাদ তাদের সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে দেয়ার চিন্তায় তাদের মনে আনন্দের লহর বয়ে যেতে লাগল। ইনি সেই নবী, যে নবীর কথা ইহুদিরা তাদের ধর্মগ্রন্থে পড়েছে। তারা এই নবীর কথাই বলে থাকে। সেখানে পৌঁছে তারা জানতে পারল যে, আস-রা সবার আগে এ সুসংবাদ মদীনাবাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছে। তারা

ত্রয়োদশ অধ্যায়

এবং ... মূর্তি চূর্ণ হল

— প্রিয়নবীর (সাঃ) স্বপ্ন

— মক্কাভিমুখে ইসলামী কাফেলা

— কুরাইশদের মধ্যে উন্মাদনা ও রোষ

— হুদাইবিয়ার ময়দানে মুসলমানরা

— প্রিয়নবীর (সাঃ) দরবারে কুরাইশ প্রতিনিধিদল

— গোত্রপতিদের অশ্রুসজল অবস্থা

— রাতের অন্ধকারে মুসলমানদের উপর হামলার চক্রান্ত

— হযরত উসমানের (রাঃ) হত্যার গুজব

— বাইয়াতে রেজওয়ান

— হুদাইবিয়ার সন্ধি

— কুরাইশ সেনাপতির (খালিদ বিন ওয়ালিদ) ইসলামে আগমন

— আরবের 'মস্তিষ্ক' (উমর বিন আস) ইসলামের ছায়াতলে

— ইসলামের নিরন্তর উন্নতি

— কুরাইশদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা

— ইসলামী বাহিনী ইসলামের জায়গায়।

সেখানে গিয়ে আরো দেখল যে, অগণিত মানুষ এ আলোর নবীর কাছ থেকে প্রচারিত ধর্ম গ্রহণের জন্য পরম উৎসাহে অপেক্ষা করছে। কী গভীর আগ্রহ ও আবেগে যে তারা আপ্লুত তা দেখে তার বিস্মিত হয়ে গেল।

পরবর্তী বছরে আস ও খাযরাজ গোত্রের বারো ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশে মক্কার পথে রওয়ানা দিল। আকাবা নামক স্থানে মহানবীর (সাঃ) সাথে তাদের সাক্ষাৎ হল। সেখানেই তারা মহানবীর কাছে পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করল এবং তাঁর সামনেই প্রতিজ্ঞা করল যে, 'আমরা আর কখনো কাউকেই আল্লাহ্র সাথে অংশী বলে স্বীকার করব না। চুরি-ডাকাতি ও অন্যায়–অপকর্ম থেকে আমরা দূরে থাকব। নিষ্পাপ সন্তানদের হত্যা করব না। কারো বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করব না।'

মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ 'যদি তোমরা তোমাদের প্রতিজ্ঞায় অটল থাকো তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের জান্নাত দান করবেন। আর যদি এর বিপরীত করো তাহলে তা আল্লাহ্র হাতে। তিনি চাইলে ক্ষমা করবেন, না চাইলে শাস্তি দেবেন।'

এ প্রতিজ্ঞা ইতিহাসে 'বাইয়াতে আকাবা-ই-উলা' বা আকাবার প্রথম প্রতিজ্ঞা নামে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। নবুয়তের একাদশ বর্ষে এ ঘটনা ঘটে।

এ ব্যক্তিদের মদীনায় ফিরে যাওয়ার পথে মহানবী তাদের সাথে মুসআব বিন উমাইর (রাঃ)কেও পাঠিয়ে দিলেন। যাতে তিনি মদীনাবসীদের কুরাআন পড়াতে পারেন। তিনি তাদের ইসলামের শিক্ষা ও জরুরী কথাবার্তাও বলে দিলেন যাতে তারা যথাযথভাবে অন্যদের শিক্ষা দিতে পারেন।

মদীনায় ইসলাম অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। লোকেরা প্রথম থেকেই সত্য ও আলোর পথের সন্ধানে ব্রতী ছিলেন। ইসলাম পাওয়ার সাথে সাথেই তাদের বহু যুগের পিপাসা নিবারিত হলো; বহু যুগের উদ্বেগ প্রশমিত হলো। এর পিছনে হযরত মুসআব (রাঃ) এর ত্যাগ ও প্রচেষ্টার অন্ত ছিলো না। লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছিল। সে সাথে মুসআব (রাঃ) গভীর আন্তরিকতা ও অনাবিল শান্তি ও স্বর্গীয় প্রেরণার মধ্য দিয়ে জনসাধারণকে ইসলাম শিক্ষা দিতে লাগলেন। কিছু লোক জাহেলি বা মূর্খতায় ডুবে থাকার কারণে ভ্রান্ত আভিজাত্যের বশে ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল কিন্তু তা বেশিদিন সম্ভব হল না। নতুন ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রবহমান শান্তির বাতাবরণ দেখে এবং পবিত্র কুরআনের আয়াত শুনে তাদের পাষাণপ্রতিম হৃদয় মোমের মতো গলে গেল। এসব লোকেরা শুধু ইসলাম গ্রহণই করল না; অন্যকেও ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে লাগল।

হযরত মুসআব মদীনাবাসীদের ইসলাম শিক্ষা দিতে লাগলেন। নামায পড়াতে লাগলেন এবং সেখানে ঘরে ঘরে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেয়ার কাজে

আত্মনিয়োগ করলেন। মদীনার অলিগলিতে পর্যন্ত ইসলামের চর্চা হতে লাগল। অবশ্য এর মধ্যেও কিছু হতভাগ্য ছিল যারা ইসলাম থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছিল। তারা তাদের পূর্বপরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে নতুন ধর্ম গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না।

মদীনাবাসীদের মঙ্গল হোক। এক বছরের মধ্যেই মদীনায় এত লোক ইসলাম গ্রহণ করল যে মক্কায় কয়েক বছর ধরে ইসলাম প্রচার সত্ত্বেও তাদের সংখ্যা এতটা হতে পারেনি।

মদীনার লোকেরা মুহম্মদ (সাঃ) এর নামের পতাকা উড়িয়ে দিল। সর্বত্রই তাঁর নাম ছড়িয়ে দিল। এ ঘটনা সে সময়েই ঘটল যে সময় মুহম্মদের স্বদেশবাসী তাঁকে দুনিয়ার বুক থেকে চিরতরে নির্মূল করে দেয়ার ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত ছিল। সে কারণে মক্কার মুসলমানদের হৃদয় মদীনাবাসীদের প্রতি ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে উঠল। তাদের প্রাণ খাঁচাবদ্ধ পাখির ন্যায় ছটফট করতে লাগল।

মহানবী (সাঃ)ও এরকম একটা অবস্থার কথা চিন্তা করে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তিনি আকাঙ্ক্ষা করছিলেন এমন কিছু নিবদিতপ্রাণকর্মী তাঁর সাথী হোক যাঁরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়ার জন্য সদা-সর্বদাই প্রস্তুত থাকে। তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তাদের ব্যবস্থাও করে দিলেন। তাঁরাই এবার মহানবীকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। সে নিবেদিতপ্রাণ মহান সন্তানেরা তাঁকে পাওয়ার আশায় অধীর আগ্রহে দিন গুণতে লাগলেন। মদীনা থেকে মহানবীর কাছে অনবরত সুসংবাদ আসতে লাগল। তা ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দ্যোতক।

মদীনাবাসীরা সমগ্র সত্তা দিয়ে ইসলামকে গ্রহণ করে নিয়েছিল। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, মহানবী (সাঃ)কে সর্বাবস্থাতেই তাঁরা সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন এবং সেইসাথে তাঁর পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করবেন। তারা মহানবীর জন্য সাহায্য-সহযোগিতাকে পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে বিবেচনা করতে রাগল। তারা কামনা করতে লাগল যে, মহানবীর ছত্রছায়ায় যেতে পারলে তারা কতটা সৌভাগ্য লাভ করবেন। তাই সবার উদ্দেশে তারা বললেন ঃ

'আল্লাহর রসূল মক্কায় খুবই কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করছেন। তিনি সাহায্যের জন্য বার বার আবেদন করছেন কিন্তু কেউ শুনছে না। এ লজ্জাজনক ব্যাপার আমরা আর কতদিন ধরে দেখতে থাকব ?'

তারপর তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন ঃ 'আগামী মওসূমে হজ্জ করতে মক্কায় গিয়েই আমরা মহানবীকে মদীনায় চলে আসার জন্য আহ্বান করব এবং তাঁকে আমরা সকল প্রকার সহযোগিতা ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেবো।'

হযরত মুসআব (রাঃ) মদীনা থেকে মক্কায় ফিরে এলেন। মহানবী (সাঃ) তাঁর কাছ থেকে মদীনার সমস্ত খবর অবগত হলেন। হজ্জের মওসূমে মদীনা থেকে বেশ বড় আকারের এক হজ্জ কাফেলা মক্কার উদ্দেশে রওনয়ানা দিল। এ কাফেলায় মুসলমান-অমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন। মুসলমানদের উদ্দেশ্য ছিল যে, তাঁরা মহানবীর (সাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁরা তাঁর জানমালের নিরাপত্তাসহ সমস্ত দায়দায়িত্ব গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেবেন। কিন্তু তাদের অমুসলমান সাথীরা এ ব্যাপারে সামান্য আঁচটুকুও পায়নি।

নবুয়তের দ্বাদশ বর্ষের কথা। কাবা প্রাঙ্গনে মহানবীর সাথে এ সব লোকদের সাক্ষাৎ হয়ে গেল এবং প্রতিশ্রুতি প্রদানের জন্য উপযুক্ত স্থানও নির্বাচন করা হল।

এক তৃতীয়াংশ রাত অতিক্রান্ত হয়ে গেল। বাইরের জগতের সমস্ত কোলাহল থেমে গেল। কুরাইশরা গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেল। বাইরে থেকে আগত হাজিরাও গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেলেন। ঠিক সে সময়ে মদীনা থেকে আগত মুসলমানরা চুপি চুপি উঠে এলেন। এ দলে তিয়াত্তর জন পুরুষ ও দু' জন মহিলা ছিলেন। এঁরা খুব গোপনে ধীর পদক্ষেপে সেখান থেকে যাত্রা করলেন। তাঁরা সেখান থেকে মক্কা শহরের নিকটবর্তী আকবা নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছালেন। সেখানে টিলা ও পাহাড়ের চাতালের উপরে বসে তাঁরা মহানবীর আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ বাদেই মহানবীও (সাঃ) এসে গেলেন। সাথে এলেন তাঁর চাচা আব্বাস। তিনি তখনো পর্যন্ত পূর্বপুরুষের ধর্মে আস্থাশীল ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছিলেন মহানবীর সহযোগী ও অভিভাবক। তিনি এসেছিলেন মদীনাবাসীরা মহানবীর (সাঃ) কাছে কী উদ্দেশ্যে এসেছে তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে। তিনি মদীনাবাসীদের উদ্দেশে বললেন ঃ 'খাযরাজ গোত্রের ভ্রাতৃবৃন্দ! মুহম্মদ আমাদের কতটা আপনজন এবং আমাদের হৃদয়ে কোথায় তার স্থান তা নিশ্চয়ই তোমরা জানো। শত্রুদের কবল থেকে আমরা তাকে রক্ষা করে চলেছি। আমরা সদা-সর্বদাই শত্রদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করে চলেছি। তোমরা শুনে রাখো, তিনি তাঁর মাতৃভূমিতে এখনো পর্যন্ত নিরাপদ। শত্রুদের কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা এখনো পর্যন্ত নেই। তা সত্ত্বেও তিনি তোমাদের ওখানে চলে যাওয়ার জন্য খুবই আগ্রহী। তিনি তোমাদের কাছেই থাকতে ইচ্ছুক। তোমাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শত্রুদের কবল থেকে তাঁকে রক্ষা করার সাহস যদি তোমাদের থাকে তাহলেই তোমরা আনন্দের সাথে তাঁকে নিয়ে যেতে পারো কিন্তু যদি তাঁর কোন ক্ষতি হয় তাহলে তোমরাই দায়ী থাকবে। তোমরা এখনো চিন্তা করে বলো, যদি প্রতিশ্রুতি পূরণে সমর্থ না হও তাহলে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করো। তিনি এখানে সসম্মানে অবস্থান করছেন। এখানে তাঁর কোন ভয় নেই।'

চাচা আব্বাসের কথা শেষ হওয়ার পর মদীনাবাসীরা বলল ঃ

'আমরা আপনার কথা শুনলাম। হে আল্লাহর রসূল! এখন আপনি কিছু বলুন। আপনি যা বলবেন আমরা তা শপথ করে মেনে নেবো।'

মহানবী পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত পড়লেন। তারপর বললেন ঃ 'যা দিয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানাদিদের রক্ষা কর, তাই দিয়ে কী তোমরা আমাকে রক্ষা করবে ? আমি শুধু এতটুকুই প্রতিশ্রুতি তোমাদের কাছ থেকে পাওয়ার আশা করি।'

মদীনাবাসীদের মধ্যে বরা (রাঃ) নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন মারুরের পুত্র। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। সবাই তাঁকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখত। তিনি অকস্মাৎ মহানবীর (সাঃ) প্রতি হাত বাড়ালেন এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রতিজ্ঞা করলেন ঃ

'হাঁ, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে মঙ্গলবার্তাসহ এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আমরা সমস্ত বিপদ ও অত্যাচারের কবল থেকে নিজেদের জীবনের বিনিময়ে হলেও আপনাকে রক্ষা করব। আল্লাহর রসূল! আমরা প্রতিজ্ঞা করছি। আল্লাহর শপথ। আমরা বড় যোদ্ধা। প্রয়োজনে আপনার পক্ষ থেকে আমরা যুদ্ধে জন্যও প্রস্তুত। শুধু আপনার হুকুমের অপেক্ষা। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানো আমাদের জন্য অতীব লজ্জার কারণ। প্রাণপণে যুদ্ধ করাই আমাদের বৈশিষ্ট্য।'

বরার (রাঃ) কথা শেষ হতে না হতেই ইতহানের পুত্র আবুল হাইসাম (রাঃ) উঠে দাঁড়ালেন কিছু বলার জন্য। তিনি মদীনার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। তিনি বললেন ঃ

'আল্লাহর রসূল! ইহুদিদের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক রয়েছে। আপনার সাথে প্রতিজ্ঞার পর এ সম্পর্ক ভেঙে যাবে। এটা কখনোই হবে না যে, আল্লাহ যখন আপনার বিজয় দান করবেন তখন আমরা আপনাকে ত্যাগ করে আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যাব।'

প্রিয়নবীর পবিত্র মুখে জান্নাতি হাসির রেখা ফুটে উটল। নীরবে মুচকি হেসে তিনি বললেন ঃ

'না। তোমাদের সাথে আমি রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত। আমার মর্যাদা তোমাদের মর্যাদা। আমার নিরাপত্তা তোমাদেরই নিরাপত্তা। তোমরা আমার এবং আমি তোমাদের। তোমরা যাকে ক্ষমা করবে আমিও তাকে ক্ষমা করব। যাদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ হবে তাদের সাথে আমারও যুদ্ধ হবে। তোমাদের সাথে যাদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে তাদের সাথে আমারও সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে।'

লোকেরা বাইয়াতের জন্য সামনে অগ্রসর হতেই তাঁদেরই মধ্য থেকে একজন সকলের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাইলেন। ইনি উবাদার পুত্র আব্বাস (রাঃ)। তিনি বললেন ঃ 'ভাইসব! এটা কী তোমাদের জানা আছে যে, তোমরা কী প্রতিজ্ঞা করতে চলেছো ?'

সাথে সাথে সম্মিলিত লোকসকল উত্তর করল ঃ 'হাঁ, জানা আছে।'

তখন তিনি আবার বলতে লাগলেন; 'শুনে রাখো। যাঁর হাতে হাত রেখে তোমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে যাচ্ছো, তাঁর হাতে বাইয়াত হওয়া আর সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া একই কথা। তোমরা যদি মনে করো, তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করা তোমাদের ধনসম্পদের জন্য বিপদস্বরূপ অথবা তোমাদের গোত্রের কোনো নেতা মারা গেলে তাঁকে ত্যাগ করবে তাহলে সময় নষ্ট না করে তাঁকে এ মুহূর্তে ত্যাগ করো। কিন্তু তোমরা যদি মুহম্মদের নেতৃত্বাধীন হওয়ার পর সমস্ত রকমের আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকো এবং সগোত্রীয় সরদারদের মৃত্যুর পরেও তোমরা তাঁর নেতৃত্বের প্রতি গভীর আস্থাশীল থাকো, তাহলেই আল্লাহর রসূলকে তোমরা মদীনায় নিয়ে চলো। ইহকাল ও পরকালে তাহলে তোমরা সমস্ত রকমের সাফল্য লাভ করবে।'

একথা শুনে সবাই এক বাক্যে বলল ঃ 'অর্থ সম্পদ ও গোত্রীয় নেতাদের মৃত্যু আমরা স্বীকার করতে রাজি আছি কিন্তু আল্লাহর রসূলকে ত্যাগ করতে আমরা রাজি নই। হে আল্লাহর রসূল! আমরা যদি আমাদের প্রতিজ্ঞায় অটল থাকি তাহলে তার বিনিময়ে আল্লাহ আমাদের কী পুরস্কার দেবেন ?'

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ 'জান্নাত।'

তখন সবাই একসাথে বলল ঃ 'আচ্ছা, আমরা প্রস্তুত। অনুগ্রহ করে হাত বাড়ানো হোক।'

প্রিয়নবী (সাঃ) হাত প্রসারিত করলেন এবং সমস্ত লোক সাথে সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন।

এ প্রতিজ্ঞাই ইতিহাসে 'বাইয়াতে আকাবা-ই-ছানিয়া' অর্থাৎ 'আকবার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা' নামে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এদিকে প্রতিজ্ঞা সমাপ্ত হল আর ওদিকে বিরাট এক চীৎকার ধ্বনিত হল। সাথে সাথে সমস্ত নীরবতা ও গাম্ভীর্য সে আওয়াজে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

'কুরাইশ ভাইসব! এই আস ও খাযরাজ গোত্র এক হয়ে তোমাদের সাথে যুদ্ধের পরিকল্পনা করছে। দেখো, মুহম্মদের (সাঃ) জন্য এরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার শপথ গ্রহণ করছে।'

এ শুধু আওয়াজ নয়; বরং তা ছিল এক বিপদসংকেত। কিন্তু তা মুসলমানদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে চ্যুত করতে পারল না। একথা শুনে কোনো রকমের চিন্তা ও ভয় তো দূরের কথা; বরং উবাদার পুত্র আব্বাস (রাঃ) বীরত্বপূর্ণ কণ্ঠে সকলের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ

'আল্লাহর রসূল! সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যনবী মনেনীত করে বিশ্ব-মানবের সত্য পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেছেন। যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে আগামী কালই আমরা মিনা আক্রমণ করি।'

প্রিয়নবী (সাঃ) বললেন ঃ 'এতে আমার অনুমতি নেই। তোমরা এখন তোমাদের শিবিরে চলে যাও।'

মুসলমানরা বিলম্ব না করেই যার সেই শিবিরে ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন। প্রভাত হতেই কুরাইশরা মদীনাবাসীদের শিবির অভিমুখে যাত্রা করল। সেখানে গিয়ে তারা তাদের যাচ্ছেতাই করে গালমন্দ করল এবং চোখ রাঙিয়ে বললঃ

'মদীনাবাসী! আল্লাহ সাক্ষী যে, প্রত্যেক গোত্রের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করি কিন্তু তোমাদের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু তোমরা এ সব কী পরিকল্পনা করছ ? তোমরা মুহম্মদকে (সাঃ) কেন মদীনায় নিয়ে যেতে চাচ্ছ ? তোমরা কী আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত চাচ্ছ ?'

মদীনার পৌত্তলিকরা রাত্রিকালীন প্রতিজ্ঞার কথা কিছুই জানত না। সেজন্য কুরাইশদের কথা শুনে তারা হতচকিত হয়ে গেল এবং শপথ করে করে তাদের বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করতে লাগল যে, মুহম্মদের (সাঃ) সাথে আমাদের কোনো কথাবার্তাই হয়নি!

মুসলমানরা এ ব্যাপারে কিছুই বলল না। কিন্তু চেষ্টা করতে লাগল যে, কোনো রকমে প্রসঙ্গ পরিবর্তন হোক। অন্য কথাবার্তা শুরু হোক। কুরাইশরা এ অবস্থা দেখে খুবই হতাশ হয়ে পড়ল। অবশেষে তারা ফিরে গেল, কিন্তু দুশ্চিন্তা তাদের মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রইল। বারবার চিন্তা করতে লাগল-- 'রাত্রে কী সত্যিই এরকম কোনো ঘটনা ঘটেছিল ? সংবাদদাতা কী আমাদের সঠিক খবর দেয়নি ? মদীনাবাসীরা কী মিথ্যা বলছে ? অথবা এ খবর মিথ্যা আর মদীনাবাসীদের কথা সত্য ?'

তারা প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য তদন্ত শুরু করে দিল। শুধু তাই নয়, এর পিছনে তারা সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করল।

ওদিকে মদীনাবাসীরা অতি দ্রুত তাদের সমস্ত মালপত্র গুছিয়ে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা দিলেন যাতে কুরাইশরা তাদের আর কোনো খবর না পায়। তাহলে যে প্রাণ বাঁচিয়ে মদীনায় ফেরা কঠিন হয়ে পড়বে!!

৪

আনসারদের[১] ধারণা সঠিক বলে প্রতীয়মান হল। কুরাইশরা অনতিবিলম্বেই সমস্ত খবর জেনে ফেলল। এমন কী রাতের সমস্ত তথ্যই তারা অবগত হয়ে গেল। এ খবর জানার পরই তাদের হুঁশ ফিরল। ক্রোধে তারা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। বিলম্ব না করেই তারা আনসারদের পিছু ধাওয়া করল যাতে তারা পালিয়ে যেতে না পারেন।

১. আনসার-- নসীর শব্দের বহুবচন; যার অর্থ সহায়ক এবং সাহায্যকারী। ইসলামী পরিভাষায় 'আনসার' তাদের বলা হয় যারা প্রিয়নবী ও তাঁর অনুসারীদের সর্বপ্রকার সাহায্য করেছিলেন, যারা মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন।

কিন্তু তারা নিরাশ হয়ে পড়ল। আনসারদের কোনো সন্ধানও পাওয়া গেল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এক আনসারীকে[২] ধরে ফেলতে সক্ষম হয়। তিনি ছিলে উবাদার পুত্র সা'দ (রাঃ)। তাদের সমস্ত ক্রোধ গিয়ে পতিত হল তাঁর উপর। তাঁকে তার অমানুষিক নির্যাতন করল। হাত পা বেঁধে মারতে মারতে টেনে হেঁচড়ে তাঁকে মক্কায় নিয়ে গেল। সেখানে পৌঁছে তারা তাঁকে সমানে নির্যাতন চালাতে লাগল।

হারিস ও জুবাইর নামে মক্কায় দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা ছিলেন সওদাগর। সেজন্য তাঁরা সিরিয়াতে বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে যেতেন। চলার পথে মদীনায়

আশ্রয় দিতেন এবং সওদাগরী মাল-সম্পদ লুটেরাদের কবল থেকে বাঁচিয়ে দিতেন। উপকারের বদলায় তাঁরা সা'দকে (রাঃ) মুক্ত করে আশ্রয় দিলেন। এর ফলে, কোনক্রমে তিনি প্রাণে রক্ষা পেয়ে গেলেন।

কুরাইশরা একের পর এক সভা সমাবেশ করে চলল। সকলেই মাথায় হাত দিয়ে বসে চিন্তা ও পরামর্শ করতে লাগল মুহম্মদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। কীভাবে তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়া যায় ?

এখনও পর্যন্ত তো মুহম্মদ (সাঃ) আমাদের মধ্যেই অবস্থান করছেন কিন্তু আমরা তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নিতে পারলাম না; বরং উল্টো আমাদের উপর হুমকি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এখন তাকে আর কী করা যাবে ? এখন মদীনার প্রধান দু' গোত্র আস ও খাযরাজ তাকে সর্বপ্রকার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এখন উপায় ?

আমাদের উপর কী মুহম্মদের আধিপত্য কায়েম হয়ে যাবে ? তাঁর ধর্ম তো মদীনায় ছড়িয়ে পড়েছে, এখন কী অন্যান্য গোত্রেও ছড়িয়ে পড়বে ? আর এভাবে মুহম্মদ আমাদের নির্মূল করে দেবে। আমাদের প্রিয় নগরকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করবে। আমাদের সমস্ত দেবদেবীকে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে। যে মূর্তিগুলোকে রক্ষার জন্য আমরা যুগ যুগ ধরে প্রাণপণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি, মুহম্মদ তাদের ধ্বংস করে দেবে ?

দিনের পর দিন ধরে কুরাইশদের সভাসমাবেশ হতে লাগল কিন্তু সব নিষ্ফল...। এ সমস্যা সমাধানে তারা গলদঘর্ম হয়ে পড়তে লাগল কিন্তু...অবস্থার কোনই পরিবর্তন দেখা গেল না।

এদিকে মদীনার মুসলমানরা এক নয়া জীবনের আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে পরম শান্তিতে দিন অতিবাহিত করতে লাগল। মক্কার প্রতিজ্ঞা তাঁদের সমস্ত জীবনধারাকেই বদলে দিয়েছিল। তাদের জীবনে বয়ে গিয়েছিল পরম শান্তির

---

২. *আনসারি– আনসারদের দুঃখবেদনায় অংশগ্রহণকারীদের আনসারি বলা হয়।*

সুবাতাস। ঈমানী চেতনার কারণে তাদের মধ্যেকার সমস্ত অশান্তি দূরিভূত হয়ে গিয়ে তাদের জীবনে স্বর্গীয় প্রশান্তির বাতাস প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। তাদের আত্মা বিকশিত হয়ে উঠছিল আর আকাঙ্ক্ষা সফল হতে চলেছিল। তাঁরা এখন ইসলামের সত্য ও শান্তির পথের নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক। তাঁরা সর্বত্রই ইসলামের আওয়াজ তুলতে লাগলেন আর পরিচিত-অপরিচিত জনকে ইসলামে আহ্বান জানাতে লাগলেন।

এভাবে মদীনায় এমন একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে গেল যে, মহানবী (সাঃ) মদীনাবাসীদের কাছে যেন চোখের মণির মতো প্রতিভাত হয়ে উঠলেন।

সে জন্য মহানবী (সাঃ) ও তাঁর নিবেদিতপ্রাণ অনুচরদের গ্রহণ করার জন্য সমগ্র মদীনা নগর অধীর আগ্রহে দিন গুনতে লাগল। এর পর ? এরপর এক নতুন যুগের সূচনা হবে।

আল্লাহর আদেশ এসে গেল। মহানবী সমস্ত মুসলমানকে হিজরত করার অনুমতি দিতে গিয়ে বললেন ঃ 'তোমরা খুবই সাবধানতার সাথে মদীনা অভিমুখে যাত্রা কর এবং এক-এক দুজন-দুজন করে এখান থেকে চলে যেতে থাকো। তোমরা কাফেলার মতো দলবদ্ধ হয়ে যাত্রা করো না। তাহলে তোমরা কুরাইশদের নজরে পড়ে যাবে। তাতে সমূহ ক্ষতি। তার ফলে তারা তোমাদের উদ্দেশ্য জেনে ফেলবে।'

অনেক মুসলমান কুরাইশদের অগোচরে একে একে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেল। কুরাইশরা তার লেশমাত্রও জানতে পারল না। কিন্তু এ কথা আর কতদিনই বা গোপন থাকে ? অবশেষে তারা তা জেনে ফেলল এবং পুরো ব্যাপারটাই বুঝতে পারল। তারা আরো ক্রোধান্ধ হয়ে উঠল এবং প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল তাদের মধ্যে। তারা এবার আদাজল খেয়ে মুসলমানদের পিছনে লেগে পড়ল। তারা দিন রাত মুসলমানদের পিছনে লেগে থাকল যাতে তারা মক্কা ছেড়ে মদীনায় পালিয়ে যেতে না পারে। এভাবে তারা মুসলমানদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য তাদের পিছনে অনবরত লেগে রইল।

হজরত উমরের (রাঃ) হিজরত এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। তাঁর সঙ্গে আরো দু' ব্যক্তি বাকি রয়ে গেলেন। একজন রবীআ'র পুত্র আইয়াশ (রাঃ) এবং অন্যজন আস-এর পুত্র হিশাম (রাঃ)। এরা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে মক্কা থেকে বেরিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় মিলিত হবেন। যদি কেউ না আসতে পারে তাহলে বুঝতে হবে যে, সে কুরাইশদের হাতে ধরা পড়ে গেছে। তারপর পুনরায় যাত্রা শুরু হবে।

নির্দিষ্ট স্থানে উমর (রাঃ) ও আইয়াশ (রাঃ) পৌঁছে গেলেন, কিন্তু হিশাম এলেন না। দু'জনে বুঝতে পারলেন যে, হিশাম (রাঃ) পৌত্তলিকদের হাতে ধরা পড়ে গেছে। অবশেষে তাঁরা দু'জনে মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা দিলেন।

বাস্তবিকই হিশাম (রাঃ) পৌত্তলিকদের হাতে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর এখন জীবন সংকট দেখা দিল। পৌত্তলিকরা তাঁর উপরে সমস্ত রকমের ক্রোধ নিবারণ করল। তাঁর উপরে এত অত্যাচার তার করতে লাগল যে, নিজের ধর্ম-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা তাঁর জন্য সুকঠিন হয়ে পড়ল।

কুরাইশদের ক্রোধ নিবারিত হল না। দিনরাত ধরে তাদের শুধু একটাই লক্ষ্য– হিজরতকারীদের পাওয়ামাত্রই তাদের উপর নির্মমভাবে অত্যাচার করো। পাওয়ামাত্রই তাদের উপর এত নির্মম অত্যাচার চালাল যে, এর ফলে বহু মুসলমান প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারল না। এভাবে অগণিত নারী যেমন বিধবা হল তেমনি পিতৃহীন ও এতিম হল বহু অসহায় শিশু।

এরপরেও কুরাইশরা শান্ত হল না। তারা লক্ষ স্থির করল মুহম্মদের উপর। তারা নিজেরা ভাবতে লাগল এবং অন্যদেরও বলতে লাগল ঃ 'এর সবকিছুর মূলেই ঐ একজন– মুহম্মদ (সাঃ)। মুহম্মদই তাঁর অনুচরদের মদীনায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু...তিনি নিজেও কী....চলে যাবেন ?'

হাবশায় হিজরতের সময়ে তো তাঁর অনুচররা চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে তো মক্কাতেই রয়ে গিয়েছিলেন।

এই একটাই প্রশ্ন কুরাইশদের মন-মস্তিষ্ক ও সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রইল। এই একটা কথাই তাদের মধ্যে ঘুরে-ফিরে আসতে লাগল। কিন্তু এর পরিণাম কী হবে তা তারা জানত না।

এ বিষয়টি শুধু কুরাইশদের আলাপালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। শুধু তাই নয় তারা এই একটাই প্রশ্নে সর্বদাই অস্থির হয়ে রইল। তারা নিরন্তর চিন্তা করতে লাগল যে, মুহম্মদের (সাঃ) মোকাবিলায় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় ? তাঁর বিরুদ্ধে কী কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া যায় ? মুহম্মদ যেন কোন অবস্থাতেই তাঁর অনুচরদের মতো গোপনে পালিয়ে যেতে না পারেন। এ কাজে তিনি সমর্থ হলে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। কারণ, সমগ্র মদীনাব্যাপী তাঁর নেতৃত্ব ও জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছে। আর জীবনপণ লড়াইয়ের জন্য তাঁর অসংখ্য অনুচর সর্বদাই প্রস্তুত। তারা তারই আগমন ও অনুমতির অপেক্ষায় দিন গুণছে। সমস্ত মুসলমান একত্রিত হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে তারা আমাদের উপর আক্রমণ হেনে আমাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে দেবে।

মুসলমানদের উপর কুরাইশরা কড়া নজর রেখেছিল। তারা সর্বক্ষণ লক্ষ রাখত যেন তারা পালিয়ে যেতে না পারে। কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। মুসলমানদের উপর অনবরত নির্যাতনের ফলে সমগ্র মক্কা নগরী মুসলমানশূন্য হয়ে পড়ল। একে একে সমস্ত মুসলমান মদীনায় চলে গেলেন। হামজা (রাঃ), উসমান (রাঃ), জুবাইর বিন আওয়াম–সবাই চলে গেলেন। যিনি

যেতেন তিনি কারো না কারো উপর নিজের ধন-সম্পদের দায়িত্ব দিয়ে যেতেন। বাকী রয়ে গেলেন মহানবী মুহম্মদ (সাঃ), হজরত আলী (রাঃ) ও হজরত আবুবকর (রাঃ)–আর সেই সাথে রয়ে গেলেন কিছু হতভাগ্য মুসলমান নরনারী— পৌত্তলিকরা যাদের মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে যাওয়ার আগেই ধরে ফেলেছিল। পৌত্তলিকরা তাদের উপর অকথ্য জুলুম ও নির্যাতন চালিয়ে যেতে লাগল।

সবশেষে, আবুবকর (রাঃ) প্রিয়নবী মুহম্মদের (সাঃ) কাছে হিজরতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ 'ব্যস্ত হয়ো না। সম্ভবত অনতিবিলম্বেই আল্লাহ তোমাকে কোনো সাথী দিয়ে দেবেন।'

আবুবকর (রাঃ) বুঝতে পারলেন যে, এ মহানবীরই (সাঃ) নিজেরই হিজরতের ইঙ্গিত। এখন তিনি শুধুমাত্র আল্লাহর আদেশেরই অপেক্ষায় দিন গুণছেন। তিনি আনন্দিত চিত্তে ঘরে ফিরে এসে সফরের জন্য প্রস্তুতি শুরু করলেন।

নবম অধ্যায়

বিদায় মাতৃভূমি

— প্রিয়নবীর (সাঃ) হিজরতের আদেশ

— এক চক্রান্তী সম্মেলন

— পবিত্র রক্তে হাত রঞ্জিত করার অপবিত্র পরিকল্পনা

— গৃহ অবরোধ

— কুরাইশদের আমানতদার-এর দৃষ্টান্তহীন আমানতদারী

— সওর গুহায় আশ্রয়

— কুরাইশদের বিভ্রান্তি

— তাঁকে (সাঃ) খুঁজে বের করার ব্যর্থ প্রয়াস

— মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা

— কুরাইশদের নিরাশা ও গ্লানি

— সুরাকার চোখ খুলে গেল

— হযরত আলীর (রাঃ) বিকল্প আকাঙ্ক্ষা

—কবায় উপস্থিতি

— মদীনায় প্রিয়নবীর জন্য প্রতীক্ষা

— মদীনার অলি-গলির অভূতপূর্ব দৃশ্য অবলোকন

— আনসার ও মুহাজিরদের ভ্রাতৃত্ব

—ইহুদিদের সন্ধিভঙ্গের প্রয়াস।

নবম অধ্যায়
বিদায় মাতৃভূমি

হিজরতের আদেশ অবতীর্ণ হল। এ প্রসঙ্গে সর্বশক্তিমান আল্লাহ মহানবী মুহম্মদকে (সাঃ) একটি দোয়াও শিখিয়ে দিলেন যেন হিজরতের সময় এ দোয়া পাঠ করা হয়। কত সুন্দর এ দোয়া—

'আর দোয়া কর, হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে যেখানেই নিয়ে যাও সততা ও পবিত্রতার সাথে নিয়ে চলো এবং যখনই কোনো স্থান ত্যাগ করি সততা ও পরিত্রতার সাথে তা করাও এবং আমাকে সকল প্রকার সাহায্য দান অব্যাহত রাখো।' –আল কুরআন, বনী ইস্রাঈল।

মুসলমানদের উপরে পৌত্তলিকদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তারা পূর্ণরূপে মহানবীর (সাঃ) নেতৃত্বাধীনে এসে গিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি তাঁদের মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদীনায় চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন যাতে পৌত্তলিকদের সীমাহীন অত্যাচারের কবল থেকে তারা মুক্তি পেতে পারে। ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের উপর অনবরত যে আঘাত আসছে, তা থেকে তারা মুক্ত থাকতে পারে। এরপর মুসলমানরা গোপনে গোপনে মদীনায় চলে গেলেন, কিন্তু কিছু লোক কুরাইশদের নজর এড়িয়ে মদীনায় চলে যেতে পারল না। ফলে, তাদের উপর সীমাহীন জুলুম-অত্যাচার চালাল যাতে তারা এ নির্যাতনের মুখে ইসলাম ত্যাগ করে পুনরায় পূর্বপুরুষের ধর্মে ফিরে আসে আর মুহম্মদের (সাঃ) নাম পর্যন্ত যেন মুখে না আনে।

স্বয়ং প্রিয়নবী মুহম্মদও (সাঃ) যিনি জালিমদের মূল লক্ষ্য ছিলেন, তিনি আল্লাহর হুকুমের জন্য অপেক্ষমাণ রইলেন। আল্লাহর হুকুম এলেই তিনি মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় গিয়ে তাঁর অনুচরদের সাথে মিলিত হবেন। সেই সাচ্চা অনুচরগণ–যাঁরা আল্লাহর পথে মাতৃভূমি ত্যাগ করেছিলেন। সেই সাচ্চা অনুচরগণ–যারা আনসারদের সাথে মিলিত হবার কামনায় নিজেদের ধনসম্পদ ও বিবি-বাচ্চাদেরও ক্ষতির কোনো পরোয়া করেননি। সেই আনসার কারা ছিলেন? সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ যাঁরা মহানবীকে সাহায্য করেছিলেন, মহানবীর সুরক্ষা ও সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং মহানবীর (সাঃ) পবিত্র হাতে হাত রেখে আল্লাহর পথে আত্মোৎসর্গ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন। আল্লাহ মুহাজিরদের (শরণার্থীদের) মঙ্গল করুন। তাঁরা কেবলমাত্র আল্লাহর পথে আল্লাহর জন্য সমস্ত কিছুই ত্যাগ করেছিলেন। ধৈর্য ও সহনশীলতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। আল্লাহ আনসারদেরও মঙ্গল করুন আর তাঁদের উপযুক্ত পুরস্কারে সম্মানিত করুন। যারা তাঁদের মুসলমান ভাইদের মদীনায়

আহ্বান করলেন, নিজেদের ঘরে আশ্রয় দিলেন তা কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য!!

প্রিয়নবী মুহম্মদের (সাঃ) হিজরতের হুকুমও এসে গেল। তিনি মদীনায় চলে যাওয়ার জন্য মনস্থির করলেন। সে সময়ে কুরাইশদের চক্রান্তের নীলনক্সাও পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল। বাস্তবিকই এ হিজরত মুসলমানদের জন্য এক বিরাট সুফল বয়ে নিয়ে এলো। ইসলামের প্রচারের জন্য বিরাট একটা এলাকা হাত এসে গেল। জনসাধারণ ইসলামের শান্তিপূর্ণ পবিত্র জীবনযাত্রা দেখে যারপরনাই প্রভাবিত হল এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। সর্বত্রই ইসলামের চর্চা হতে লাগল। মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি হতে লাগল। তা দেখে কুরাইশরা খুবই ভেঙে পড়ল। তারা অনুভব করল যে, মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে অতি দ্রুত তাদের অস্তিত্বের সংকট ঘনিয়ে আসছে। কুরাইশ ও আনসারদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধের আশঙ্কা ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগল। এর ফলে তারা একতাবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করতে লাগল। তারা আশঙ্কা করল যে, এর ফলে বাণিজ্য ব্যাপদেশে তাদের সিরিয়ায় যাওয়াও বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে। তা আমাদের রুজি-রোজগারের সমস্যাও বাড়িয়ে দেবে বহুগুণে। অবশেষে, নিরুপায় হয়ে তারা একদিন তাদের মন্ত্রণাগৃহ 'দারুননাবা'য় একত্রিত হয়ে এ সংকটের অবসানের জন্য শলা-পরামর্শ শুরু করে দিল। তারা ইসলামের অগ্রগতি রোধের জন্য প্রস্তাব দিল যে, ইসলামের প্রচার-প্রসার এমনভাবে রোধ করতে হবে যাতে তার নাম নেয়ার মতো লোক আর অবশিষ্ট না থাকে। এ প্রসঙ্গে লোকেরা নানাভাবে তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করতে লাগল।

এক ব্যক্তি বলল ঃ 'মুহম্মদের (সাঃ) হাত পা শিকল দিয়ে বেঁধে এক বদ্ধ ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে তালাবন্ধ করে দেয়া হোক।'

অন্য এক ব্যক্তি বলল ঃ 'আল্লাহর কসম! মুহম্মদকে এভাবে বন্দী করলে সর্বত্রই এ নিয়ে নিন্দা ও সমালোচনার ঝড় বয়ে যাবে। তা হবে এক খারাপ দৃষ্টান্ত। মুসলমানরা বিলম্ব না করেই আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে মুক্ত করে ফেলবে। তা আমাদের জন্য বিরাট এক বিপদ বয়ে নিয়ে আসবে।'

তৃতীয় ব্যক্তি বলল ঃ 'মুহম্মদকে এখানে থাকতে দেয়া ঠিক নয়। তাকে ধরে দুর্গম এক এলাকায় গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসা হোক। সেখান থেকে সে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই চলে যাক।'

চতুর্থ ব্যক্তি বলল ঃ 'এ প্রস্তাবও গ্রহণযোগ্য নয়। সবাই জানে তিনি কী রকম মিষ্টি ভাষায় মনোহর বাচনভঙ্গীতে কথা বলেন। মুহূর্তের মধ্যেই তিনি মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেন। এটা আরো বিপজ্জনক ব্যাপার। এভাবে তাঁকে

ছেড়ে দিলে তিনি অন্যান্য লোকালয়ে চলে যাবেন। সেখানে তাঁর যাদুকরী বাচনভঙ্গীতে কথা বলে অতি দ্রুত তাদের নিজের সাথী বানিয়ে ফেলবেন। তারপর মদীনায় পৌঁছে যাবেন। আর তাঁর মদীনায় পৌঁছানোটা হবে আরো বিপজ্জনক ব্যাপার। সেখানে পৌঁছাতে পারলেই তাঁর অনুচরদের নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে আমাদের পিষে ছেড়ে দেবেন।'

একথা শুনে সবার মধ্যে দুশ্চিন্তা ও চঞ্চলতার আভাস দেখা গেল। হয়রান হয়ে সবাই একবাক্যে বলে উঠল ঃ 'তাহলে আমরা কী করব ?'

এবার আবু জেহেল দাঁড়িয়ে বলল ঃ 'একটা কৌশল আছে, যা আজ পর্যন্ত কেউ ভাবেনি।'

সবাই উদ্বিগ্ন চিত্তে বলল ঃ 'আবুল হাকাম, কী সে কৌশল ?'

আবু জেহেল বলল ঃ 'আমার প্রস্তাব প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে বীর যুবককে নির্বাচন করে তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে ধারালো তরবারি তুলে দেয়া হোক। তারা সম্মিলিতভাবে মুহম্মদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। এর ফলে আমরা সবাই স্বস্তি পাব। এভাবে হত্যা করার ফলে হত্যার দায় সমস্ত গোত্রের উপরে বর্তাবে। ওদিকে হাশিম ও তার বংশের সাথে সম্পর্কিত গোত্রগুলি সম্মিলিতভাবে আমাদের উপর প্রতিশোধ নিতে সমর্থ হবে না। তখন বাধ্য হয়ে তারা রক্তপণ বা অর্থদণ্ড দ্বারা এ ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বাধ্য হবে। তখন আমরা তার হত্যার বিনিময়ে একশত উট ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেবো। ফলে, সব ঝামেলা চুকে যাবে।'

এ প্রস্তাব সকলের মনঃপূত হল। খুশিতে সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সকলেই আবু জেহেলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললঃ 'আবুল হাকাম। এ একটা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত।'

সভা সমাপ্ত হল। সবাই খুশি। খুশিতে ডগমগ হয়ে তারা ভাবতে লাগল, ধরলাম, মুহম্মদ নিহত হয়েছে। তার ধর্মও নির্মূল হয়েছে। মানুষের মন থেকে মুহম্মদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে গেছে। তার প্রচারিত ধর্ম এক আজগুবি জীবনবাদ রূপে দুনিয়া থেকে একেবারে মুছে গিয়েছে এবং মুহম্মদের স্মৃতি মানুষের মন থেকে চিরতরে মুছে গিয়েছে। এরকম নানাবিধ চিন্তা করতে করতে তারা মুহম্মদকে হত্যা করার জন্য প্রত্যেক গোত্র থেকে এক একজন বীর যুবকের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। সেই সাথে উপযুক্ত অস্ত্রেরও ব্যবস্থা করতে লাগল যে অস্ত্র দিয়ে মুহম্মদকে টুকরো টুকরো করা হবে।

'আর সেই সময়ের কথা স্মরণ কর যে সময় বিধর্মীরা তোমার ব্যাপারে পরামর্শ করছিল যে তোমাকে বন্দী করা হবে বা হত্যা করা হবে অথবা দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে। তারা ঐ পরামর্শ করছিল আর আল্লাহ তাঁর নিজের তদবীর করছিলেন আর আল্লাহ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ তদবীরকারী।' —আল-কুরআন।

পৌত্তলিকরা মহানবীকে (সাঃ) হত্যার পরিকল্পনা নিল। সে কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে কোমর বেঁধে নেমে পড়ল। কেননা, এ হত্যার দায় সমস্ত গোত্রের উপরেই বর্তাবে। প্রত্যেক গোত্রেরই এতে অংশ গ্রহণ করা ছিল আবশ্যিক। যেহেতু প্রত্যেক গোত্রই এতে অংশগ্রহণ করছিলেন সেহেতু হাশিম-গোত্রের একার পক্ষে এর বদলা নেয়া সম্ভবপর ছিল না। ওদিকে আল্লাহর ফায়সালা ছিল যে, তাঁর উপর যেন সামান্যতমও আঁচড় না লাগে। আল্লাহ তাঁকে (সাঃ) সাহায্য করলেন এবং পরিপূর্ণরূপে তাঁর দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করলেন।

২

সেই ভয়ানক রাত এসে গেল, যে রাতে পৌত্তলিকরা মুহম্মদকে হত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। তারা মহানবীর (সাঃ) গৃহকে ঘিরে ফেলল। তাদের হাতে ধারালো তলোয়ার মুহম্মদের রক্ত পান করার জন্য লকলক করছে। আরব দেশে যে ঘরে মানুষ সপরিবারে বাস করে সে ঘরে বাইরের লোক প্রবেশ করা এক জঘন্য অপরাধ বলে বিবেচিত হত। সে জন্য তারা মহানবীর গৃহে প্রবেশ না করে তারা গৃহটিকে সারা রাত ধরে ঘিরে রাখল। তাদের ইচ্ছা মহানবী (সাঃ) বাড়ি থেকে বেরুলেই তাঁকে টুকরো টুকরো করবে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ পৌত্তলিকদের এ চক্রান্তের খবর মহানবীকে (সাঃ) জানিয়ে দিলেন। হজরত আলী নবীগৃহেই থাকতেন। মহানবী (সাঃ) তাঁকে বললেন– 'আমার উপরে হিজরতের আদেশ এসে গেছে। শত্রুরা আমাকে হত্যা করার জন্য আমার বাড়ি ঘিরে রেখেছে।'

তারপর বললেন ঃ 'আলি! আজ আমি মদীনায় চলে যাবো। তুমি আমার বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়। আল্লাহ চাহে তো কোন অসুবিধা হবে না। সকালে গিয়ে আমার কাছে রক্ষিত আমানত সবাইকে পরিশোধ করে দিয়ো। তারপর তুমি মদীনায় চলে এসো।'

কুরাইশরা মহানবীর (সাঃ) চিরশত্রু হওয়া সত্ত্বেও তাদের কাছে মুহম্মদ (সাঃ) ছিলেন পূত-চরিত্রের এক মহান মানুষ, চিরবিশ্বস্ত ও আমানতদার। সে জন্য তারা তাঁকে 'আল-আমীন' নামে অভিহিত করত। কারো কোনো সম্পদ আমানত রাখার প্রয়োজন হলেই তা তারা মুহম্মদের (সাঃ) কাছেই রাখত। এরকম বহু জন তাদের সম্পদ মহানবীর (সাঃ) কাছে আমানত রেখেছিল। সে কারণে তাঁর কাছে সংরক্ষিত সম্পদ তার মালিকদের যথাযথভাবে ফেরত দেয়ার জন্য প্রিয়পাত্র আলীকে (রাঃ) মক্কায় রেখে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলেন।

সম্ভবত সমগ্র পৃথিবী ও আকাশ এমন আশ্চর্য দৃশ্য আর কখনো দেখেনি। একদিকে তাঁর রক্তপিপাসু শত্রুর দল– তাদের হাতে তীক্ষ্ণধার তলোয়ার তাঁর রক্তপানের জন্য উদ্যত অন্যদিকে তিনিই (সাঃ) তাদের চোখে পরম সত্যবাদী

'আল-আমীন' আর বিশ্বস্ত আমানতরক্ষক!! যারা তাঁর শত্রু তারাই পরম নিশ্চিন্তে তাঁর কাছে তাদের সম্পদ গচ্ছিত রাখে। এরকম প্রচুর সম্পদ তাঁর কাছে সুরক্ষিত ছিল। এ আমানতের ধন বা গচ্ছিত সম্পদ কাদের ? তাদের, যারা তাঁকে হত্যা করার জন্য হায়েনার মতো পাহারা দিচ্ছে। অথচ তিনি চাইলে তাদের সমস্ত সম্পদ গায়েব করে দিতে পারেন আর দিলেও সেই শত্রুদের কিছু করারও থাকবে না। আর সে সময়ে তিনি শূন্য হস্তও; কিন্তু না, তিনি আল-আমীন, সত্যবাদী, সর্বশ্রেষ্ঠ সংরক্ষক এবং মানবজাতির চিরকালের চিরকল্যাণকামী অভিভাবক। তা থেকে তিনি এক কানাকড়ি পর্যন্তও গ্রহণ করতে পারেন না। আর হাঁ, কেবলমাত্র তাঁর চিরন্তন সততা রক্ষা করার জন্য সে আমানত তাদের হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে দায়মুক্ত করার জন্য প্রিয়তম ভ্রাতা আলিকে (রাঃ) সে শত্রুদের কাছেই রেখে গিয়েছেন; বরং বলা উচিত শত্রুদের কাছে বিপদের মুখে রেখে গিয়েছেন। তার কারণ একটাই, জালেমের আমানত জালেমদের বুঝিয়ে দেয়ার জন্যই।

হজরত আলী (রাঃ) বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মহানবীকে (সাঃ) বিদায় দিলেন আর কামনা করলেন যেন সহী সালামতে মদীনায় তিনি পৌঁছে যেতে পারেন। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় অত্যন্ত ভারাক্রান্ত কণ্ঠে দু'জনেই বললেন ঃ 'আল্লাহ চাইলে আবার আমাদের মদীনায় দেখা হবে।'

হজরত আলি (রাঃ) মহানবীর (সাঃ) বিছানায় তাঁর সবুজ চাদরটি গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। রাত গভীর হয়ে গিয়েছিল। শত্রুরা উদ্বিগ্ন চিত্তে তাঁর বাইরে বেরুনোর অপেক্ষায় প্রহর গুণতে লাগল। বাইরে বেরুনোর সাথে সাথেই তারা মহানবীর (সাঃ) উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা তাঁকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। এমন সময় তিনি বাইরে এলেন। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার যে, তারা সব ক্লান্তিতে একে অন্যের উপর ঢুলে পড়ছিল। এক অদ্ভুত ধোঁয়াশা তাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখল। মহানবী (সাঃ) এরই মধ্য দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

এদিকে শত্রুরা বহাল তবিয়তে তাঁর ঘর ঘিরে রাখল। মহানবীর (সাঃ) অপেক্ষায় তাদের রাত অতিক্রান্ত হতে চলল। মহানবী (সাঃ) একটা নির্দিষ্ট সময়েই ঘর থেকে বেরুতেন। তাকে সে সময়ের মধ্যে বেরুতে না দেখে তারা মহানবীর (সাঃ) ঘরের মধ্যে ঝুঁকে দৃষ্টিপাত করে একসাথে বলে উঠল ঃ 'ঐ দেখো, মুহম্মদ চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন।'

তারা এদিকে শুয়ে থাকা ব্যক্তির ওঠার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল যদিও মুহম্মদ (সাঃ) অনেক আগেই চলে গিয়েছিলেন।

এ ঘটনার দু'তিন দিন আগে প্রিয়নবী মুহম্মদ (সাঃ) আবু বকরের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তখন ছিল দুপুর বেলা। তিনি তাঁর দরজায় ঘা দিলেন। আবু বকর বাইরে এলেন। মহানবীকে (সাঃ) দেখেই তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন, হয়তো তিনি কোনো অসুবিধার মধ্যে আছেন।

মহানবী (সাঃ) আবুবকরের (রাঃ) সাথে তাঁর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে বললেনঃ 'ঘরে কে আছে ? ক্ষণিকের জন্য তাকে একটু যেতে বলো। কিছু জরুরী পরামর্শ আছে।'

হজরত আবুবকর জবাব দিলেন ঃ 'হে আল্লাহর রসূল! এখানে আপনার বিবি আয়েশা ছাড়া আর কেউ নেই।'

মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ 'হিজরতের আদেশ অবতীর্ণ হয়েছে। এবার আমাদের মক্কা ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

হজরত আবুবকর (রাঃ) বড়ই উদ্বিগ্ন চিত্তে বললেন ঃ 'আমার মাতা-পিতা আপনার উপর উৎসর্গিত হোন। বলুন! আপনার সাথী হবার সৌভাগ্য আমার হবে? আমিও কি আপনার সাথে যেতে পারব ?'

মহানবী বললেন ঃ 'হ্যাঁ, তুমিও চলো। প্রস্তুত হও। আমরা দু'জন একসাথে যাবো।'

এ কথা শুনেই আনন্দাশ্রুতে আবুবকরের গণ্ডদেশ ভিজে গেল। তিনি (রাঃ) বললেন ঃ 'আল্লাহর রসূল! আমি কিছু জিনিসপত্র প্রস্তুত রেখেছি। তা আমাদের কাজে আসবে। সফরের জন্য দুটি উটনিও প্রস্তুত রেখেছি এবং আবদুল্লাহ বিন আরকাতের সাথেও কথা বলে রেখেছি। সে সাথে থাকলে আমাদের সফর অনেক সহজ হবে।'

মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ 'এখনই উটনির কোনো প্রয়োজন হবে না। প্রথমে আমরা দক্ষিণমুখী হয়ে পথ চলব। তারপর 'সওর' গুহায় কিছুদিন অবস্থান করব।'

হজরত আবুবকর (রাঃ) এর কারণ অনুভব করে নীরব রইলেন। তিনি অনেক পূর্ব থেকেই মহানবীর (সাঃ) দূরদর্শিতাপূর্ণ সিদ্ধান্তের প্রতি গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তিনি জানতেন মহানবীর (সাঃ) দূরদর্শিতা ও কূটনীতির কাছে শত্রুরা কীভাবে বারে বারে পর্যুদস্ত হয়েছে।

'ছাওর' গুহা মক্কার দক্ষিণে সিরিয়াভিমুখে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। তিনি স্থির বিশ্বাস রাখতেন যে, তাঁদের মক্কা ত্যাগের কথা শুনে শত্রুরা মদীনা অভিমুখী পথ ধরে তাঁদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবে। কেননা, মদীনা যাওয়ার পথ মক্কা থেকে উত্তর দিকে অবস্থিত। সেজন্য তিনি উত্তর দিকে না গিয়ে সম্পূর্ণ উল্টো পথে অর্থাৎ দক্ষিণের পথ ধরার পরিকল্পনা করলেন যাতে শত্রুরা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যায়। তারা যেন কল্পনাও করতে না পারে যে, তাঁরা কোন দিকে গেলেন ? কোথায় গেলেন ?

মক্কায় সে মুহূর্তটি ছিল মহানবীর জীবনের শেষ রাত। শত্রুরা তাঁর বাড়ি-ঘর ঘিরে রইল। আর এ দিকে তিনি তাদের অলক্ষে আবুবকরের গৃহে চলে এলেন। তাঁকে সাথে নিয়ে তাঁর বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

রাত গভীর হতেও গভীরতর হয়ে চলল। মক্কা থেকে বেরিয়ে তাঁরা সোজা দক্ষিণে 'ছাওর' গুহাভিমুখে অতি দ্রুত এগিয়ে চললেন।

রজনী প্রভাত হল। হজরত আলী (রাঃ) বিছানা ত্যাগ করে উঠে বসলেন। এবার শত্রুরা সচকিত হয়ে উঠল।

কিন্তু এ কী ?....মুহম্মদের বিছানা ত্যাগ করে কে উঠল ? তিনি তো মুহম্মদ নন!

শত্রুরা বার বার চোখ রগড়াতে রগড়াতে মহানবীর (সাঃ) ঘরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে রাগল। কিন্তু এ কে ? যার জন্য সারা রাত তারা ঘর পাহারা দিল তিনি তো নন! এ তো আবু তালিবের পুত্র আলি। উহ্! উহ্!! এ কী হল ?'

বার বার উদ্বিগ্নকণ্ঠে তাদের মুখ দিয়ে এ কথাটিই বের হয়ে আসতে লাগল। তারপর তারা কাঠের মূর্তির মতো নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

আমরা কী সারা রাত আলিকেই পাহারা দিলাম ? আমরা কী আলিকেই মুহম্মদ বলে ঠাউরেছিলাম ?

আলি আজ মুহম্মদের বিছানায় শুয়ে কেন রাত কাটালো ? আর মুহম্মদই বা কোথায় ?

শত্রুরা একে অন্যকে এভাবেই প্রশ্ন করতে লাগল। কিন্তু উত্তর কারোরই জানা ছিল না। কিছুক্ষণ পরেই লোকালয় থেকে এক লোকও বেরিয়ে এলো। দেখামাত্রই সবাই তাকে ঘিরে ধরল। দেখতে দেখতে ভীড় জমে গেল। লোকেরা হতবিহ্বল হয়ে এগিয়ে এসে তাকে ঘিরে ধরল। সবাই জানতে চায় মুহম্মদের কী পরিণতি হয়েছে ? সবশেষে সব প্রশ্নের একটাই উত্তর বেরিয়ে এলো ঃ 'মুহম্মদ পালিয়ে গেছেন।'

সকলেই উদ্বিগ্ন ও বিহ্বল হয়ে পড়ল। ক্রোধে ও জিঘাংসায় সবার চোখ দিয়ে আগুন ঝরতে লাগল। এবার সবাই গৃহে প্রবেশ করে হজরত আলীকে সক্রোধে জিজ্ঞেস করতে লাগল ঃ

'তোমার সাথী কোথায় ?'

আলি নিরুত্তাপ কণ্ঠে জবাব দিলেন ঃ 'তা তো জানিনা!'

তারা নানা প্রশ্নবাণে আলিকে (রাঃ) জর্জরিত করতে লাগল, কিন্তু আলি নিরুত্তর রইলেন। অবশেষে নিরাশ হয়ে তারা আলিকে ধরে নিয়ে গিয়ে কাবা ঘরে বন্দী করে রাখল। তাতেও তাদের খাহেশ ও কামনা মিটল না। তারা তাঁকে অকথ্য নির্যাতন করল। এর মধ্যে কয়েকজন আত্মীয় খবর পেয়ে সেখানে এসে পড়ায় তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেন।

যে দিন পৌত্তলিকরা মহানবীকে (সাঃ) হত্যা করে তাদের জিঘাংসা নিবৃত্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছিল, সে রাতেই মহানবী (সাঃ) তাদের নাগালের বাইরে

চলে গেলেন। এর ফলে, পৌত্তলিকরা খুবই দুঃখিত হল। ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে তারা এদিকে-ওদিকে পাগলের মতো ছুটে গেল তাঁর অনুসন্ধানে। কেউ মদীনা অভিমুখে ছুটল আর কেউ ছুটল হজরত আবুবকরের গৃহপানে। কেননা, তারা জানত যে, আবুবকর তাঁর অবিচ্ছেদ্য বন্ধু। তাঁর সাথে মহানবীর (সাঃ) বিশেষ আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। আবুবকরের গৃহে পদার্পণকারীদের মধ্যে আবু জেহেলও ছিল। এরা আবু বকরের গৃহের সদর দরজায় ঘা দেয়ামাত্রই তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা আসমা (রাঃ) বেরিয়ে এলেন। শত্রুরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলঃ 'তোমার বাবা কোথায় ? সত্যি কথা বলো। মিথ্যা বললে খারাপ হবে।'

আসমা নিঃশঙ্কচিত্তে জবাব দিলেন ঃ 'আল্লাহ আমাকে মিথ্যার কবল থেকে রক্ষা করুন। মিথ্যা বলে আমার কী লাভ ? আমি জানিনা কোথায় গেছেন।'

শত্রুরা বুঝতে পারল যে, আবুবকরও (রাঃ) মুহম্মদের সাথী হয়েছেন। আবু জেহেল ক্রোধে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আসমার (রাঃ) গালে সজোরে চপেটাঘাত করল। এর ফলে, তাঁর কানের দুল ছিঁড়ে দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ল। তারপর ফিরে গেল শত্রুরা। পথিমধ্যে লোকেদের দেখামাত্রই তারা মহানবীর (সাঃ) খবর নিতে লাগল। যাতে মহানবীর পদচিহ্ন ধরে তারা তাঁর অনুসন্ধান করতে পারে। সে জন্য পদচিহ্ন বিশেষজ্ঞেরও খোঁজ করতে লাগল।

তাঁকে (সাঃ) অনুসন্ধানের জন্য এরকম একজন পদচিহ্ন-বিশেষজ্ঞেরও সন্ধান পাওয়া গেল। এর নাম ছিল সুরাকা বিন মালিক। পদচিহ্ন- বিশেষজ্ঞ হিসেবে তার খ্যাতি ছিল। সে মহানবী (সাঃ) ও আবুবকরের (রাঃ) পদচিহ্ন চিহ্নিত করার কাজে সহযোগিতা করতে রাজি হল। এবার তারা বেরিয়ে পড়ল অনুসন্ধানে। সাথে সাথে কুরাইশদের একটা ভীড়ও জমে উঠল। চলতে চলতে তারা মক্কা শহরের বাইরে গিয়ে উপস্থিত হল। এবার সুরাকা দক্ষিণাভিমুখী হয়ে 'ছাওর' গুহার দিকে এগিয়ে চলল। লোকেরা বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। প্রত্যেকে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলতে লাগল ঃ 'মুহম্মদ কোনদিকে গেলেন ? দক্ষিণ দিকে না উত্তর দিকে ?'

শত্রুদের কোনো কিছুই বোধগম্য হচ্ছিল না। কিন্তু তবুও তারা সুরাকাকে অনুসরণ করে অন্ধের মতো পথ চলতে লাগল। তাদের আশা হয়তো তারা সফল হবে। মুহম্মদের সন্ধান পাওয়া যেতেও পারে। সুরাকা মরুভূমির বালির উপর অঙ্কিত পদচিহ্ন ধরে এগিয়ে চলল। তারপর.... । তারপর 'ছাওর' পাহাড়ের উপরে উঠে যেতে লাগল।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ মহানবীর সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন যে, তিনি শত্রুদের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেবেন। তাঁর উপর শত্রুদের সামান্যতম আঁচড়ও লাগতে

দেবেন না। এখন কার সাধ্য যে, আল্লাহর ইচ্ছার ব্যতিক্রম ঘটায় ? এর চেয়ে সত্য প্রতিশ্রুতি তাঁকে কে দিতে পারে ?

সুরাকা পাহাড়ের উপর উঠে পড়ল। সঙ্গে ছিল শত্রুদের একটা সশস্ত্র দল। তারপর আপনা-আপনিই তার পদদ্বয় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তার চেহারায় উদাসীনতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার মধ্যে এক অজানা আশঙ্কার উদ্রেক হল। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবতে লাগল এখন সে কী করবে, কোন্ দিকে যাবে ? শত্রুরা তার এ অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলঃ 'সুরাকা! কী ব্যাপার ? তুমি দাঁড়িয়ে পড়লে কেন ? তোমার কী হয়েছে ?'

সুরাকা তার সামনে অবস্থিত একটি পাথর দেখিয়ে বললঃ 'তারা এ পর্যন্ত এসেছে। কিন্তু আর বোঝা যাচ্ছে না তারা কোন দিকে গেল ?'

তারপর সামনে এক চারণক্ষেত্র দেখা গেল। সেখানে এক ব্যক্তি মেষ চরাচ্ছিল। শত্রুরা তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ 'তুমি কী এ পাহাড়ে দু'জন লোককে উঠতে দেখেছো ?'

মেষপালক জবাব দিল ঃ 'আমি তো কিছু দেখিনি! কিন্তু তোমরা দেখো! হয়তো তারা ঐ গুহার মধ্যে থাকতে পারে ?'

কুরাইশরা আবার পাহাড়ে উঠে ঐ গুহার দিকে এগিয়ে চলল। তীর, তলোয়ার, লাঠি সমস্ত কিছুই তাদের কাছে ছিল। প্রত্যেকের আশা যে, মুহম্মদকে হত্যার পুরো কৃতিত্বটাই সে নেবে।

কি অপূর্ব রহস্য আল্লাহ তালার! তার মনোনীত নবী মুহম্মদ তখন গুহার মধ্যে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন আর তাঁর পাশে বসে হজরত আবুবকর (রাঃ) ভয়ে থরথর করে কাঁপছিলেন। বুক ধড়ফড় করছিল এই ভেবে যে, কোন শত্রুর দৃষ্টি মহানবীর (সাঃ) উপরে গিয়ে পড়ে।

শত্রুদের শোরগালও কানে আসছিল। তারা গুহার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল। তাদের পায়ের আওয়াজ, লাঠির খটাখট শব্দ, তাদের ভয়ংকর চীৎকার ধীরে ধীরে নিকট হতেও নিকটতর হতে লাগল। আবুবকর চুপচাপ গুটিসুটি মেরে বসে রইলেন। তাঁর পুরো দৃষ্টিই ছিল মহানবীর উপর নিবদ্ধ। তাঁর বার বার মনে হতে লাগল হায়, আমি যদি মহানবীকে (সাঃ) আমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারতাম ? আমি যদি তাঁকে আমার শরীরে মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারতাম! মহানবীর (সাঃ) নামায পড়া শেষ হল। মহানবীর (সাঃ) জীবনাশঙ্কায় আবুবকর ভয়ে সিঁটিয়ে গেলেন। ভয়ে তাঁর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মহানবী (সাঃ) পুরো ব্যাপারটাই আঁচ করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ 'ভয় পেয়ো না আবুবকর! আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।'

কুরাইশদের এক ব্যক্তি অতি দ্রুত গুহার দিকে এগিয়ে চলল। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই তার দুটি পা-ই আপনা-আপনিই থেমে গেল। তারপর পুনরায় সে উল্টে ফিরে এলো। তার চেহারায় আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল।

তার এক সঙ্গীও তার সাথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। তার এ অবস্থা, দেখে সেও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

এ অবস্থা দেখে অন্যান্য সাথীরা জিজ্ঞেস করল ঃ 'কী হয়েছে ? গুহামুখে যাওয়ার আগেই ফিরে আসছো কেন ?'

সে ভগ্নমনোরথ হয়ে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছিল। সে বলল ঃ 'এ গুহামধ্যে মুহম্মদের থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। মুহম্মদের জন্মের আগে থেকেই সেখানে মাকড়সার জাল বিছানো রয়েছে। সেখানে দুটি কবুতরও বাসা বেঁধে বাস করছে। পথে একটি গাছও দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মধ্যে কোনো মানুষের লুকিয়ে থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।'

এ আওয়াজ আবুবকরও (রাঃ) শুনতে পেলেন। তিনি অনুভব করলেন যে, এ আল্লাহরই অসীম রহমত। তিনি তাঁর প্রিয় হাবিবের সামান্যতম ক্ষতিও হতে দেবেন না। এ সব তাঁরই কৌশল। শত্রুরা গুহার মুখ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল এবং এদিক ওদিক টহল দিচ্ছিল। আবুবকর তাদের পা-ও দেখতে পাচ্ছিলেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার ইচ্ছা কার্যকর হতে পারে ? কেউ সামান্যতম ঝোঁকের বশবর্তী হয়েও গুহার মধ্যে তাকাতে পারল না। আবুবকর চুপিচুপি তাঁর কানে কানে বললেনঃ 'কারো দৃষ্টি আপনার পায়ের উপরে পড়লেই আমাদের দেখে ফেলবে।'

মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ 'আবুবকর! ঐ দু'জনের জন্য তোমার কিসের চিন্তা যেখানে স্বয়ং আল্লাহ তাদের রক্ষাকর্তা!

তারপর শত্রুরা গুহা ত্যাগ করে চলে গেল। এবার তারা ভাবতে লাগল এবার চারিদিকে লোক পাঠিয়ে মুহম্মদের অনুসন্ধান চালানো যাক। তাদের এতটা অনুসন্ধান ও পরিশ্রম ব্যর্থ হওয়ার পরেও তারা ভগ্ন মনোরথ হল না; বরং দ্বিগু৽ উৎসাহে তাঁর অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এরপর কুরাইশরা ঘোষণা করল যে, মুহম্মদকে ধরে আনতে পারলে তাকে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে। স্বভাবতই শত উটের প্রত্যাশা কারো কম থাকার কথা ছিল না। তাই মুহম্মদের খোঁজে সমস্ত সন্ধানীরা দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মরুপ্রান্তর চষে বেড়াতে লাগল। যে কোনো মূল্যে মুহম্মদকে হত্যা করা চাই। শত উট পুরস্কার নিতেই হবে। মহানবী ও আবুবকর শত্রুদের এ সব কর্মকাণ্ডের কোনো খবর পেলেন না।

প্রিয়নবী মুহম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সাথী হজরত আবুবকর ঐ গুহার মধ্যে তিন দিন যাবৎ অবস্থান করতে লাগলেন। আবুবকরের পুত্র আবদুল্লাহ দিনভর অনুসন্ধান করে শত্রুদের সমস্ত চক্রান্ত ও শলা-পরামর্শের খবর নিয়ে রাত্রে এসে তাঁদের জানিয়ে যেতে লাগলেন। আবুবকরের কন্যা আসমা খাদ্য প্রস্তুত করে গোপনে দিয়ে যেতেন। আবুবকরের গোলাম আমীর বিন ফুহাইরা মেষ চরাতে চরাতে একেবারে গুহার নিকটবর্তী এসে দুধ দুয়ে তাঁদের পান করিয়ে আবার মক্কায় ফিরে যেতেন। আবদুল্লাহ ও তাঁর বোন আসমা আগে আগে ও আমীর বিন ফুহাইরা তাদের পিছনে পিছনে যেতেন। যাতে তাদের পদচিহ্ন দেখে লোকেরা ভ্রমে পতিত হয়। এভাবে তিনদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। প্রিয়নবী মুহম্মদ (সাঃ) ও হজরত আবুবকরের অনুসন্ধানে ভাটা পড়ে গেল। যারা তাঁদের খুঁজতে বেরিয়েছিলো তারা নিরাশ হয়ে ঘরে ফিরে গেল। তারা চিন্তা করল যে, মুহম্মদ হয় অনেক দূর দেশে চলে গেছেন নতুবা অন্য কোথাও হারিয়ে গেছেন। এখন তাঁর অনুসন্ধানে সময় ব্যয় করার কোনো মানে হয় না।

আবদুল্লাহ প্রতিদিন প্রিয়নবী মুহম্মদ ও পরম স্নেহময় পিতার সঙ্গে দেখা করে সমস্ত সংবাদ অবগত করাতেন এমন কী তাদের নিরাশার কথাও শুনিয়ে যেতেন। আবু বকর আব্দুল্লাহর কাছ থেকে সর্বশেষ খবর অবগত হবার পরে বললেন ঃ 'যে উট দুটিতে আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল, সে দুটিকে নিয়ে এসো। সাবধান! কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে বা বুঝতে না পারে। সাথে করে আবদুল্লাহ বিন আরফাতকেও নিয়ে আসতে ভুলবে না। আবদুল্লাহ বিন আরফাত ছিল অমুসলমান। তা সত্ত্বেও আবুবকর তাকে বিশ্বাস করতেন। সে জন্য তিনি তাকে পথ-প্রদর্শক হিসেবে মনোনীত করে রেখেছিলেন যাতে সে অপরিচিত পথ ধরে তাঁদের মদীনায় পৌঁছে দিতে পারে।

সন্ধ্যার পরপরই আবদুল্লাহ ছাওর গুহাভিমুখে রওয়ানা হলেন। সেসাথে বোন আসমা ও আমীর বিন ফুহেরাও তাঁর সাথী হল। সাথে আরফাত দুটি উট প্রস্তুত করে তাঁদের পিছু পিছু চললেন।

কিছু সময় বাদে তাঁরা সদলবলে গুহার কাছে পৌঁছে গেলেন। এ দুটির মধ্যে সবচেয়ে তেজী উটটিকে আবুবকর মহানবী (সাঃ) কে গ্রহণ করতে অনুরোধ করে বললেন ঃ 'আল্লাহর রসূল! আপনি এ উটটাতে চড়ে বসুন।'

মহানবী (সাঃ) অন্যের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বস্তু আপনার বলে গ্রহণ করতেন না। এটা তিনি খুবই অপছন্দ করতেন। তিনি তাঁর উত্তরে বললেন ঃ 'আমি অন্যের উটের উপর বসি না।'

আবুবকর বললেন ঃ 'এটি এখন আপনার হে আল্লাহর রসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক।'

মহানবী বললেন ঃ 'না। তুমি যে দাম দিয়ে সেটি কিনেছো সে দাম আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও।'

আবুবকর উটের মূল্য গ্রহণের ব্যাপারে খুব দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। হজরত আসমা সফরের সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছিলেন। তিনি বাড়ি থেকে দু'জনের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও এক মশক ভর্তি পানি নিয়ে এসেছিলেন। এ দুটি জিনিসই উটের উপরে রাখা হয়েছিল। বাঁধার জন্য কোনো রশি ছিল না। এখন তিনি চিন্তা করতে লাগলেন কী উপায় ?

তারপর তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি তাঁর কোমরবন্ধটি কেটে দু'টুকরো করলেন। তার একটি দিয়ে নাশতার পাত্র ও অন্যটি দিয়ে পানির মশক বেঁধে দিলেন। এ কারণে তিনি 'দুই কোমরবন্ধওয়ালী' নামে বিখ্যাত হয়ে গেলেন।

মহানবী ও আবুবকর এবার দু উটের পিঠে সওয়ার হলেন। আবদুল্লাহ বিন আরফাতও তার উটের পিঠে সওয়ার হল। আবুবকর তাঁর গোলামকেও তাঁর পিছনে বসিয়ে নিলেন যাতে প্রয়োজনে কাজে লাগতে পারে। আবুল্লাহ বিন আরফাতের পথ নির্দেশনায় সমুদ্রতটবর্তী অজানা-অচেনা লোকবসতিহীন শুনশান নির্জন রাস্তা বেয়ে তাঁরা এগিয়ে চললেন।

৩

কুরাইশদের সমস্ত প্রচেষ্টা ধুলিস্যাৎ হয়ে গেল। মনের আশা মনেই রয়ে গেল। সে জন্য তাদের দুঃখের অন্ত রইল না। শয়নে, স্বপনে, সর্বক্ষণই তারা এ ভাবনায় মরমে মরে যেতে লাগল। মহানবী (সাঃ) তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ায় তারা শুধু হাত মোচড়াতে লাগল। উঠতে, বসতে, মাঠে, ময়দানে সর্বত্রই তাদের এ অবস্থার প্রকাশ ঘটতে লাগল। কুরাইশরা প্রচণ্ড ভারাক্রান্ত মনে এক মজলিসে বসে এ দুঃখের কথাই আলোচনা করছিল। এমন সময় এক ব্যক্তি সেখানে এসে উপস্থিত হল। আগন্তুক সকলের উদ্দেশ্যে বলল ঃ 'আমি সমুদ্রতটবর্তী রাস্তা ধরে আসতে আসতে তিন ব্যক্তিকে আমার পাশ দিয়ে চলে যেতে দেখেছি। আমার মনে হয় মুহম্মদ ও তাঁর সাথীরাই হবেন।'

সে মজলিসে সুরাকা নামে এক ব্যক্তি বসেছিল। সে ছিল জেশামের পুত্র। সে ছিল বহুদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। এ কথা শুনে সে বুঝল যে, আগন্তুকের কথা পুরোপুরি সত্য কিন্তু সে চাচ্ছিল যে, মুহম্মদকে ধরার পুরো কৃতিত্বেরই সে অধিকারী হবে। পুরস্কার বাবদ শত উটের মালিক সেই হবে। তাই সে সবাইকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে বলল ঃ 'না, না। তা কখনোই হতে পারে না। কিছুক্ষণ আগেই আমার সামনে দিয়েই তারা গেছে। তাদের সম্পর্কে আমার ভালোই জানা আছে।'

সুরাকার কথা সবার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে বিবেচিত হল। ফলে, আগন্তুকের কথায় আর কেউ কান দিল না। কিছুক্ষণ পর সুরাকা সেখান থেকে উঠে বাড়ি চলে গেল।

বাড়ি পৌঁছেই সুরাকা অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হল। তারপর সে তার চাকরকে একটি দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে জিন বেঁধে মক্কার বাইরে পৌঁছে দিয়ে আসতে বলল। কিছুক্ষণ পরে সে নিজেও সেখানে পৌঁছে গেল। সে চাচ্ছিল যে, মক্কার বাইরে যাওয়ার পথে তাকে যেন কেউ দেখে না ফেলে। সেখান দিয়ে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়েই ঘোড়া হাঁকিয়ে দিল। ঘোড়া ধূলা উড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সমুদ্রতটাভিমুখে ছুটতে লাগল।

স্বয়ং আল্লাহ যাকে ছাওর গুহায় শত্রুদের কবল থেকে রক্ষা করেছেন, সেখানে সুরাকার আকাঙ্ক্ষা কী পূর্ণ হতে পারে ? না। কখনোই না। আল্লাহ মুহম্মদ (সাঃ) এর দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারেন না। কেননা, স্বয়ং আল্লাহ তাঁকে শত্রুদের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে তাঁকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ঘোড়া তাঁদের নিকটবর্তী হওয়ামাত্রই সামনের দুপা তুলে এমনভাবে দাঁড়িয়ে গেল যে, সুরাকা সে ধাক্কায় পড়ে যেতে যেতে বেঁচে গেল। সে নিজেকে সামলে নিয়ে কষে নাগাল ধরে আবারো ঘোড়া হাঁকাল। ঘোড়া আবার ঝড়ের বেগে ছুটতে লাগল। কিছু দূর যেতে না যেতেই পুনরায় টক্কর খেল। তা সত্ত্বেও সুরাকা নিজেকে পুনরায় সামলে নিল এবং আবার ঘোড়ার লাগাম কষে ধরে জোরে হাঁকিয়ে দিল। কিন্তু ঘোড়া সামনের দিকে অগ্রসর না হয়ে অন্য দিকে ছুটতে লাগল। এর ফলে, সুরাকা ঘাবড়ে গেল। ভীতসন্ত্রস্ত হল। মুহম্মদকে (সাঃ) ধরার আকাঙ্ক্ষা তার তিরোহিত হয়ে যেতে লাগল।

প্রিয়নবীর (সাঃ) কাফেলা এক দিন ও এক রাতের পথ অতিক্রম করে এগিয়ে চলতে লাগল। তাঁরা কাউকে তাদের পিছু ধরতেও দেখলেন না আবার সামনা-সামনিও কাউকে দেখলেন না। আবুবকর (রাঃ) সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁর মনের সমস্ত রকমের ভয় ও দুশ্চিন্তা বিদূরিত হয়ে গিয়েছিল। প্রিয়নবীর (সাঃ) জন্য আর কোনো ভয় ও আশঙ্কা থেকে তিনি মুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। পরদিন দুপুর বেলা। সূর্য প্রচণ্ড রূপ ধরে মাথার উপরে বিরাজ করছিল। প্রচণ্ড গরমে ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল তাঁদের শরীর। আবুবকর চাচ্ছিলেন প্রিয়নবী (সাঃ) একটু বিশ্রাম নিন। তিনি চারিদিকে দৃষ্টি ফেরালেন। কিছুদূরে একটা পাহাড়ের পাদদেশে একটু ছায়া পাওয়া গেল। তিনি সেখানে গিয়ে নীচে নেমে জায়গাটি পরিষ্কার করে বিশ্রামের উপযোগী করে তুললেন। ভেড়ার চামড়া বিছালেন এবং দুপুরের আহার পরিবেশন করলেন। সবাই একসাথে বসে আহার সম্পন্ন করলেন। কিছুক্ষণ পরেই মহানবী (সাঃ) চোখ বন্ধ করলেন এবং পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

সূর্য অস্ত গেল। এখন গোধূলি। পার্শ্ববর্তী এক চারণক্ষেত্রে মেষ চরছিল। আবুবকর মহানবীর কাছে মেষ দোহন করার অনুমতি চাইলেন। দুধ দোহন করে মহানবীর (সাঃ) কাছে এনে একটু পানি মিশিয়ে পান করার জন্য তাঁর কাছে পেশ করলেন। দুধ পান করার পর তিনি (সাঃ) বললেন ঃ 'এখনো কী রওয়ানা হওয়ার সময় হয়নি ?' এই বলে তিনি প্রস্তুতি শুরু করলেন। অকস্মাৎ দক্ষিণ দিগন্তে আবুবকরের (রাঃ) দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হল। দেখলেন– এক অশ্বারোহী দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। তা দেখে আবুবকরের (রাঃ) বুক দুরুদুরু করে কেঁপে উঠল। তিন নিবেদন করলেন ঃ 'আল্লাহর রসুল! এখন তো আমরা শত্রু পরিবেষ্টিত!' কিন্তু মহানবী (সাঃ) ছিলেন ভয়লেশহীন। তিনি তাঁকে আশ্বস্ততার সাথে বললেন ঃ 'আবুবকর! ভয় পেয়ো না। আল্লাহ আমাদের সহায় আছেন।'– বাস্তবিকই আল্লাহ তাঁদের সহায় ছিলেন। অশ্বারোহী সুরাকা খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। সে ছিল তাঁদের সামনেই। তার ঘোড়ার খুরের আওয়াজও কানে আসছিল। দেখতে দেখতে তার ঘোড়া আবারো প্রচণ্ড একটা টক্কর খেল। ঘোড়ার পা মরুর বালিতে প্রায় অর্ধেকটা দেবে গেল। আর সওয়ার ধাক্কা খেয়ে মাটিতে এসে উল্টে পড়ল। সুরাকার চেহারা বালু মেখে একেবারে ভূতের আকার ধরল। তার মনোবল ভেঙে পড়ল। সে বুঝল যে, তার অবস্থা খুবই শোচনীয়। যে কাজ সে করতে এসেছে খোদাতা'লা তার সে কাজে মোটেও সন্তুষ্ট নন। সে সেখানেই থেমে গেল এবং মহানবী ও তাঁর সাথীদের উদ্দেশ্যে চীৎকার করে বলতে লাগল ঃ 'আমি জুশামের পুত্র সুরাকা বলছি। অনুগ্রহ করে তোমরা একটু থামো। আমি তোমাদের সাথে কিছু কথা বলতে চাই। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করব না। বিশ্বাস করো, আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করব না।'

মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ 'আবুবকর! জিজ্ঞেস করো, সে কী চায় ?'

আবুবকর ঃ 'বলো, কী চাও ?'

সুরাকা ঃ 'নিরাপত্তার আশ্বাস।'

করুণার প্রতিমূর্তি, বিশ্ব রহমত, বিশ্বমানবের চিরকল্যাণকামী অভিভাবক মুহম্মদ তার আবেদন কবুল করলেন এবং আবুবকরকে (রাঃ) নিরাপত্তার আশ্বাস লেখার নির্দেশ দিলেন। একটি চামড়ার টুকরায় মহানবীর (সাঃ) নির্দেশিত বাক্যগুলি লেখা হল। তারপর সেটি সুরাকাকে দিয়ে দেয়া হল। সেটি নিয়ে সুরাকা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে মক্কায় রওয়ানা হয়ে গেল। সুরাকার সাথে যা কিছু হয়েছিল সুরাকা তা সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখল। এরপর থেকে মহানবীর (সাঃ) প্রতি সে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করত। গভীর ভালোবাসা ও সহানুভূতি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এর পর থেকে যারাই মহানবীকে খুঁজতে বেরুতো,

সুরাকা তাদের নিরাশ করে দিত। যে কোনো অবস্থায় ও যে কোনো মূল্যে সুরাকা তাদের সে কাজ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করত।

৪

মহানবীর (সাঃ) হিজরতের পরে মক্কার প্রতি আলি আর কোনো আকর্ষণ অনুভব করলেন না। তিনি সদাসর্বদাই নিজেকে নিঃসঙ্গ ও একাকী বলে অনুভব করতে লাগলেন। একদিকে তাঁর জীবন-সংশয়, অন্যদিকে মদীনার প্রতি দুর্বার আকর্ষণ–এ সব তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল। এরপর থেকে তিনি খুবই উদাসীন হয়ে পড়লেন। তাঁর কাছে মহানবীর রেখে যাওয়া গচ্ছিত সম্পদ প্রাপকদের মিটিয়ে দেয়ার দায়িত্ব অর্পিত ছিল। তা যথাযথরূপে সম্পন্ন করার পর তিনি সুযোগ বুঝেই মক্কা ছেড়ে মদীনার পথে রওয়ানা হলেন। নিঃশঙ্ক চিত্তে, নিঃস্ব অবস্থায়। না কোনো উট, না কোনো ঘোড়া, না কোনো খচ্চর। কিন্তু একটা সম্পদ তাঁর ছিল। তা হল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি সুগভীর দরদ, প্রেম, ভালোবাসা। মহানবীর (সাঃ) সাথে মিলিত হওয়ার আকুল বাসনায় তিনি পায়ে হেঁটে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা দিলেন।

হজরত আলির (রাঃ) এ সততা ও ত্যাগের কোনো তুলনা ছিল না। তিনি কত উচ্চস্তরের পুণ্যাত্মা মানুষ ছিলেন এ ঘটনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সে যুগে এমন দীর্ঘ সফর.....তাও আবার সম্পূর্ণ পায়ে হেঁটে...খালি হাতে! কী উন্নত ছিল শির, কত উদার ছিল তাঁর হৃদয় আর কী কঠিন ছিল তাঁর সংকল্প! আর ভূ-পথ ? ভয়ঙ্কর মরুভুমি। বিরাণ প্রান্তর, একেবারেই জনমানব শূন্য। কোথাও জীবনের চিহ্নমাত্র নেই। নেই কোথাও ছায়া, কোথাও নেই পানি। মাথার উপরে প্রচণ্ড তাপে বিরাজ করছে গনগনে সূর্য, পায়ের তলায় উত্তপ্ত মরুভূমি আর সামনে মরুভূমি ও দুর্গম পাহাড়ি পথ। কিন্তু সমস্ত কষ্ট আর বাধা-বিপত্তি সে মহাপুরুষ আর মহানবীর (সাঃ) প্রতি দুর্বার আকর্ষণ আর ভালোবাসার কাছে হার মানে। একদিকে কঠোর কঠিন বাস্তবতা আর এক দিকে আলির দৃঢ় কঠিন ইচ্ছাশক্তি। দেখা যাক, কে হার মানে!

হজরত আলি এগিয়ে চললেন। উঁচু নিচু মরুভূমি, মালভূমি ও পাহাড়ি পথ ধরে পায়ে হেঁটে এগিয়ে চললেন আলি। তাঁর মনে শুধু একটাই ইচ্ছা, একটাই আকাঙ্ক্ষা, মহানবী ও তাঁর সাথীদের সাথে মিলন।

তিনি চলতে লাগলেন। চলতেই লাগলেন। এ চলার যেন শেষ নেই। বিরামহীন এ যাত্রা। চলতে চলতে শরীর অবসন্ন হয়ে আসে। পা আর চলতে চায় না। দেহপ্রাণ চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়েছে। কিন্তু তাঁর মনোবলে চিড় ধরেনি এতটুকুও। অন্তরে কেবলমাত্র একটাই প্রেরণা মহানবী ও তাঁর সাথীদের সাথে সাক্ষাত এ আকাঙ্ক্ষা। তাকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো টেনে নিয়ে চলেছে। বালুময়

মরুভূমি ও পাহাড়ি পথে অবিরাম চলতে চলতে পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ল। পা দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। তবুও চলার শেষ নেই। এ কষ্টের মধ্যেও একটু থেমে বিশ্রাম নিতেও তাঁর মন চায় না। মন সায় দেয় না। ব্যথা-যন্ত্রণা সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে অসীম ধৈর্য নিয়ে প্রিয়তম নবীজীর (সাঃ) পথ অনুসরণ করে অবিরাম পথ চলতে লাগলেন আলি। মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে এক শস্য ক্ষেত্রের কাছে ছোট্ট একটা লোকালয় ছিল। এটি কিছুটা উঁচুতে অবস্থিত ছিল। এখানে কিছু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বাস ছিল। প্রিয়নবী মুহম্মদ (সাঃ) তাঁদের অতিথি হন এবং সেখানে চৌদ্দ দিন যাবৎ অবস্থান করেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি নিজ হাতে একখানি মসজিদ স্থাপন করেন যা 'মসজিদে কুবা' নামে ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে। সেখানেই আলির (রাঃ) সাথে মহানবী (সাঃ) ও সঙ্গীদের সাক্ষাৎ হয়ে গেল। ফলে, ছোট মুজাহিদ বড় মুজাহিদদের সাথে মিলিত হলেন। এখন খুশির আর সীমা-পরিসীমা রইল না। একই সাথে তিন প্রকার আনন্দের মহামিলন ঘটল। সাক্ষাতের আনন্দ, শত্রুদের কবল থেকে মুক্তির আনন্দ ও মদীনাগামী সাথীদের কাছে পৌঁছানোর আনন্দ। চৌদ্দ দিন অবস্থানের পর মহানবী তাঁর সাথীদের নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। মদীনায় আসার খবর পৌঁছে গিয়েছিল। এর ফলে, এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হল। মুসলমান, ইহুদি, পৌত্তলিক সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে আনন্দগীত গাইতে লাগল। মদীনার লোকেরা এতদিন বড়ই আনন্দ, ভালোবাসা ও আবেগভরে তাঁর জন্য অপেক্ষমাণ ছিল। সর্বত্রই আগমনের প্রতীক্ষার পরিবেশ বিরাজিত ছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁর আগমনে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে নেচে গেয়ে বেড়াতে লাগল। মুখে তাদের একটাই কথা ঘুরে ফিরে আসছিল– 'প্রিয়নবী আসছেন।' লোকেরা প্রত্যেক দিন সকালে শহর ছেড়ে মদীনার সবুজ প্রান্তরে দৃষ্টি রেখে তাঁর আগমনের জন্য প্রতীক্ষায় থাকত। এভাবে তারা বহুক্ষণ পর্যন্ত পথ চেয়ে অপেক্ষা করার পর নিরাশ হয়ে আবার যার সেই ঘরে ফিরে যেতো। একদিন দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে সবাই ঘরে ফেরার পথে তারা উঁচু একটা টিলা থেকে আওয়াজ শুনতে পেলো ঃ 'লোকসকল! তোমাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে। ওই দেখো, তিনি (সাঃ) আসছেন।' এ ছিল অতি ক্ষদ্র একটা বাক্য। কিন্তু এর ব্যঞ্জনা ছিল অতি গভীর। এ ক্ষুদ্র বাক্যতেই সমগ্র মদীনাবাসীর হৃদয় উচ্চকিত হয়ে উঠল। আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল মানুষের হৃদয়। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের বুক আনন্দ ও খুশিতে স্ফীত হয়ে উঠল আর নারী ও শিশুদের চেহারা ফুলের সৌন্দর্যে হেসে উঠল। এ ছিল এক ইহুদির কণ্ঠস্বর। যে মুসলমানদের মতোই বড়ই আবেগভরে মহানবীর জন্য অপেক্ষমাণ ছিল। ওই উঁচু টিলা থেকে সে দেখল যে, সমস্ত মুসলমান নরনারী মহানবীর আগমনের আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। ঘরে ঘরে

যেন ঈদোৎসব শুরু হয়ে গেছে। সর্বত্রই এক অদ্ভুত হিল্লোল ও আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। আর তা শুধু এ কারণেই যে, মুহম্মদ (সাঃ) আসছেন। এর ফলে, সে গভীরভাবে প্রভাবিত হল। সেও গভীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ ছিল। আজ সে দেখল যে, ছোট একটা কাফেলা আসছে। সে বুঝতে পারল, সাথীরা সবাই আমাদের প্রিয় অতিথি। সে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে সবার উদ্দেশ্যে উদাত্ত কণ্ঠে বলল– 'লোকসকল! প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে। মহানবী এসে গেছেন।'

সকল যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে আনন্দে উদ্বেলিতচিত্তে সবাই তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য বাইরে বেরিয়ে এলো। অধিকাংশ লোকই তাঁকে চিনত না; কারণ তারা কখনোই তাঁকে দেখেনি। কিন্তু তাদের মন তাঁকে চিনত। তাদের হৃদয়মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা হয়েই তিনি বিরাজ করছিলেন।

খেজুর গাছের নীচে মহানবী ও তাঁর সাথীদের সাথে সকলের সাক্ষাৎ হল। লোকেরা মহানবীকে এক নজর দেখার জন্য উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল কিন্তু তাঁকে (সাঃ) চিনতে পারছিল না। হজরত আবুবকর সূর্যতাপ থেকে রক্ষার জন্য তাঁর মাথার উপর চাদর ধরে রেখেছিলেন। তা দেখেই লোকেরা বুঝতে পারল যে, ইনিই আল্লাহর রসূল মুহম্মদ (সাঃ)।

এদিন ছিল শুভ শুক্রবার। জুমুআর দিন। পথেই নামাযের সময় হয়ে গেল। সে সময় তিনি (সাঃ) বনী সালেম গোত্রে মহল্লায় অবস্থান করছিলেন। জুমুআর নামায তিনি সেখানেই পড়লেন। তাঁর সাথে সাহাবারাও নামায পড়লেন–যাঁরা তাঁকে দেখার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

এরপর আল্লাহর রাসূল মদীনায় প্রবেশ করলেন–সেই পবিত্র এলাকায় যেখানকার লোকেরা আগমনমাত্রই তাঁকে বরণ করে নিলেন–অথচ বড়ই দুঃখের ব্যাপার যে, নিজের মাতৃভূমিতে তিনি উপেক্ষিত হলেন। তাঁর মাতুলকুল–বনী নজ্জার গোত্রের লোকেরা অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে এলেন। কুবা থেকে মদীনা পর্যন্ত বসবাসরত গোত্রগুলি সাহাবাদের কাতারভূক্ত হয়ে গেলেন।

এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য ছিল। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ধরে দুঃখ, আনন্দ ও বেদনার কত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, সময়ান্তরে মানুষ সবই ভুলে গিয়েছে, কিন্তু এমন অভূতপূর্ব ও স্মরণীয় ঘটনা তারা আর কখনোই দেখেনি। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মেলা, মিছিল আর সমাবেশের আবেগময় দৃশ্য মদীনাবাসী যুগ যুগ ধরে দেখেছে, কিন্তু এমন আবেগঘন স্মরণীয় দৃশ্য তারা আর কখনো, কোন কালেও দেখেনি।

মদীনার প্রত্যেক খানদানই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করত যে, তারা মহানবীকে (সাঃ) আতিথ্যে বরণ করে নেবে। প্রত্যেকটি গোত্র একে একে তার সামনে এসে নিবেদন করল ঃ 'আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের এখানে থাকুন। দেখুন, এ

ঘর, এ মালসম্পদ আর এ আমার প্রাণ। আল্লাহর রসূল মৃদু হেসে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তাদের জন্য দোয়া করতে লাগলেন। সে সময় তিনি এক উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন। তিনি তাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্মান জানিয়ে বললেন ঃ 'আমি সেখানেই অবস্থান করব আল্লাহ যেখানে মঞ্জুর করে রেখেছেন।'

উটনি মদীনা শহরের অলি-গলি ঘুরে পথ চলতে লাগল। সাহাবিরা তাঁকে অনুসরণ করে এগুতে লাগলেন আর মুহূর্মুহু 'আল্লাহু আকবর! মুহম্মদ এসেছেন। আল্লাহু আকবর! আল্লাহর রসূল এসেছেন'– ধ্বনি দিতে লাগলেন।

ছোট ছোট বালক-বালিকারা দফ বাজিয়ে হিল্লোলিত কণ্ঠে আনন্দিত চিত্তে গাইতে লাগল– 'প্রতিশ্রুতির উপত্যকা থেকে শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ আমাদের সামনে এসে গেছেন। আমাদের উপর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অবশ্যকরণীয় কর্তব্য হয়ে পড়েছে, আমাদের সবার কামনা সফল হয়েছে। হে সম্মানিত অতিথি! আমরা আপনার বাণী শোনার জন্য অপেক্ষমাণ।'

মহিলারা মহান অতিথিকে এক নজর দেখে নয়ন-মন জুড়ানোর জন্য ঘরের ছাঁদের উপরে গিয়ে উঠলেন। পুরুষেরা উঁচু উঁচু জায়গায় উঠে তাদের প্রিয় অতিথির উদ্দেশ্যে সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে লাগলেন।

মহানবীর বাহক উটনি পথ চলতেই থাকল। অবশেষে এক জায়গায় এসে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং সেখানেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। এটি ছিল নাজ্জার গোত্রের দু এতিম ভাইয়ের জমি। সেখানে কয়েকটি কবর এবং কয়েকটি খেজুর গাছও ছিল।

উটনি বসে পড়ার পরে প্রিয়নবী (সাঃ) উটের পিঠ থেকে নেমে এলেন। তিনি উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'এ জমির মালিক কে ?' তিনি (সাঃ) এ জমিতে মসজিদ নির্মাণ করতে চাচ্ছিলেন।

আফরার পুত্র মা'আজ অগ্রবর্তী হয়ে নিবেদন করল ঃ 'আল্লাহর রসূল! সহল ও সুহাইল নামে দু এতিম বালক এ জমির মালিক। পিতৃহীন এ বালকদ্বয় এখন আমারই অধীন। আপনি আনন্দিত চিত্তে মসজিদ নির্মাণ করুন, আমি তাদের রাজি করিয়ে নেবো।'

মহানবী (সাঃ) সে এতিম বালক দুটিকে ডাকালেন। তারা দু'জনেই মসজিদ নির্মাণের জন্য এ জমি বিনামূল্যে দেয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করল। তিনি তা বিনামূল্যে নিতে রাজি হলেন না। অবশেষে অর্থমূল্য দিয়ে জমিটি কিনে সেখানে মসজিদ নির্মাণ শুরু করে দিলেন।

মহানবী (সাঃ) হজরত আবু আইয়ুব আনসারির আতিথ্য গ্রহণ করলেন। আনসারি তাঁর আতিথ্য পেয়ে যারপরনাই আনন্দিত চিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তিনি সর্বদাই মহানবীর (সাঃ) সুখ-শান্তি ও সুবিধা-অসুবিধার প্রতি

গভীর দৃষ্টি রাখতেন। সর্বক্ষণই তিনি তাঁকে সুখে ও শান্তিতে রাখার কোশেশ করতেন। তিনি (সাঃ) সাত মাস যাবৎ এখানে অবস্থান কররেন। এরই মধ্যে মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ হল। এ মসজিদের নিকটেই মহানবী (সাঃ) ও তাঁর পত্নীদের জন্য কয়েকটি কুঠরি নির্মিত হল, যেগুলিকে হুজরা বলা হয়। এবারে তিনি সেখানেই চলে এলেন।

আল্লাহর রসূল বনী নাজ্জার গোত্রের কাছে বাসস্থান নির্মাণ করলে তাঁরা কতটা খুশি হন তা অনুমান করা মোটেও কঠিন নয়। বনী নাজ্জার গোত্রের শিশুরা সমবেত কণ্ঠে আনন্দিত চিত্তে যে গান গাইত তার ভাষা এরকম– 'আমরা নাজ্জার বংশের শিশু। আমাদের কত গর্ব। মুহম্মদ আমাদের নবী। তিনি আমাদের নিকটেই থাকবেন।'

৫

প্রিয়নবী মুহম্মদ (সাঃ) মদীনায় বসবাস করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে অনেক দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। দিনগুলো তাঁর বড়ই শান্তি ও স্বস্তিতে অতিবাহিত হতে লাগল। সর্বত্রই শান্তি বিরাজ করছিল। কোথাও কোনো বিপদ ও অশান্তির কালোমেঘ ছিল না। প্রিয়নবী (সাঃ) তাঁর প্রিয়তমা পত্নী ও কন্যাদেরও সেখানে আনিয়ে নিলেন। হজরত আবুবকরও তাঁর পুত্রদের কাছে পত্র লিখলেন। তাঁরা তাঁদের মা ও বোনদের সাথে করে মদীনায় পৌঁছালেন। অন্যান্য সাথীরাও তাঁদের সন্তানাদিদের আনিয়ে নিলেন। যে মুসলমানরা এতদিন মক্কায় ছিলেন তাঁরা সবাই মদীনায় এসে গেলেন। সাথে করে তাঁদের স্ত্রী ও সন্তানাদিদেরও নিয়ে এলেন। তাঁরা সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় মদীনায় এসেছিলেন। কারণ তাঁরা বড়ই জুলুম ও অত্যাচারের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছিলেন। আনসাররা সকলেই তাঁদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করতেন। তাদের আরাম আয়েশের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। এ ব্যাপারে তাঁদের আন্তরিকতার ঘাটতি থাকতো না।

বাস্তবিকই মহানবী মুহম্মদের (সাঃ) নীতি ও আদর্শের কোনো তুলনা ছিল না। তা সকল যুগের সকল কালের মানুষের চির স্মরণীয় আদর্শ ছাড়া আর কী হতে পারে ? মহানবী (সাঃ) সমস্ত মুহাজির (শরণার্থী বা বাস্তুহারা) ও আনসারকে একত্রিত করলেন। তারপর আনসারদের বললেন ঃ 'গৃহত্যাগী এ মুহাজিররা তোমাদের ভাই।' তারপর এক এক মুহাজিরকে ডেকে বলতে লাগলেন ঃ 'এ আর তুমি পরস্পর ভাই ভাই।' প্রকৃতপক্ষেই তারা পরস্পরের ভাই ছিল। আনসাররা তাদের আপন আপন ভাইদের নিয়ে যার সেই ঘরে ফিরে গেলেন। তাঁরা সেখানেই বসবাস করতে লাগলেন। আনসাররা তাঁদের মুহাজির ভাইদের বসবাসের জন্য ঘর দিলেন। মাল-সম্পদ ও জমি-জায়গাও দিলেন।

এখন মদীনা তাদের আপন ভূমি হয়ে গেল। সেখানে সর্বত্রই সন্তুষ্টি বিরাজ করতে লাগল। এ ভ্রাতৃত্ব অনেক সুফল বয়ে নিয়ে এলো। মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে মজবুত সম্পর্ক গড়ে উঠল। তাদের মধ্যে গভীর ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল। পরস্পর পরস্পরের আপন ভাইয়ের মতো হয়ে গেল। ইসলামী আদর্শমতে তখন থেকে তারা নিজেদের জন্য যা পছন্দ করতেন আপনার ভাইয়ের জন্যও তাই পছন্দ করতে লাগলেন। যা নিজেরা অপছন্দ করতেন অন্যের জন্যও তা অপছন্দের বলে বিবেচনা করতেন। সে থেকেই তাঁরা এক মন এক প্রাণ হয়ে গেলেন–যাকে বলে হরিহর আত্মা।

মুহাজিররা হাত-পা গুটিয়ে বসে রইলেন না। সুযোগ বুঝে নানা কাজ-কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কেউবা বাণিজ্য শুরু করলেন। কেউ কেউ আনসারদের জমিতে কৃষিকাজ শুরু করলেন। কারোর পরিশ্রম ব্যর্থ গেল না। আল্লাহ ব্যবসা-বাণিজ্যেও অনুগ্রহ দান করলেন। যার ফলে, অনতিবিলম্বেই তাঁরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠলেন। তারপর যার সেই বাড়ি-ঘর তৈরি করে তাঁরা যার যার গৃহে বসবাস করতে লাগলেন।

কিছু এমন মুসলমানও ছিলেন যাঁরা ছিলেন খুবই গরীব। তাদের বসবাসের নিমিত্ত কোনো বাড়ি-ঘর ছিল না। কোনো কাজ-কারবার করার ক্ষমতাও তাদের ছিল না। মহানবী (সাঃ) তাঁদের প্রতি খেয়াল রাখতেন। বায়তুল মাল থেকে তাদের সাহায্য দিতেন। মসজিদে নবীর কিনারায় অবস্থিত এক জায়গায় তারা রাত কাটাতো।

মদীনার একটি এলাকায় অবস্থাপন্ন ইহুদীদের বসবাস ছিল। তারা ছিল আরবের মহাজন। সিরিয়া অবধি তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারিত ছিল। তাদের ধনসম্পদের কমতি ছিল না। সে জন্য মদীনায় তাদের খুবই প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। সেখানে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজিত ছিল। সকলেই আনন্দে ও খুশিতে দিন গুজারা করত।। পরস্পরের মধ্যে শান্তি ও পরম বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। প্রিয়নবী (সাঃ) চিন্তা করলেন, ইহুদিদের সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করা যাক। এখানে মুসলিম ও ইহুদিরা স্বাধীনভাবে বসবাস করুক। কেউ যেন কারো ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ না করে। কেউ যেন কারো প্রতি খবরদারি না করে। যেন কেউ কারো ধন-সম্পদে হস্তক্ষেপ না করে। শহরের উপর বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হলে তারা সম্মিলিতভাবে তার প্রতিরোধ করবে। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সকলকে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া হবে। তিনি (সাঃ) ইহুদিদের সাথে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। ইহুদিরা যারপরনাই খুশি হয়ে এ প্রস্তাব লুফে নিল। তারপর এক জায়গায় মিলিত হয়ে একটি চুক্তি সম্পাদন করা হল।

ইহুদিদের মধ্যে কিছু সুশিক্ষিত লোক ছিল। তারা প্রিয়নবীকে (সাঃ) দেখেই বুঝতে পেরেছিল যে, ইনি আল্লাহর মনোনীত নবী। আমাদের গ্রন্থেও তাঁর আগমনের সুসংবাদ দান করা হয়েছে। ইনিই আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও

রসূল। যে দ্বীন আমরা ভুলতে বসেছি সে দ্বীনেরই আমন্ত্রণ নিয়ে তিনি আমাদের মধ্যে এসেছেন। এ ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মানোর কারণেই তাঁরা পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু বেশি সংখ্যক ইহুদি ছিল খুবই বেয়াড়া ও বিপথগামী। তাঁরা মুহম্মদকে (সাঃ) সর্বশেষ নবী বলে স্বীকার করল না বা ঈমানও আনল না। এমন কী তারা চাইল না যে, তাদের ধর্ম ও সমাজের উপর মহানবীর প্রচারিত দ্বীন বা ধর্মের কোনও প্রভাব পড়ুক। শুরুতেই মহানবীর আগমনকে মুসলমানদের সঙ্গে মিলে তারা স্বাগতই জানিয়েছিল। এমন কী পরম খুশি ও আনন্দের সাথে তারা মহানবীর সাথে আপসমূলক চুক্তিতেও স্বাক্ষর করেছিল। এরও কারণ ছিল। তারা চাচ্ছিল যে, মহানবীকে (সাঃ) তারা তাঁদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ও দলভুক্ত করে নেবে। মহানবীকে (সাঃ) তাঁদের মতোই করে নেবে। তারা আরো ভেবেছিল যে, মহানবীর (সাঃ) সাথে সাথে মুসলমানরাও তাদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। এর ফলে , তাদের ধর্মও দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়বে। লোকেরা দিনরাত আমাদের পায়রাবি ও অনুসরণ করবে– দিনের পর দিন আমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলবে। সর্বত্রই তাদের বিজয়ডঙ্কা বাজবে আর খ্রিস্টধর্মের নাম-নিশানা পর্যন্ত মিটে যাবে।

ইহুদিরা এ নবীর আগমনের অপেক্ষায় দীর্ঘদিন ধরে দিন গুণছিল। তারা ভাবত যে, প্রতিশ্রুত নবীর আবির্ভাব তাদের মধ্যেই ঘটবে। তাই যেখানেই নবী আগমনের সম্ভাবনা ছিল তারা সেখানে গিয়েই তার অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকত। সর্বত্রই তারা এ বিষয়ে আরাপালোচনায় মগ্ন থাকত। কিন্তু তাদের আকাঙ্ক্ষা ভুল প্রমাণিত হল। প্রিয়নবী (সাঃ) সম্পূর্ণ নতুন ধর্মের বাণী শোনালেন। নতুন নতুন কথা শোনালেন। যা ছিল সম্পূর্ণরূপেই ইহুদিদের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনার বিরোধী। যার ফলে মহানবীকে বরদাশত করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ল। এখন ধৈর্য ও নীরবতা তাদের কাছে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলে বিবেচিত হল। দেখতে দেখতে তারা তাঁর পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াল। পূর্বে সম্পাদিত চুক্তির বিরুদ্ধে চলতে লাগল। সর্বত্রই বিরোধিতা ও বিদ্রোহের পরিবেশ সৃষ্টি করল। তারা শত্রুতা ও শত্রু সৃষ্টিতে খুবই পটু ছিল। 'শত্রু সৃষ্টি করো ও উদ্দেশ্য হাসিল করো'– এ ছিল তাদের পন্থা। এভাবে তারা পরস্পরের মধ্যে বিভেদ ও শত্রুতা সৃষ্টি করতে লাগল। কিন্তু তারা ব্যর্থ হল। তা সত্ত্বেও নিরাশ না হয়ে তারা নিত্যনূতন চাল চালতে লাগল। এবার তারা মদীনার পৌত্তলিকদের ক্ষেপিয়ে তুলল। তারা ইহুদিদের কথা শুনে তাদের দলে ভিড়ে গেল। কিন্তু মুসলমানরা ছিলেন এককাট্টা। তারা পরস্পরের মঙ্গলের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। সুতরাং মুসলমানকে দিয়ে মুসলমানের সর্বনাশ সাধন সম্ভব ছিল না। তারা তাদের সম্মিলিত চক্রান্তের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াইয়ের মাধ্যমে ইসলামকে সর্বত্রই ছড়িয়ে দেয়ার কাজে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রইলেন।

দশম অধ্যায়

তলোয়ারের ছায়ায় সত্যের সন্দেশ

— মুসলমানদের জন্য যুদ্ধের অনুমতি

— মুসলমানদের সুরক্ষা প্রয়াস

— আবু সুফিয়ানের সিরিয়া যাত্রা

— আতিকার স্বপ্ন, জমজমের অগ্নি প্রজ্বলন

— কুরাইশদের যুদ্ধের প্রস্তুতি

— কুরাইশ সৈন্যদের যুদ্ধ যাত্রা

— আবু সুফিয়ানের সংবাদ বাহক

— আবু জেহেলের অহঙ্কার

— আবু সুফিয়ানের চিন্তা

— প্রিয়নবীর (সাঃ) সাহাবাদের সাথে পরামর্শ

— সাহাবাদের (রাঃ) বীরত্বপূর্ণ ভাষণ

— মদীনা থেকে ইসলামী বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা

— যুদ্ধের ময়দানে প্রিয়নবীর (সাঃ) ঐতিহাসিক ভাষণ

— কুরাইশী গোয়েন্দা তৎপরতা ও তার প্রতিক্রিয়া

— বদরের রণক্ষেত্রে সত্যাসত্যের পার্থক্যজনিত মোকাবিলা

— অসত্যের পূজারীদের উপর শোকের ছায়া নেমে এলো

— প্রিয়নবীকে (সাঃ) হত্যার দ্বিতীয় চক্রান্তও ব্যর্থ।

দশম অধ্যায়

তলোয়ারের ছায়ায় সত্যের সন্দেশ

১

'যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হচ্ছে, এবার তাদেরও লড়াই করার অনুমতি প্রদান করা হল। কেননা, তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে এবং আল্লাহ তাদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সাহায্যদাতা।' –আল-কুরআন।

মক্কায় মুসলমানদের উপরে অব্যাহতভাবে অত্যাচার চলল আর মুসলমানরা তা নীরবে সয়ে যেতে লাগলেন। কঠিন কঠিন অত্যাচারে তাদের অতিষ্ঠ করা হতে লাগলো; আর তাঁরা তা পরম ধৈর্য সহকারে সয়ে যেতে লাগলেন। অনবরত অত্যাচারের ফলে মুসলমানদের পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে গেল তখন আল্লাহ তাঁদের মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় চলে যাবার আদেশ দিলেন। সেখানে পৌঁছানোর পর মুসলমানদের অবস্থান দৃঢ় হতেও দৃঢ়তর হয়ে উঠতে লাগল। এ দেখে পৌত্তলিকরা প্রমাদ গুণতে লাগল। তারা মুসলমানদের নির্মূল করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। তারা মদীনা আক্রমণ করে মুসলমানদের আক্রমণ করে তাদের সমূলে ধ্বংস করার এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করল। এমতাবস্থায়, সর্বশক্তিমান আল্লাহ মুসলমানদের যুদ্ধ করার অনুমতি দান করলেন। আদেশ হল এবার আঘাতের জবাব আঘাতে দাও। মারের জবাব মারে। শত্রুরা আক্রমণ করলে পূর্ণ শক্তিতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো।

ওদিকে মদীনায় আরেক সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। তা ছিল মুনাফিক বা কপটচারীদের উত্থান। তারা বাইরে মুসলমানদের বন্ধু ছিল, কিন্তু অন্তরে ছিল জঘন্যতম শত্রু। তারা মুসলমানদের ঈমান-আমানের জন্য এক বিরাট বিপদস্বরূপ হয়ে ওঠে। এরা ছিল প্রচ্ছন্ন শত্রু। তাদের স্বরূপ বোঝা ছিল অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তাদের ছিল মুখে মধু আর অন্তরে ছিল বিষ। সামনে তারা মুসলমানদের উৎসাহিত করত, কিন্তু পিছনে করত শত্রুতা। আল্লাহ এ শত্রুদের বিরুদ্ধেও কঠোর মোকাবিলার নির্দেশ দিলেন।

মক্কা ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বহুসংখ্যক অনুসারীর প্রিয় মাতৃভূমি। নিজেদের মাতৃভূমির প্রতি তাঁদের গভীর মমতা ছিল। কিন্তু সে মাতৃভূমি তাঁদের শত্রু হয়ে গেল। সেখানে তাঁদের শ্বাস নেয়ার পরিবেশ আর থাকল না। বাধ্য হয়ে তাঁদের মাতৃভূমি ত্যাগ করতে হল। নিরুপায় হয়ে ধনসম্পদ জায়গা-জমি সব তাঁদের ত্যাগ করতে হল। এমন কী কাবা শরীফের প্রতিও তাঁদের আর অধিকার থাকল না। হজ্জ এবং তাওয়াফের উপরেও

প্রতিবন্ধকতা নেমে এল। এজন্য প্রিয়নবী মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুচরদের দুঃখের অন্ত ছিল না। এবার তাঁদের দৃষ্টি মক্কার প্রতি নিবদ্ধ হতে লাগল। অত্যাচারিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ এসে গিয়েছিল। পবিত্র ইসলামকে রক্ষা করার জন্য তলোয়ার ব্যবহারের নির্দেশ এসে গিয়েছিল। এবার মুসলমানরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, অত্যাচারীদের তাঁরা সমূলে বিনাশ করবেন। কাফির ও মুনাফিকদের পক্ষ থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে যে বিপদ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তা নির্মূল করবেন। কাবাঘরকে কাফিরদের কবল থেকে মুক্ত করবেন। হজ্বের প্রতিবন্ধকতাও দূর করবেন।

মক্কার মুসলমানরা কী অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন ? তাদের ইচ্ছেটাই বা কী ? তা জানার জন্য মুসলমানরা দৌড়ঝাঁপ শুরু করলেন। তারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মদীনার বাইরে বেরিয়ে যেতে লাগলেন। সেখানে মক্কার কুরাইশদের কাফেলার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে তাঁদের খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন।

এক একটা দলে পঞ্চাশ থেকে একশ' করে লোক থাকত। এগুলোর মধ্যে পাঁচটি দল ছিল সবচেয়ে খ্যাতনামা। এর প্রথমটির নেতৃত্বে থাকতেন আমীর হামজা (রাঃ), দ্বিতীয়টিতে হজরত উবাইদা বিন হারিস (রাঃ), তৃতীয় দলে হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ), চতুর্থ দলে আবদুল্লাহ বিন জুহাইশ (রাঃ) এবং পঞ্চম দলের নেতৃত্বে থাকতেন স্বয়ং মহানবী মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এ দলগুলোর সাথে কুরাইশদের বড় কোনও সংঘর্ষ কখনোই হয়নি। লড়াইয়ের পরিস্থিতি শুরু হতেই তাঁরা কোনও রকমে তা এড়িয়ে যেতেন। এ দলগুলি আরো একটি কাজও করেছিলেন। তাঁরা পার্শ্ববর্তী বা নিকটবর্তী গোত্রগুলোর সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। তাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তিও করে নিয়েছিলেন। কেননা, তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে মদীনার জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠার সম্ভাবনার ছিল। সেখানে অশান্তি ছড়িয়ে পড়তে পারত। এ গোত্রগুলোর সাথে সহজেই শান্তিচুক্তি করে নেয়া হয়েছিল। এমন কী প্রয়োজনে তারা মুসলমানদের সহযোগিতা করার জন্য প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল।

হিজরতের পূর্বে আকবায় মদীনার আনসারদের প্রিয়নবী মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণের কথা কুরাইশরা জানতে পেরেছিল। এমন কী তারা একথাও জানতে পেরেছিল যে, আনসাররা মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য আত্মোৎসর্গ করতেও দ্বিধা করবে না। সেজন্য তারা শপথবদ্ধ হয়েছে। একথা জানার পর কুরাইশরা খুবই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। সেদিন তারা বুঝেছিল যে, তাদের দিন ফুরিয়ে আসছে। ভয়ংকর রকমের যুদ্ধ বাধতেও খুব বেশি দেরি নেই। সে যুদ্ধের আশঙ্কাই এখন বাস্তব রূপ ধরে তাদের সামনেই দণ্ডায়মান।

প্রিয়নবী মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের পরপরই কুরাইশরা বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের জন্য ভয়ংকর দিন এগিয়ে আসছে। সে দিনই আজ তাদের সামনে দণ্ডায়মান। কুরাইশরা সিরিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এখন বন্ধের পথে। কুরাইশদের সবচেয়ে বড় নেতা ছিল আবু সুফিয়ান। সে ছিল হারব এর পুত্র। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সে মক্কা থেকে যাত্রা করেছিল। তার খবরও অতি দ্রুত মদীনার মুসলমানদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল।

আবু সুফিয়ান সিরিয়ায় বাণিজ্য করতে গিয়েছিল। আরো অনেক কুরাইশ তার সঙ্গে ছিল। বাণিজ্যে অভাবনীয় সাফল্য লাভ করে প্রচুর ধন-সম্পদ নিয়ে মক্কার পথে রওয়ানা হয়েছিল।

আবু সুফিয়ান ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল– এ ভেবে যে, তাদের সম্পদ প্রচুর কিন্তু লোকজন কম। তাই সে আশঙ্কা করছিল যে, পথে যদি মুসলমানরা হামলা করে বসে তাহলে কী উপায় হবে? এ কথা ভেবে কুরাইশদের কাছে অতি দ্রুত একটি লোক পাঠিয়ে দিল। সে ছিলো আমরের পুত্র জমজম। আবু সুফিয়ান চাচ্ছিল যে, কুরাইশদের কাছে এ বিপদের খবর দ্রুত পৌঁছে যাক যাতে কুরাইশরা তাকে সাহায্যের জন্য লোক পাঠায়। জমজমকে সে এই বলে পাঠাল– 'তুমি মক্কায় পৌঁছেই তোমার বাহন উটের কান দুটি কেটে দেবে। নিজের জামা-কাপড় সামনে-পিছনে চিরে ফেলে পাগলের মতো চীৎকার করবে আর বলবে– 'সাহায্য কর! সাহায্য কর!!'

মক্কায় কোনও বিপদের কথা জানিয়ে কারো কাছে সাহায্য চাওয়ার এটাই ছিল রীতি। এভাবে সারা শহরে খবর ছড়িয়ে পড়ত। তারপর দেখতে দেখতে সেখানে লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ত।

২

দ্বিতীয় হিজরির শাবান মাসের কথা। মক্কায় আবদুল মুত্তালিবের কন্যা আতিকা এক স্বপ্ন দেখলেন। এ স্বপ্ন ছিল খুবই ভীতিকর। আতিকা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। ভয়ে তাঁর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি দেখলেন, এক উষ্ট্রারোহী খুব দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। তারপর 'আবতাহ'-এ এসে থেমে গেল এবং চীৎকার করে বলতে লাগল– 'কুরাইশবৃন্দ! তিন দিনের মধ্যে হত্যার উপত্যকায় পৌঁছে যাও।' একথা শুনেই সব লোক সেখানে জমা হয়ে গেল। তারপর সে লোকটি কাবা গৃহে পৌঁছে গেল। সাথে সাথে তারাও কাবাপ্রাঙ্গনে গিয়ে উপস্থিত হল। সমস্ত লোক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সে লোকটি হঠাৎ কাবা ঘরের ছাদের উপরে উঠে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে চীৎকার করে বলতে লাগল ঃ 'কুরাইশবৃন্দ! তিনিদিনের মধ্যে হত্যার উপত্যকায় পৌঁছে যাও।'

তারপর তার উট এক পাহাড়ের উপরে গিয়ে উঠল। পাহাড়টির নাম আবু কুবীস। সেখানে পৌঁছে সে পুনরায় চীৎকার করে বলল ঃ 'কুরাইশবৃন্দ! তিন দিনের মধ্যেই তোমরা হত্যার উপত্যকায় পৌঁছে যাও।'

তারপর সে বড় একটি পাথর উঠিয়ে সেটি সজোরে মাটির দিকে নিক্ষেপ করল। সেটি মাটিতে পড়ার সাথে সাথেই ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তারই ভাঙা টুকরো মক্কার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া হল। একটি ঘরও বাদ গেল না। আতিকা তাঁর ভাই আব্বাসকে ডেকে এ স্বপ্নবৃত্তান্ত শোনালেন। শুনে আব্বাস বললেন ঃ 'ভগিনী! এ স্বপ্নের কথা তুমি আর কাউকে বলো না। এ স্বপ্নবৃত্তান্ত কাউকে বলার মতো নয়।' কিন্তু স্বয়ং আব্বাস তা তার এক বন্ধুকে শোনালেন। সে শোনামাত্রই একথা ঝড়ের বেগে সারা মক্কা নগরে ছড়িয়ে পড়ল। আবু জেহেল ও তার সাথীরাও তা জেনে ফেলল। এ কথা শুনে আতিকাকে সে খুব ব্যঙ্গ করল। আবু জেহেল ব্যঙ্গ করে আব্বাসকে বলল– 'বাহ-বাহ!! এতদিন আমাদের মধ্য থেকে এক পুরুষ ব্যক্তি নবী হয়েছিল, এখন দেখছি একজন মহিলাও নবী হয়েছেন!'

কিন্তু আতিকার স্বপ্ন ছিল সত্য। জমজম তিন দিন পর মক্কায় এসে পৌঁছাল। মক্কায় পৌঁছেই সে তার বাহন উঠের দুটি কান কেটে দিল। তার গায়ের জামা সামনে-পিছনে ফেড়ে ফেলল। তারপর উন্মাদের মতো চীৎকার করে বলতে লাগলঃ 'কুরাইশবৃন্দ! লুই বিন গালিবের সন্তানগণ! তোমাদের কাফেলা এগিয়ে আসছে। মুশক্ ও সুগন্ধির বহর নিয়ে আসছে। এ ছাড়াও আরো অনেক মাল-সামান। তোমরা এগিয়ে গিয়ে তাদের রক্ষা করো। মুহম্মদ ও তার দলবলের লুট করে নেয়ার আগেই তাদের রক্ষা করো। তাদের সাহায্যের জন্য ছুটে চলো। মাল-সামান রক্ষা করো। তোমাদের সাথীদের বাঁচাও। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

৩

আরবদের আত্মম্ভরিতার কথা কে না জানে ? কোনও ব্যক্তি কারো হাতে নিহত হলেই হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ত আর দেখতে দেখতে ব্যাপক হানাহানি ও খুনোখুনি শুরু হয়ে যেত। দু পক্ষই পিঁপড়ের সারির মতো বেরিয়ে এসে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হত। রক্তের স্রোত বয়ে যেতো। বছরের পর বছর ধরে এ লড়াই চলতে থাকত। একের পর এক গোত্র নির্মূল হয়ে যেতো। পরস্পরের অগণিত আত্মীয় পরিজন এ লড়াইয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। এ লড়াই শেষ হওয়ার কোনও লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যেত না। আরবে লেখাপড়ার কোনো রীতি-রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু নিহত ব্যক্তির নাম কাগজে লেখা হত এবং তার রক্তপণ নেয়ার জন্য বংশপরম্পরায় লড়াই অব্যাহত থাকত। আরবের এক ভয়ংকর ও রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের ঘটনা কে না জানে ? এ লড়াই চল্লিশ বছর ধরে

অব্যাহত ছিল। হাজার হাজার মানুষের জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়েছিল সে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে। এরকমই আর এক যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। ঘটনাটি ছিল এরকম ঃ

হিজরি দু' সনের রজব মাসের কথা। প্রিয়নবী মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বার জনের একটি দল নাখলা উপত্যকায় প্রেরণ করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল এ দল কুরাইশদের সামগ্রিক গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবে আর সে খবর মদীনায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবগত করাবে। সে সময়ে কুরাইশদের সংঘবদ্ধ একটি দল ঐ উপত্যকা অতিক্রম করছিল। তাদের দেখামাত্রই এরা তাদের উপরে হামলা চালিয়ে বসল। তাদের ধন-সম্পদ লুট করল, একজনকে হত্যা এবং দু'জনকে বন্দী করল। এ নিহত ব্যক্তি ছিল আমর বিন হাজরমি। সে ছিলো আমীর বিন হাজরমির ভাই। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুঃসংবাদ শুনে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাদের বললেন ঃ 'আমি তো তোমাদের এ কাজের জন্য পাঠাইনি!'

ওদিকে কুরাইশরা এ ঘটনা জানতে পেরে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। তাদের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। তারা এতদিন যুদ্ধের ফিকিরেই ছিল। আর ঠিক এ সময়েই জমজমের আর্তচীৎকার আগুনে ঘি ঢেলে দিল। এবার তারা উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল। সাথে সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিল। বিলম্ব না করেই তারা সমাজের বীর-জওয়ানদের একত্রিত করল। উট ও ঘোড়ার ব্যবস্থা করেই তারা রণসাজে সজ্জিত হয়ে উঠল। ক্রোধে তারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে উঠেছিল। মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তারা যেন এই অবস্থাটার জন্যই অপেক্ষা করছিল। তাদের এ প্রতিশোধ স্পৃহা একটা সার্বিক রূপ ধারণ করেছিল। প্রত্যেকটি লোকই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। যে নিজে যুদ্ধে যেতে অপারগ ছিল সে তার পক্ষ থেকে আলাদা লোকের ব্যবস্থা করল।

সমস্ত কুরাইশ গোত্রপতি এতে অংশগ্রহণ করল। কিন্তু আবু লাহাবের সাহস হল না। সে চার হাজার দিরহামের বিনিময়ে এক ব্যক্তিকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করিয়ে নিজে না গিয়ে তাকে যুদ্ধে পাঠাল। কিন্তু কেউ যুদ্ধে যেতে ইতস্তত করলে সে তাদের ব্যঙ্গ করে বলতে লাগল, তোমরা তো নরীদের মতো ভীতু। ঘরের বাইরে যেতে ভয় পাও। সত্যি, তোমাদের এ পুরুষত্বহীনতা খুবই লজ্জাজনক ব্যাপার। এর ফলে, কেউ আর লজ্জায় ঘরে থাকতে পারল না। 'যুদ্ধং দেহি' বলে তারাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

কিছু লোক মানুষের মনে সাহস আর উত্তেজনা ছড়ানোর কাজে নেমে পড়ল। তাদের মধ্যে সুহাইল নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বলল ঃ

'বিজয়ের বরপুত্রগণ! তোমরা কী চাও যে, মুসলমানরা আমাদের কাফেলার উপর আক্রমণ চালিয়ে আমাদের সর্বস্ব লুট করে নিক! আমাদের সবকিছুকে তারা কেড়ে নিক! আমাদের উটগুলোকে তার হাঁকিয়ে নিয়ে যাক ? যদি না চাও, তাহলে আর বিলম্ব নয়। সকলেই প্রস্তুত হও। যদি মালের প্রয়োজন হয় তাহলে এসো যত প্রয়োজন নাও। যদি যুদ্ধাস্ত্রের প্রয়োজন হয় তাহলে এসো তাও প্রস্তুত। কোন কিছুরই কমতি নেই।

সাড়ে ন'শ লোক নিয়ে কুরাইশরা বেরিয়ে পড়ল। সাথে নিল এক'শ ঘোড়া আর সাড়ে সাত'শ উট। পদাতিক বাহিনী লৌহবর্মে আপাদমস্তক আবৃত হয়ে বীর বিক্রমে এগিয়ে চলল। এ ছাড়াও এক'শ লোকের এক তীরন্দাজ বাহিনীও এগিয়ে চলল। এ দলে নাচনেওয়ালী-গানেওয়ালী মহিলারাও চলল। এরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উদ্দেশ্যে অশ্লীল ও নোংরা কবিতা আবৃত্তি করত আর নেচে নেচে পুরুষদের উত্তেজিত করত।

কুরাইশদের এ বাহিনী মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুণ্ডুপাত করতে করতে মদীনা অভিমুখে দম্ভভরে এগিয়ে চলল। তারা শুধু তাদের বাণিজ্য-কাফেলাকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে নয়; বরং ভবিষ্যতে তাদের কাফেলা আর যাতে কখনো কোন কালে বিপদে পতিত না হয় তার চূড়ান্ত সুরাহা করতে এগিয়ে চলল। আর সেই সাথে মদীনায় মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নেতৃত্বে যে নয়াশক্তি জেগে উঠছে তাকে সমূলে বিনাশ করা, যাতে কুরাইশরা চিরকালের জন্য নিরাপদ হয়ে যায়।

ওদিকে আবু সুফিয়ান কাফেলা নিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে হিজাজের নিকটবর্তী স্থানে এসে পড়ল। সে খুবই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল এই ভেবে যে, পাছে সে মুসলমানদের হাতে এসে পড়ে।

সেই সাথে সে জমজমের পথের দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলল। মনে মনে ভাবতে লাগল, জমজম নিশ্চয়ই সদলবলে তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছে। কিন্তু সে কাউকেই পেল না।

তারপর রাত্রি নেমে এল। এ রাতে আবু সুফিয়ানের কাফেলা বদর প্রান্তে এসে পড়ল। এখানে আসতেই কাফেলার উটগুলি অতিদ্রুত বদরের পানির স্রোতের দিকে এগিয়ে চলল। যদি উটগুলির সে মুহূর্তের পানি খাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। তারপর উটের বহর সেখানে নেমে প্রাণ ভরে পানি পান করল।

কাফেলার লোকজন উষ্ট্রকুলের এ অস্বাভাবিক আচরণ দেখে ঘাবড়ে গেল। তারা উদ্বিগ্নচিত্তে ভাবতে লাগল যে, উটদের এরকম অস্বাভাবিক আচরণ তো জীবনেও দেখিনি!

আজ কেন তারা এমন করল ? রাতও ছিল গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাদের বোধবুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। এর ফলে তারা আরও ঘাবড়ে গিয়ে প্রচণ্ড ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল।

আবু সুফিয়ান এবার গতিপথ পরিবর্তন করল। সে আশঙ্কা করল যে, মুসলমানরা বদর প্রান্তরের আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। তাই সে অন্য পথ ধরল। বদর থেকে পথ পরিবর্তন করে সমুদ্রতটের দিকে এগিয়ে চলল। বদরকে বাঁ-প্রান্তে রেখে আবু সুফিয়ান দ্রুতবেগে পথ চলতে লাগল।

এদিকে কুরাইশরা মক্কা থেকে রওনা হয়ে গেছে। রাস্তায় পানির উপস্থিতি দেখে সেখানেই তারা শিবির স্থাপন করতে লাগল। এ পথেই তারা উট জবাই করল, নিজেরা খেল এবং অন্যদের খাওয়াল। মাংস ও মদের ফোয়ারা বইয়ে দিতে লাগল। তারপর পর্যায়ক্রমে তারা পুনরায় পথ চলতে লাগল।

এভাবেই খাওয়া-দাওয়া, আরাম-আয়েশ আর আনন্দ-ফুর্তির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল তাদের অভিযান। সে সময়ে মক্কা থেকে এক ব্যক্তি তাদের কাছে এসে পৌঁছাল। সে তাদের বলল ঃ 'ভাইসব! তোমরা মক্কায় ফিরে চল। আমাদের বাণিজ্য-কাফেলা নির্বিঘ্নে মক্কায় এসে পৌঁছেছে। মুহম্মদ ও তাঁর সাথীদের সাথে পথে কোন সাক্ষাৎই হয়নি। এখন ভালোয় ভালোয় মক্কায় ফিরে চলো। মদীনাবাসীদের সাথে কোনও সংঘর্ষের কথা মনে আর জায়গা দিয়ো না। তাহলে তারা আমাদের টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবে।'

কুরাইশ ভাইসব! আর এগিয়ো না। কাফেলা নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছে। এর চেয়ে বড় কথা আর কী হতে পারে ? তোমরা তো কাফেলাকে রক্ষা করার জন্যই বেরিয়েছিলে। কাফেলা ভালোয় ভালোয় ফিরে এসেছে। এখন আমাদের আর অগ্রসর হওয়ার কী প্রয়োজন ? তাই এখন সবাই মক্কায় ফিরে চলো।'

ঐ ব্যক্তি এসব কথা সকলের ভালোর জন্যই বলেছিল। কিন্তু তারা এসব ভালো কথা শোনার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। অধিকাংশ লোকই তার কথা মানতে অস্বীকার করল। তাবে বনু হাশিম গোত্র একথার যৌক্তিকতা স্বীকার করে ফিরে যেতে রাজি হল। তারা মক্কায় ফিরতে চাইলেন। কিন্তু আবু জেহেল বাধ সাধল। সে চীৎকার করে বলল ঃ 'না। আল্লাহর কসম, আমরা কখনোই ফিরে যাব না। আমরা অবশ্যই বদর পর্যন্ত যাব।'

বদর একটি গ্রামের নাম। সেখানে প্রতি বছরই মেলা বসত। তা 'বদর মেলা' বলে পরিচিত ছিল। মদীনা থেকে আশি মাইল দূরে অবস্থিত। ঐ ব্যক্তি মক্কায় আবু সুফিয়ানের কাছে ফিরে এল এবং সে তাকে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল। যে সমস্ত কথাবার্তা হয়েছিল সে পুরোটাই তার কাছে বর্ণনা করল। আবু সুফিয়ান একথা শুনে খুবই আফসোস করল এবং সাথে সাথে দুঃখিত চিত্তে

স্বগতোক্তি করলঃ 'হায়রে আমার সম্প্রদায়। এর সবটাই তো আবু জেহেলের কারসাজি। সে ফিরতে প্রস্তুত নয়। কারণ, সে আজ তাদের নেতা হয়ে গেছে। সে খুবই বাড়াবাড়ি করছে। এসব হঠকারিতা তো তারই। এ ছিলো সকলের জন্যই ভাল একটি প্রস্তাব। কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করল। অন্যের সুপরামর্শ গ্রহণ না করা চরম হঠকারিতা। এখন এর ফল সবাইকে ভোগ করতে হবে।

৪

মহানবী মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরো ঘটনাই অবগত হলেন। তিনি নিশ্চিতরূপে জানতে পারলেন যে, আবু সুফিয়ান তার বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কায় ফিরে গেছে আর এদিকে মক্কার কুরাইশরা মদীনা আক্রমণের জন্য দ্রুত এগিয়ে আসছে। এখন তিনি নিশ্চিতরূপে বুঝলেন যে, এক চূড়ান্ত ফায়সালার দিনক্ষণ দ্রুত এগিয়ে আসছে। এখন যদি সাহসিকতার সাথে তার মোকাবিলা না করা যায় তাহলে ইসলামের মিশন সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হবে' আর তাঁরা আর কখনোই মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ পাবেন না। সুতরাং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

মহানবী মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় এসেছেন এখনও পুরো দু'বছরও হয়নি। মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর নিবেদিতপ্রাণ সাহাবিরা একেবারে দীনহীন ও নিঃস্ব অবস্থায় মক্কায় এসেছিলেন। এদিকে আনসাররা পুরোপুরি স্থিতিশীল নয়, অন্যদিকে ইহুদিরা অন্ধের মতো বিরোধিতা করছে আর ওদিকে পৌত্তলিক ও কপটচারীরা সদাসর্বদাই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত–অর্থাৎ চারিদিকেই শত্রুবেষ্টিত অবস্থায় দিন অতিবাহিত করছে শিশু ইসলাম। সবাই মিলে ইসলামকে গলা টিপে মারার জন্য উদ্যত। এমতাবস্থায় মক্কার ধর্মদ্রোহী পৌত্তলিকরা যদি মদীনায় মুসলিমদের উপর হামলা করে বসে তাহলে ইসলাম নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এখন যদি কুরাইশরা মদীনায় আক্রমণ না চালিয়ে মক্কায় ফিরে যায় তাহলে তাদের অবস্থাও খুবই তীব্র হয়ে পড়বে। মক্কার শিশুরাও তাদের কাপুরুষতা দেখে উপহাস করবে। আবার তারা যদি শুধু কাফেলা রক্ষা পাওয়ার কথা শুনে মক্কায় ফিরে যেতো তাহলে অবস্থা অন্যরকম হত। এমতাবস্থায় বদরাভিমুখী কুরাইশরা উভয় সংকটে পড়ে গেল। তারা ভাবল, মক্কায় খালি হাতে ফিরে গেলে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি হবে এবং পরবর্তীকালে তারা তাদের জন্য বিপজ্জনক বলে প্রতীয়মান হবে। আবার এদিকে কুরাইশ বাহিনীকে যদি ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে তারা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তাদের ইঙ্গিতে সমস্ত পৌত্তলিক গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে এবং মদীনার ইহুদি, পৌত্তলিক ও কপটচারিদের ঔদ্ধত্য বেড়ে যাবে। আর পুরোটাই হবে ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। যার ফলে,

মদীনায় মুসলমানদের বসবাস করা সুকঠিন হয়ে পড়বে। মুসলমানরদর আর কোনও মানমর্যাদা ও প্রতিপত্তি কেউ স্বীকার করবে না। শত্রুরা যাকে ইচ্ছা তাকে আঘাত করবে, হত্যা করবে। তাদের ধনসম্পদ ও ইজ্জত-সম্ভ্রমে হামলা চালাবে। এসব কথা বিবেচনা করে মহানবী মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার কাছে যা আছে, যার যা শক্তিসাহস আছে তা জমা করে সম্মিলিতভাবে বেরিয়ে পড়বেন এবং যুদ্ধের প্রান্তরে পৌঁছে ভাগ্য পরীক্ষা করবেন।

এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের একত্রিত করে সমস্ত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সকলের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ 'আমাদের উত্তর প্রান্ত দিয়ে কুরাইশদের বাণিজ্য-কাফেলা এগিয়ে আসছে, অন্য প্রান্ত (দক্ষিণ) দিয়ে কুরাইশ বাহিনী এগিয়ে আসছে। এখন বলো, তোমরা কোন দিকে অগ্রসর হতে চাও ?' তাঁর কথা শুনে একটি বড় দল বলল ঃ 'কাফেলার দিকে।' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আরও কিছু কথা বলার ছিল। তাই তিনি পুনরায় একই প্রশ্ন করলেন।

একথা শুনে হজরত আবুবকর (রাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বললেন। তিনি ছিলেন শান্ত মেজাজের একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাই ধীরস্থিরভাবে অত্যন্ত বীরত্বব্যঞ্জক বক্তব্য দেয়ার পর বসে পড়লেন। এরপর উঠলেন হজরত উমর (রাঃ)। তিনি অতি সুন্দরভাবে অত্যন্ত বীরত্বব্যঞ্জক ভাষণ দিলেন।

এরপর উমরের (রাঃ) পুত্র মিকদাদ (রাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে বললেন– 'আল্লাহর রসূল! যেদিকে আল্লাহর আদেশ হয় সেদিকেই চলুন। আমরা আপনার সাথে আছি। বনী ইসরাইলরা তো তাদের নবীকে বলেছিলো, 'আপনি ও আপনার খোদা গিয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানে বসে থাকি।' কিন্তু একথা আমরা বলি না। আমরা বলি যে, চলুন, আপনার সাথে আপনার খোদাও চলুন এবং যুদ্ধ করুন। আমরাও আপনার সাথে যুদ্ধ করব এবং আমরা আমাদের শেষ রক্তবিন্দুটুকু দিয়েও শত্রুর মোকাবিলা করব। কোন অবস্থাতেই আমরা আপনাকে পরিত্যাগ করব না।'

প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ভাষণ শুনে খুবই খুশি হলেন এবং হজরত মিকদাদের প্রশংসা করে তাঁর জন্য দোয়া করলেন।

তারপর বললেন ঃ 'লোকসকল! তোমরাও কিছু বলো।'

আনসাররা বুঝতে পারলেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের প্রতিই ইঙ্গিত করছেন। প্রকৃতপক্ষে, আনসারদের জন্য এটাই ছিল প্রথম সুযোগ। এর পূর্বে আর কোন ব্যাপারেই তারা মতামত প্রকাশ করেনি।

হজরত সা'দ বিন মা'আজ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ 'আমি সমগ্র আনসারদের পক্ষ থেকে বলছি। আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি। আমরা

আপনাকে সত্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে মেনে নিয়েছি। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনার প্রতিটি বাক্যই সত্য। আমরা আপনার প্রতি আনুগত্যের শপথ পেশ করছি। আল্লাহর নবী! আপনি আমাদের প্রতি যে কাজের ইঙ্গিত করেছেন সে কাজের নিমিত্ত এগিয়ে চলুন। আল্লাহর কসম! আপনি যদি আমাদের সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলেন, তার জন্যও আমরা প্রস্তুত। কোন অবস্থাতেই আমরা আপনাকে ত্যাগ করব না। আপনি যাদের সঙ্গে ইচ্ছা সন্ধি করুন, যাদের বিরুদ্ধে ইচ্ছা যুদ্ধ করুন। আমাদের মালসম্পদ সবই আপনার পদপ্রান্তে নিবেদন করছি। তা থেকে যা ইচ্ছা গ্রহণ করুন। আপনার যত ইচ্ছা সম্পদ আপনি তা থেকে নিন। আমরা তাতে যারপরনাই খুশি হব। এ পথে আমরা ইতিপূর্বে আর কখনো যাইনি। এ ব্যাপারে আমাদের কোনও অভিজ্ঞতাও নেই কিন্তু আমরা শত্রু দেখে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করি না। আমরা তো রণক্ষেত্রের বীর-কেশরী। আমরা রণক্ষেত্রে শেষ রক্তবিন্দুটুকু দিয়েও যুদ্ধ করতে পারি। রণক্ষেত্রে আমরা এমন বীরত্ব দেখাব যে, তা দেখে আপনি খুশি হবেন এটাই আমরা আশা করি।'

এ ছিলো গভীর ভালবাসা ও নিষ্ঠাপূর্ণ ভাষণ। এ শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড়ই খুশি হলেন এবং হজরত সা'দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তাঁর জন্য দোয়া করলেন।

হজরত সা'দের ভাষণের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'আল্লাহর নাম নিয়ে অগ্রসর হও। তোমাদের সাথে থাকবে তাঁর অনুগ্রহ। তিনি আমাকে বড় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আমার চোখের সামনে শত্রুদের ধ্বংসের ময়দান ভেসে উঠছে।'

তারপর তিনি তাঁর সাথীদের শত্রুদের ধ্বংসের ময়দানের কথা বললেন এবং সাথে সাথে আরো বললেন ঃ অমুক ব্যক্তি এখানে নিহত হবে অমুক ব্যক্তিকে অমুক ব্যক্তি হত্যা করবে।'

এখন লোকেরা বুঝতে পারল যে, যুদ্ধ হবে। সেনাবাহিনী রওয়ানা হল।

হিজরতের দ্বিতীয় বছরের রমজান মাসে মদীনা থেকে এক মাইল দূরে 'বিইরু আবী ইনবা' নামক স্থানে পৌঁছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৈন্য নির্বাচনের জন্য শিবির স্থাপন করলেন। যারা অল্পবয়সী ছিল তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। তারপর যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হলেন। বুধবারের রাতে রৌহা পৌঁছালেন। সেখানে পৌঁছে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অজু করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। শেষ রুকুর শেষে তিনি শত্রুদের অভিশাপ দিলেন। বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! আবু জেহেল এ সম্প্রদায়ের ফেরাউন। তুমি তাকে ধ্বংস করে দাও।'

তারপর তিনি সামরিক কায়দায় সেনা সজ্জিত করলেন। মুহাজিরদের পতাকা তিনি হযরত মুসআব বিন উমাইরকে প্রদান করলেন। খাজরাজদের

পতাকা হযরত হুবাব বিন মুঞ্জিরকে প্রদান করলেন এবং আউস গোত্রের নেতৃত্বের ভার অর্পণ করলেন হযরত সাদ বিন মাআজকে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথীদের নিয়ে এগিয়ে চললেন। তাঁর সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র তিন শ' তের জন। সাথে ছিল সত্তরটি উট ও তিনিটি মাত্র ঘোড়া। বদর প্রান্তরে পৌঁছে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাত্রা স্থগিত করলেন। সেখান থেকে আলি (রাঃ), জুবাইর (রাঃ) এবং সাদ বিন ওয়াক্কাস (রাঃ)কে পাঠিয়ে দিলেন শত্রুর গতিবিধি নিরূপণ করতে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ 'এই পাহাড়ের পাশে একটি কুয়া আছে। ওখানে গিয়ে দেখ, কুরাইশদের ব্যাপারে কোন খোঁজখবর পাওয়া যেতে পারে।'

তাঁরা সেখানে গিয়ে দেখলেন কুরাইশদের কিছু লোক সেখানে পানি পান করছে। তাদের মধ্যে দু'জন ক্রীতদাসও ছিল। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, এরা আবু সুফিয়ানের ক্রীতদাস। অনতিবিলম্বেই তারা তাদের গ্রেফতার করলেন। অন্যান্য লোকেরা পালিয়ে যেতে সমর্থ হল।

তারা পালিয়ে তাদের নিজেদের লোকদের কাছে পৌঁছে গেল। তাদেরই একজন বলল ঃ 'কুরাইশগণ! মুসলমানরা তোমাদের কয়েকজন সাথীকে গ্রেফতার করেছে এবং তাদের বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেছে।'

একথা শুনেই কাফেররা আগুনের মতো জ্বলে উঠল। ক্রোধে তারা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। সেনাবাহিনীর মধ্যে শোরগোল উঠল। ওদিকে হযরত আলি (রাঃ) ও তাঁর সাথীরা ঐ ক্রীতদাসদের নিয়ে মহানবীর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেবায় সেখানে পৌঁছালেন। মুসলমানরা তাদের কাছে আবু সুফিয়ানের গতিবিধি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। তারা বলল ঃ 'আমরা আবু সুফিয়ানের খবর জানি না। আমরা কুরাইশবাহিনীর লোকদের পানি খাওয়ানোর দায়িত্বে নিয়োজিত।' একথা বলতেই লোকেরা তাদের মারতে লাগল। তারা বারবারই বলতে লাগল, আমরা আবু সুফিয়ানের ক্রীতদাস। তখন তাদের মার থামতে লাগল।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন নামায পড়ছিলেন। নামায পড়া শেষ হলে তিনি বললেন ঃ 'তারা দু'জন যখন সত্যিকথা বলছে তখন তোমরা তাদের মারছ আর যখন মিথ্যা বলছে, তখন থামছ। আল্লাহর কসম, তারা সত্যি কথা বলছে। বাস্তবিকই তারা কুরাইশদের লোক।' তারপর তিনি তাদের বললেন ঃ 'আবু সুফিয়ান সম্পর্কে কিছু বল।'

দুই ক্রীতদাস অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললঃ 'আমরা আবু সুফিয়ানকে দেখিনি। তাঁর সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ 'আচ্ছা, কুরাইশরা কোথায় ?'

দুই ক্রীতদাস ঃ 'এখান থেকে সামান্য কিছু দূরে।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ 'তাদের বাহিনীতে কত সৈন্য আছে ?'

দুই ক্রীতদাস ঃ 'আল্লাহর কসম তাদের সংখ্যা অনেক।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ 'তারা প্রতিদিন ক'টি উট জবাই করে ?'

দুই ক্রীতদাস ঃ 'একদিন নয়, একদিন দশ।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথীদের বললেন ঃ 'শত্রুসৈন্যের সংখ্যা নয় থেকে দশ হাজারের মধ্যে।'

তারপর বললেন ঃ 'মক্কা তার কলিজার টুকরোগুলোকে তোমাদের দিকে চেলে দিয়েছে।'

৫

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছে তাঁর সাথীদের বললেন ঃ 'আমাদের কোথায় অবস্থান করাটা ঠিক বলে তোমরা বিবেচনা করো ?'

হুবাব বিন মুঞ্জির বললেন ঃ আল্লাহর রসূল! অগ্রসর হয়ে আগে পানির কুঁয়োগুলি কব্জা করে নেয়া হোক। ওখানকার ব্যাপারে আমরা ভালোমতোই জানি। প্রত্যেকটি কুঁয়োই আমরা দেখেছি। ওখানে এমন একটা কুঁয়ো আছে যার পানি কখনোই শুকায় না। আর তার পানিও ভারি মিঠা। ওখানে এক হাউজ নির্মাণ করে আমরা পানি ভর্তি করে রাখি। এখানে আমরা প্রচুর পানি পাবো আর শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই চালাব। আর আশেপাশের সমস্ত কুঁয়ো আমরা নষ্ট করে দেবো।'

তিনি চাচ্ছিলেন যে, আগে থেকেই পানির ব্যবস্থা করে রাখা হোক। নইলে শত্রুরা তা অবরোধ করলে আমাদের জন্য তা ক্ষতির কারণ হবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হুবাব! তোমার প্রস্তাবই ঠিক।' তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে তাঁর বীর সাথীরাও। গিয়ে পানির কুঁয়োগুলো অধিকার করে নিলেন। হুবাবের কথা অনুযায়ী কাজ হল।

সৌভাগ্যবশত সে রাত্রে বৃষ্টি হল। বৃষ্টির কারণে বালি আর মাটি জমে গেল। ফলে, যাতায়াত সহজ হয়ে উঠল। স্থানে স্থানে পানি বন্ধ করে হাউজ বানিয়ে নেওয়া হল। মুসলমানরা সে পানিতে প্রাণভরে গোসল করে একেবারে সাফসুত্‌র হয়ে গেলেন। সকলেই সতেজ হয়ে উঠলেন।

কুরাইশদের দিককার মাটি ছিল খুবই নীচু আর নরম। ফলে, পানি জমে পিছল হয়ে গেল। ফলে, চলাফেরা কঠিন হয়ে পড়ল। মুসলমানদের জন্য এ বৃষ্টি হল রহমত স্বরূপ আর আর মুসলমানদের শত্রুদের জন্য তা আযাব বলে প্রতীয়মান হল।

প্রিয়নবী মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) ও আবদুল্লা বিন মাসউদকে (রাঃ) শত্রুদের গতিবিধি নিরীক্ষণের জন্য প্রেরণ করলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা ঘোরা-ফেরা করে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে শিবিরে ফিরে এলেন। এসে তাঁরা বললেন ঃ 'শত্রুদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। আর সে সাথে অনবরত বৃষ্টি হচ্ছে।'

সাদ বিন মাআজ (রাঃ) বললেন ঃ 'একটি পাহাড়ের উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য একটি তাঁবু নির্মাণ করা হোক। যাতে সেখানে বসেই তিনি যুদ্ধের গতিবিধি নিরীক্ষণ করতে পারেন। প্রয়োজনে তিনি ছায়া পেতে পারবেন। চাইলে শুতে ও আরাম করতে পারবেন। আর দোয়া ও নামাজের জন্যও তা হবে নিরাপদ জায়গা।' এ প্রস্তাব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খুবই পছন্দ হল। তারপর সেখানে যথারীতি একটি তাঁবু স্থাপন করা হল।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের ময়দানে গেলেন। সাথে গেলেন তাঁর অতি প্রিয় কয়েকজন বিশিষ্ট সাথী। তিনি এক এক করে কুরাইশ সরদারদের নাম ধরে ধরে বললেন ঃ 'অমুক ব্যক্তি এখানে নিহত হবে আর অমুক ব্যক্তি ওখানে নিহত হবে।'– যুদ্ধের পরে দেখা গেল সেই সেই ব্যক্তিদের লাশ ঐসব জায়গাতেই পড়ে রয়েছে। কেউই সেসব জায়গা থেকে সামান্য আগে-পিছেও ছিল না।

তারপর তিনি সৈন্যদের মধ্যে গিয়ে পৌঁছালেন। তারপর একজন সমর-বিশেষজ্ঞের ন্যায় সৈন্যদের ব্যুহ রচনা করলেন। তারপর যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন। এ ভাষণ ছিল খুবই উদ্দীপক ও প্রেরণাদায়ক। আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়ার পর বললেন ঃ 'প্রিয়তম ভ্রাতৃবৃন্দ! আমি তোমাদের সেই বস্তুর দিকে এগিয়ে যেতে বলছি যা আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আর আমি তোমাদের সে বস্তু থেকে নিবৃত্ত করছি যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমতাশালী ও মর্যাদাবান। তিনি ন্যায় কাজের প্রতি নির্দেশ দেন। তিনি সত্যকে পছন্দ করেন। তিনি স ৎকর্মশীলদের উচ্চে স্থান দান করেন। তাঁর পথের পথিকদের তিনি মর্যাদায় উন্নীত করেন।

বর্তমান সময়ে তোমরা ন্যায় ও সত্যের এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছ। আল্লাহর দরবারে সে কাজই গৃহীত হয় যা তাঁর উদ্দেশেই করা হয়। এখন

তোমরা ধৈর্য ও সততার সঙ্গে কাজ কর। কেননা, এখন যুদ্ধের সময়। যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণ করলে শান্তি ও আত্মবিশ্বাস লাভ করা যায়। উদ্বেগ ও কষ্ট দূর হয়ে যায়। সবশেষে তা নাজাত (মুক্তি) বয়ে আনে।

তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নবী উপস্থিত রয়েছেন। যিনি তোমাদের মন্দকর্ম হতে বিরত থাকতে বলেন আর সৎকর্মের নির্দেশ দেন। আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন খারাপ কাজ যেন সম্পন্ন না হয় তাহলে আল্লাহ তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন, 'যা তোমাদের বিবেকবিরুদ্ধ আল্লাহর অসন্তুষ্টি তার চেয়েও বেশি।'

আল্লাহ তোমাদের যে গ্রন্থ প্রদান করেছেন, তা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর। তোমাদের যে নিশানা দেখিয়েছেন তার উপর মনোযোগী হও। অনাদরের পর তোমরা যে আদর পেয়েছো তা থেকে দূরে সরে যেওনা। এতে আল্লাহ খুশি হবেন। আল্লাহ আজ তোমাদের আত্মবিশ্বাস চাইছেন। এ সুযোগে তোমরা নিষ্ঠা ও বীরত্বের প্রমাণ দাও। তোমাদের উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হবে। তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। তাঁর কথা চিরসত্য। তাঁর গ্রেফতারও অতি কঠিন। আমরা সবাই তাঁরই অনুগ্রহের দান। তিনি সর্বদাই আছেন এবং অনন্তকাল থাকবেন। তিনি সমস্ত জগতের অধীশ্বর। তিনি আমাদের সহায়। আমরা তাঁকে শক্তভাবে ধারণ করে আছি। আমরা তাঁর উপরেই নির্ভরশীল। তিনিই আমাদের আশ্রয় ও শান্তিদাতা। আল্লাহ আমাকে এবং মুসলমানদের ক্ষমা করুন।'

ওদিকে কুরাইশরা উমাইর বিন ওয়াহাবকে গোপনে পাঠাল মুসলমানদের গতিবিধি ও সামগ্রিক অবস্থা নিরীক্ষণের জন্য। সে ঘুরে-ফিরে মুসলমানদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করে ফিরে গিয়ে কুরাইশদের বলল ঃ 'মুসলমানদের সংখ্যা খুব জোর তিন'শ হবে। তাদের সাথে রয়েছে মাত্র সত্তরটি উট ও তিনটি ঘোড়া।'

তারপর সে আরো বলল ঃ 'কুরাইশ ভাইসব! বিপদ ঘনিয়ে আসছে। যার পরিণাম মৃত্যু। মদীনার উট মৃত্যুর বাহন। তোমরা শুনে রাখো, সেই লোকেরাই এগিয়ে আসছে যাদের তরবারি ব্যর্থ হয় না। তোমরা দেখছ না ? তারা চুপচাপ রয়েছে। কিছুই বলছে না। কিন্তু সাপের মতো ফুঁসছে। আল্লাহর কসম, আমার মনে হচ্ছে, তাদের মধ্য থেকে যে মরবে তারা আমাদের না মেরে মরবে না। এখন বলো, এতগুলো মানুষ যদি আমরা বেঘোরে মারা পড়ি তাহলে আমাদের জীবনের আর কী মূল্য থাকল ?'

উমাইরের কথা কুরাইশদের বিশ্বাস হল না। তারা অন্য এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিল। সে লুকিয়ে লুকিয়ে ইসলামী সৈন্যদের কাছে পৌঁছাল। ঘোড়ায় চড়ে সে চারিদিক ঘুরে সবটাই নিরীক্ষণ করল। তারপর সে ফিরে এসে বলল ঃ

'আল্লাহর কসম! তারা সাধারণ শক্তিতে শক্তিমান নয়। তারা সংখ্যায় অনেক কম। তাদের অস্ত্রশস্ত্রও অনেক কম। কিন্তু কথা হল তারা মরার জন্য এসেছে। তারা এখন আর ঘরে ফিরে যেতে চাচ্ছে না। তলোয়ারই তাদের শক্তি। তরবারিই তাদের আশ্রয়দাতা। এখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা করো।'

এ কথা শুনে কিছুলোক ভয়ে কাঁপতে লাগল। সে উদ্যমহীন হয়ে পড়ল। সে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। কিছু লোককেও সে বোঝাল। তারাও তার সঙ্গে মিলে মক্কায় ফিরে গেল।

কুরাইশ বাহিনী রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হল। প্রত্যেক সৈন্যেরই পা থেকে মাথা পর্যন্ত বর্ম দ্বারা আবৃত। এ ছিল এক আজব দৃশ্য। ঐ সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিনয়-নম্রতা সহকারে গভীরভাবে ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন। এবার তিনি দু'হাত তুলে আপন প্রভুর উদ্দেশে বলতে লাগলেন ঃ 'প্রভু আমার! এই কুরাইশ লোকেরা গর্ব ও ঔদ্ধত্যের সাথে তোমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছে। তোমার মনোনীত ধর্মকে দুনিয়ার বুক থেকে নির্মূল করে দেবার জন্য এরা কোমর বেধে লড়াই করতে এসেছে। তারা তোমার রসূলকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য ময়দানে উপস্থিত হয়েছে। মহাপ্রভু! তুমি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছো। এবার তা তুমি রক্ষা করো। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে দৃঢ়পদে আসীন থাকার নির্দেশ দিয়েছ এবং বড় ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছ। তুমি তো বড়ই প্রতিশ্রুতিরক্ষাকারী।'

মহানবী তিনি যখন আল্লাহর প্রতি গভীর মনোযোগী হতেন তখন তাঁর কাঁধ থেকে তাঁর চাদরটি কখন পড়ে যেতো তা তাঁর খেয়াল থাকত না। এমতাবস্থায় তিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে বলতে লাগলেন ঃ 'প্রভু! আজ যদি তোমার এই বান্দারা যুদ্ধের ময়দানে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত এ পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করার মতো আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।'

একদিকে মহানবীর যখন এই অবস্থা, অন্যদিকে তখন আল্লাহ তাঁর সাহায্যের ব্যবস্থা পাকা করছেন আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বুকে তখন প্রেরণা, শক্তি আর সাহস উদ্যমিত হচ্ছে। তখনো পর্যন্ত তিনি পথেই ছিলেন। শত্রুদের সমর শক্তি সম্পর্কে তখনো বেখবর ছিলেন। আল্লাহ মহানবীকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শত্রু সৈন্যদের দেখালেন। তা থেকে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহস বাড়ল। অন্তরে গভীর আত্মবিশ্বাস জেগে উঠল। একথা শোনামাত্রই মুসলমানদের সাহস বহুগুণ বেড়ে গেল এবং প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে চললেন। রণক্ষেত্রে দু'পক্ষই মুখোমুখি হলে মুসলমানদের দৃষ্টিতে যেমন কাফেরদের সংখ্যা কম দেখাল তেমনই কুরাইশ বাহিনীর দৃষ্টিতেও মুসলমানদের সংখ্যা কম বলে মনে

হল। এর ফলে, দু'পক্ষেরই মনোবল বৃদ্ধি পেল। এবার দু'পক্ষই 'যুদ্ধংদেহি' বলে একে অন্যের উপরের ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার যে, মুসলমানদের দৃষ্টিতে কাফরদের সংখ্যা বরাবর কম বলে প্রতীয়মান হতে লাগল অথচ কাফেরদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের খুব বেশি বলে প্রতীয়মান হতে লাগল। এর ফলে, কাফের বাহিনী ঘাবড়ে গেল, তাদের মনোবল ভেঙে গেল আর প্রবল ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু মুসলমানদের শক্তি ও সাহস ক্রমাগত বেড়ে চলল। সে সাথে প্রবল বিক্রমে কাফের নিধন করতে লাগল। পবিত্র কুরআনের এ আয়াতগুলিও ঐ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে ঃ

'(স্মরণ করো) যখন (হে নবী!) আল্লাহ তোমাকে তাদের কম করে দেখাচ্ছিলেন। আর যদি তাদের (সংখ্যা) বেশি করে দেখিয়ে দিতাম তাহলে (হে ঈমানদারগণ!) তোমরা ভীত হয়ে পড়তে এবং এ (যুদ্ধের) ব্যাপারে পরস্পরে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে পড়তে, কিন্তু আল্লাহ (তোমাদের) রক্ষা করেছেন। তিনি তোমাদের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। এবং (স্মরণ করো) যখন তোমরা পরস্পরের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়েছিলে তখন আল্লাহ তাদের (সংখ্যা) তোমাদের দৃষ্টিতে কম করে দেখাচ্ছিলেন আর তাদের দৃষ্টিতে তোমাদের কম করে দেখাচ্ছিলেন; যা হবার ছিল বাস্তবে তাই হল এবং আল্লাহ সমস্ত কিছুরই নিয়ন্ত্রণকর্তা–তিনি যাকে ইচ্ছা (তাকে) সহযোগিতা করেন।' –কুরআন।

কুরাইশ বাহিনীর কিছু লোক পানি পান করার জন্য মুসলমানদের হাউজের নিকটবর্তী হলে মুসলমানরা তাদের ভাগিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু শান্তি ও করুণার প্রতিমূর্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'পানি নিতে দাও। যারাই পানি পান করুক না কেন তারা কেউ জীবিত ফিরে যেতে পারবে না।'

প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ চলছিল। সে সময় আবু জেহেল আমীর বিন হাজরামিকে (যে তার ভাইয়ের রক্তপণের দাবিতে অটল ছিল) উত্তেজিত করল এবং বলল ঃ 'হত্যার প্রতিশোধের সময় এসে গেছে। প্রস্তুত হও এবং কসম খেয়ে তোমাদের আত্মীয় স্বজনদের আহ্বান করো। আমীর জাহিলি যুগের আরবদের রীতি অনুসারে উলঙ্গ হয়ে চীৎকার করে বলতে লাগলঃ 'হায় আমর! হায় আমর!'

এ আহ্বান সৈন্যদের মধ্যে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল। সবার আগে আমীর বিন হাজরামি এগিয়ে এলো। তাকে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে হযরত আমরের (রাঃ) ক্রীতদাস হযরত মেহজা (রাঃ) এগিয়ে এলেন। আমীর বিন হাজরমি এগিয়ে এসে তাকে হত্যা করল। এভাবে বদরের যুদ্ধে জীবন বিসর্জন দিয়ে ইসলামের ইতিহাসে প্রথম শহীদ হওয়ার গৌরব অর্জন করলেন হযরত মেহজা (রাঃ)।

এরপর উৎবা বুক চাপড়ে আস্ফালন করতে করতে কুরাইশ-বাহিনীর মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো। সে কুরাইশ বাহিনীর সেনাপতিও বটে। সাথে সাথে তার ভাই শওবা এবং তার পুত্র ওয়ালিদও বেরিয়ে এলো। এদিকে মুসলিম বাহিনীর মধ্য থেকে তাদের মোকাবিলায় তিনি আনসার জওয়ান বেরিয়ে এলেন। তা দেখে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড়ই লজ্জিত হলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাবলেন, এ যুদ্ধ অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের প্রথম যুদ্ধ। এতে সবার আগে আনসারদের প্রথমেই যেতে দেয়া উচিত নয়। প্রথমেই মুহাজিরদেরই যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া উচিত। কারণ, তাঁরা তাঁর লোক এবং আত্মীয় স্বজন। মহানবী বললেন ঃ 'হাশিম বংশের লোকসল! এরা অসত্যের পক্ষে সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। এরা সত্যের আলো চিরতরে নিভিয়ে দিতে চায়। তোমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সত্য নিয়ে এসেছেন, ওঠো, সে সত্যের জন্য তোমরা জীবনদানে অগ্রসর হও।'

একথা শুনে আলি (রাঃ), হামজা (রাঃ) ও উবায়দা (রাঃ) রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। উৎবা তার পুত্রকে বলল ঃ 'ওয়ালিদ! অগ্রসর হও।' ওয়ালিদ মোকাবিলায় এগিয়ে এলো। হযরত আলী (রাঃ) অগ্রসর হয়ে তাকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর উৎবা নিজেই অগ্রসর হল। এবার হামজা (রাঃ) অগ্রসর হয়ে তাকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিলেন। এবার শওবা এলো। মোকাবিলায় হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) বেরিয়ে এলেন। শওবা তাঁকে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল। ফলে, উবায়দা মারাত্মক আহত হলেন। তাঁর বাহু কেটে আলাদা হয়ে গেল। হযরত হামজা (রাঃ) ও আলি (রাঃ) এ অবস্থা দেখে দ্রুত অগ্রসর হয়ে শওবাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর তাঁকে কাঁধে করে উঠিয়ে নিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গেলেন। এর কয়েক দিন পরে হযরত উবায়দা (রাঃ) জান্নাতবাসী হলেন। এর পরপরই পরস্পরের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মহানবী (রঃ) তাঁর অনুচরদের অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করতে গিয়ে বললেন ঃ 'এগিয়ে চলো। জান্নাতের পানে এগিয়ে চলো। যা আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে সুবিস্তৃত। উমাইর বিন হাম্মাম জান্নাতের সুসংবাদ শুনে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন এবং বললেন– 'বাহ্ বা। জান্নাতে পৌঁছানোর এ তো উপযুক্ত সময় যে, সত্যের জন্য আমি শাহাদত বরণ করি।'

সে সময় তিনি খেজুর খাচ্ছিলেন। জান্নাতের খুশবু পাওয়ার পর এ খেজুরের আর কী স্বাদ পাওয়া যেতে পারে ? অনতিবিলম্বেই তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি বীরবিক্রমে শত্রুবাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়লেন। বীরবিক্রমে লড়াই করতে করতে কিছু সময়ের মধ্যে তিনি শাহাদত বরণ করলেন।

পুরোদমে লড়াই চলছিল। পরস্পর পরস্পরকে হামলা করছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মুঠো বালি নিয়ে শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ

করলেন এবং বললেনঃ 'মুখে চুণকালি পড়ুক, মুখে চুণকালি পড়ুক।'

এ ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাত। আর ছিল আল্লাহর কুদরত। এ মুঠিভর্তি বালি আজাব হয়ে উড়ে গিয়ে শত্রুদের চোখে পড়ে চোখ অন্ধকার করে দিল। শত্রুরা চোখ দলতে লাগল। মুসলমানরা পূর্ণশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের জাহান্নামে পাঠাতে লাগলেন। অবশেষে শত্রুদের পরাজয় হল। মুসলিমরা জয়লাভ করলেন। সত্য বিজয়ী হল অসত্য পরাজিত হল।

তখনও যুদ্ধ চলছিল। আবদুল আসওয়াদের পুত্র, আসওয়াদ, মখজুম গোত্রের লোক আসওয়াদ বলল ঃ 'আল্লাহর কসম! আমি মুসলমানদের হাউজে গিয়ে তাদের পানি পান করব। গিয়ে তা শেষ করে দেবো। তা না করতে পারলে আমার জীবন বিসর্জন দেবো।' সে খুব দ্রুত বেরিয়ে এসে হাউজের কাছে গিয়ে পৌঁছাল। নিকটেই ছিলেন হযরত হামজা (রাঃ)। তিনি বিদ্যুৎবেগে তার উপরে অসি চালনা করলেন। এ আঘাত ছিল খুবই মারাত্মক। ফলে, তার পা কেটে আলাদা হয়ে গেল। এবার সে ঘেঁষটাতে ঘেঁষটাতে হাউজে গিয়ে পড়ল। তার অন্য পা'টিও অস্ত্রাঘাতে আলাদা করে দেয়া হল। এবং সে পানিও পান করল। হামজা (রাঃ) আবারো একটা ভয়ঙ্কর অস্ত্রাঘাত করলেন। সে আঘাতে সে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। যুদ্ধ শেষ হলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'দেখো, আবু জেহেল কোথায় ? সে কোথাও মরে পড়ে আছে।' আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি দেখলেন, সে এক জায়গায় পড়ে ধুঁকতে ধুঁকতে মারা যাচ্ছে। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) তার গলায় পা রেখে মাথা দেহ থেকে আলাদা করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে চলে এলেন।

এভাবে খোদাদ্রোহী ও অংশীবাদের এক পতাকাবাহী ও ইসলামের এক জঘন্যতম শত্রু জাহান্নামে গেল। এর মধ্যেই অনেক কুরাইশ সরদারের দেহে মাথা ছিল না। নিহত শত্রু সৈন্যের সংখ্যা ছিল সত্তর এবং বন্দীর সংখ্যাও ছিল সত্তর।

মুসলমানদের মধ্যে চৌদ্দ ব্যক্তি শহীদ হলেন যাঁদের মধ্যে আনসার ছিলেন আট ও মুহাজির ছিলেন ছয় জন।

মৃত শত্রুসৈন্যদের সংখ্যা ছিল বেশি এবং এদের অধিকাংশের দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল সে জন্য তাদের চিনে পৃথক করা কঠিন ব্যাপার ছিল।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশ বড় একটা কুঁয়োর মধ্যে সমস্ত মৃতদেহ ফেলে দিলেন। তাঁরপর তার উপরে মাটি চাপা দিয়ে দিলেন। তিনি তাদের প্রত্যেকের নাম নিয়ে জোরে জোরে বলতে লাগলেন ঃ 'কী জঘন্যতম আত্মীয়স্বজন বলে পরিচয় দিলে তোমরা। তোমরা কী আমার প্রভুর মতো

তোমাদের প্রভুকে সত্যবাদী ও প্রতিশ্রুতি পালনকারী হিসেবে পেয়েছো ? তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করেছো। আর অন্যেরা ? এরা আমাকে সত্যবাদী বলে গ্রহণ করেছে। তোমরা আমাকে আমার মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করেছো। আর অন্যরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। তোমরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছো আর অন্যেরা আমাকে সাহায্য করেছে।'

সাথীরা বললেন ঃ 'আল্লাহর রসূল। যারা মারা গেছে, একথা তাদের উদ্দেশ্যে বলছেন ?'

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'এরা জেনে গেছে আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি সত্য ছিল।' তারপর আবু জেহেলের মৃতদেহের পানে তাকিয়ে বললেন ঃ 'এ ফেরাউনের চেয়েও জঘন্য বদমাইশ। ফেরাউন তার দুরবস্থার সময় আল্লাহকে স্মরণ করেছিল। কিন্তু আবু জেহেল তার দুরবস্থার সময় 'লাত'-'উজ্জা'কে স্মরণ করছিল।'

যুদ্ধশেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জায়েদ বিন হারিসা (রাঃ) ও আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাকে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন মদীনাবাসীদের যুদ্ধজয়ের সুসংবাদ জানাতে। বিজয়ের সংবাদে মুসলমানরা খুশি ও আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন কিন্তু মুনাফিক ও ইহুদিদের দেহ থেকে যেন কালঘাম ছুটতে লাগল।

৬

বদর যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করলেন আর ইসলামের শত্রুরা চরমভাবে পরাজিত হল। যুদ্ধের পরে প্রচুর মালামাল মুসলমানদের হস্তগত হল। তা বিলিবণ্টনের সময় মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। সে মতবিরোধ এক পর্যায়ে ঝগড়াঝাটির পর্যায়ে চলে গেল।

যুদ্ধফেরত কয়েকজন জওয়ান বললঃ 'এ মালামালের প্রকৃত অধিকারী তো আমরা। আমরাই তো জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে শত্রুদের পরাজিত করেছি।'

বয়স্ক লোকেরা বলল ঃ তাই যদি বলো, তাহলে এ মালামালের প্রকৃত অধিকার আমাদের। কেননা, আমরাই শত্রুদের কবল থেকে তোমাদের রক্ষা করেছি।'

সাদ বিন মুআজ বললেন ঃ 'আল্লাহর রসূল! দুর্বলরা কী যুবকদের সমান ভাগ পাবে ?'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'আরে ভাই! দুর্বলদের কারণেই তো আল্লাহর সাহায্য এসেছে।'

এরই মধ্যে আল্লাহর পবিত্র বাণী নিয়ে ফিরিশতা জিব্রাইল (আঃ) অবতীর্ণ হলেন ঃ

'(হে নবী!) তারা তোমাকে 'আনফাল' (যুদ্ধলব্ধ মাল) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। (তাদের) বলো, যুদ্ধলব্ধ মাল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের। তোমরা আল্লাহর নাফরমানি ও অসন্তুষ্টি থেকে নিজেদের রক্ষা করো এবং পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখো। (আর) যদি তোমরা মুমিন হও তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা মেনে চলো।' –কুরআন। সূরা-আনফাল।

প্রিয়নবী মুহম্মদ (সাঃ) ঘোষণা করলেন ঃ 'যে যে ব্যক্তিকে হত্যা করেছে তার মালের অধিকারী সেই ব্যক্তি। যে যে ব্যক্তিকে বন্দী করেছে সেই সেই ব্যক্তির মালের অধিকারী সেই ব্যক্তি। আর যুদ্ধক্ষেত্রে সাধারণভাবে অর্থাৎ বিনা লড়াইয়ে যে মাল হস্তগত হয়েছে তা সকলের।

এ কথা শুনেই সবাই মাথা নত করলেন এবং তা বণ্টন করার ভার মহানবীর উপরে অর্পণ করলেন। যাতে আল্লাহর নির্দেশ মতো তিনি তা বিলি-বণ্টন করেন।

'বন্দীদের কী হবে ?' –এ বিষয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথীদের সাথে পরামর্শ করলেন।

হযরত উমর (রাঃ) পরামর্শ দিলেন ঃ 'কুফরী ও নর হত্যার দায়ে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হোক।'

হযরত আবুবকর বললেন ঃ 'আল্লাহর রসূল! এরা তো আপনারই আত্মীয়-স্বজন। আজ আল্লাহ তাদের আপনারই অধীন করে দিয়েছেন। আমার প্রস্তাব যে, হত্যা না করে এদের কাছ থেকে রক্তপণ আদায় করা হোক। এর ফলে, কিছু সহায়-সম্পদও এসে যাবে আর এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তাদের সুমতি দিয়েছেন। আগামী দিনে এরাই আপনার সাথী ও সহযোগী হয়ে গেছে।'

হযরত আবুবকরের (রাঃ) প্রস্তাব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে পছন্দনীয় হল। যারা ক্ষতিপূরণ দিতে সমর্থ ছিল, তাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হল। যারা গরীব ও অসহায় ছিল কিন্তু পড়ালেখা জানত তাদের প্রতি একজনের দায়িত্বে দশ জন করে মুসলমানের লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব দেয়া হল। আর যারা মূর্খ ও অপদার্থ ছিল তাদের এমনিই মুক্তি দেয়া হল।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজয়ীর বেশে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর মন-প্রাণ পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। মদীনার মুসলমানরা বিজয়ের আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলেন।

বদরের যুদ্ধের পরিণামে ইসলামের শত্রুরা পরাভূত হল। মুনাফিকরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। মদীনার ইহুদিরা মুসলমানদের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ল। ইসলামের অনেক কট্টর শত্রুও ইসলাম গ্রহণ করল। মক্কায় এক মাস যাবৎ ঘরে

ঘরে শোক পালন করা হল। অনেক মহিলা বিধবা হয়ে গেল। অনেক সন্তান এতিম হল। শোকের আতিশয্যে তারা মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল।

৭

কুরাইশদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি নিহত হল। তাদের অপরিমিত সম্পদ ধূলায় মিশে গেল। এ পরাজয়ে তাদের মান-সম্মান, ইজ্জত-সম্ভ্রম ভূলুণ্ঠিত হয়ে গেল। এ জন্য তারা খুবই দুঃখিত ছিল।

উমাইর বিন ওয়াহাব ইসলামের এক কট্টর শত্রু ছিল। সে ও সাফওয়ান বিন উমাইয়া হিজরায় বসে বদরের শোকে বুক চাপড়াচ্ছিল। সাফওয়ান বলল ঃ 'আল্লাহর কসম! এ জীবন আমার নিরানন্দ হয়ে গেল।'

উমাইর বলল ঃ 'ঠিক বলেছ। আমি তো দেনায় ডুবে রয়েছি। বাচ্চাদের চিন্তায়ও আমি দিশেহারা। আমি মুহম্মদকে খতম না করে ছাড়ব না। আমার ছেলেও সেখানে বন্দী।'

সাফওয়ান বলল ঃ 'তুমি ঋণের পরোয়া করো না। বাচ্চাদের কথাও ভুলে যাও। তাদের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।'

উমাইর মদীনা অভিমুখে রওনা হল। তরবারি ঘাড়ে ঝুলিয়ে নিল। সেখানে পৌঁছে মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিল তার লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে।

এ দৃশ্য হযরত উমরের সতর্ক দৃষ্টি এড়াতে পারল না। তিনি পুরো ব্যাপারটাই অনুমান করে নিলেন। তিনি তার ঘাড় ধরে প্রিয়নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে নিয়ে এলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'উমাইর! কী উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছো ?'

উমাইর ঃ 'আমার ছেলেকে মুক্ত করার জন্য। আপনি আমার এবং আমার পুত্রের উপর দয়া করুন।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ 'তরবারি কেন ? তরবারি নিয়ে এসেছো কেন ?'

উমাইর ঃ 'ধ্বংস হোক তরবারি। বদরে যা ঘটে গেল তাই দেখতে এসেছিলাম। তরাবারির কথা মনেই ছিল না। তা আমার কাঁধেই রয়ে গেল।'

প্রিয়নবী ঃ 'উমাইর! সত্যি কথা বল। মিথ্যা বলো না। আমার সাথে মিথ্যা বলে লাভ কী ?'

উমাইর ঃ 'আমি আমার ছেলের জন্য এসেছি। বিশ্বাস করুন। আমি আমার ছেলের জন্য এসেছি।

প্রিয়নবী ঃ 'হিজরায় সাফওয়ানের সাথে তুমি কী প্রতিজ্ঞা করেছো ?'

এ প্রশ্ন শুনে সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল।

ভয়ে ভয়ে সে প্রশ্ন করল ঃ 'কী প্রতিজ্ঞা করেছি ?'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ 'তুমি তার সাথে আমাকে হত্যার প্রতিজ্ঞা করেছো। তা এ শর্তে যে, সে তোমার সন্তানদের দায়িত্ব নেবে আর তোমার ঋণ আদায় করে দেবে। শুনে নাও, আল্লাহ্ তা হতে দেবেন না।'

উমাইর ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রসূল। এতে কোন সন্দেহ নেই।'

উমাইর (রাঃ) মুসলমান হয়ে গেলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথীদের বললেন ঃ 'তোমাদের এ ভাইকে কুরআন পড়াও আর তার পুত্রকে ছেড়ে দাও।'

উমাইর (রাঃ) মক্কায় ফিরে এলেন। যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হত্যার সংবাদ পাওয়ার জন্য উদগ্রীব ছিলেন তাঁরা উমাইরের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের কথা শুনলেন। মক্কায় পৌঁছে তিনি ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন। লোকদের ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করলেন।

একাদশ অধ্যায়

যুদ্ধের পরে যুদ্ধ

— কুরাইশদের সেনা সংগ্রহ

— বনী কায়নুকাদের দুরাচরণ

— বনী কায়নুকাদের নির্বাসন

— গোত্রে গোত্রে দৌত্যকার্য

— কুরাইশ বাহিনীর প্রস্থান

— আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের শক্রতা

— উহুদ রণক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রস্তুতি

— যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল

— শক্রদের পরাজয়

— যুদ্ধের পরিস্থিতি বদলে গেল

— সাহাবাদের বীরত্ব

— যুদ্ধের আঞ্জাম

— পৌত্তলিকদের বর্বরতা।

একাদশ অধ্যায়

যুদ্ধের পরে যুদ্ধ

১

কুরাইশদের চোখের ঘুম হারাম হয়ে গেল। বদরের যুদ্ধের পরাজয় তাদের ভিতর-বাইরে প্রচণ্ড দাহ সৃষ্টি করল। এদিকে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় ছিল ন্যায়ের বিজয়, সত্যের বিজয়। এর ফলে, মুসলমানদের মর্যাদা বাড়ল, শির উন্নত হল। ইসলামের পাল্লা ভারি হয়ে উঠল আর সারা আরব জুড়ে ইসলামের বিজয়ের ডঙ্কা বাজতে লাগল। মুসলমানদের হৃদয় খুশিতে ভরে উঠেছিল। পৌত্তলিকরা ভয় ও হতাশার সাগরে ডুবে যাচ্ছিল। তাদের হৃদকম্প উপস্থিত হল। ইহুদি ও কপটচারিরাও (মানুফিক) ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল।

কুরাইশরা এক মাস যাবৎ শোক পালন করল। যে নেতাদের মৃত্যু হয়েছিল, তাদের শোকে মাসকালব্যাপী কান্নাকাটি চলল। এক সময় সব শেষ হয়ে গেল। কান্নাকাটি থেমে গেল। তাদের কান্নাকাটি ও শোকতাপ বন্ধ হয়ে গেল কেন? তারা কী তাদের আত্মীয় পরিজন ও নেতাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করল? এই শোকতাপ থেমে গেল কেন? তা কী এ জন্য যে, তারা তাদের সমস্ত শক্তি ক্ষয় করে বসেছিল?

বাস্তব ঘটনা তা নয়। কুরাইশরা এরকম কখনোই ছিল না। তাদের আত্মীয়-স্বজন নিহত হলে তারা কখনোই এভাবে ধৈর্য ধারণ করত না। তাদের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছিল। তাদের হৃদয় কেঁদে কেঁদে উঠছিল। কিন্তু সবটাই চলছিল নীরবে। তাদের মধ্যে এখন শোকের তুফান নয়; প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল। তারা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। মহিলারা তাদের মাথায় চুল কামিয়ে ফেলল। সুগন্ধি দ্রব্য তাদের উপর হারাম করে নিল। তারা মান্নত করল যে, প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত তারা সুগন্ধি ব্যবহার করবে না এবং সাজ-সজ্জাও করবে না। পুরুষেরা প্রতিজ্ঞা করল প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত তারা আরাম করবে না, নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাবে না।

আবু সুফিয়ান ছিল তাদের চেয়ে এক ধাপ আগে। সে প্রতিজ্ঞা করল মুহম্মদকে নিপাত না করা পর্যন্ত সে স্নান পর্যন্ত করবে না।

এভাবে কুরাইশদের শোকাশ্রু থেমে গেল। বুক চাপড়ানিও বন্ধ হয়ে গেল। তারা সিদ্ধান্ত নিল মুহম্মদের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ করবে। হত্যার বদলে হত্যার মাধ্যমে শোকের আগুন নেভাবে। কুরাইশরা পুনরায় যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করল। যুদ্ধ জয়ের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করল। যত তাড়াতাড়ি

সম্ভব যুদ্ধ জয় করে তারা চরম প্রতিশোধের মধ্য দিয়ে বুকের আগুন নেভাতে চায়। যুদ্ধের পূর্বে যে কাফেলা সিরিয়া থেকে ফিরে এসেছিল তার সমস্ত সম্পদ 'দারুননাবায়' জমা করে রাখা হয়েছিল। তা একই অবস্থায় গচ্ছিত ছিল। তা তখন পর্যন্ত বিলি-বন্টন হয়নি। কুরাইশরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল যে, অংশীদারদের মূল পুঁজি ফেরত দিয়ে লভ্যাংশটি যুদ্ধের খরচ বাবদ ব্যয় করা হবে। বাস্তবিকই এটা ছিল সবার অন্তরের কথা। তাই প্রস্তাব তোলা মাত্রই একযোগে সবাই তাতে সমর্থন জানাল। অবিলম্বেই সমস্ত মাল-সম্পদ বিক্রি করা হল। জিনিসপত্রের দাম ছিল বেশি। তাই প্রচুর মুনাফা হল। অংশীদারদের মূল পুঁজি ফেরৎ দিয়ে তার লভ্যাংশ যুদ্ধে ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট করা হল। তারপর জোরে-শোরে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল।

বদরের যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের একটি ছেলেও মারা গিয়েছিল। তার ফলে আবু সুফিয়ান খুবই শোকাহত হয়ে পড়েছিল। বদর যুদ্ধে কুরাইশরা মুসলমানদের কাছে ভয়ংকর মার খেয়েছিল। তাই সে চাচ্ছিল যে, এবার বড় একটা বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের মোকাবিলা করবে। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে তো তা সম্ভব ছিল না। কিছুদিন সময় তো লাগবেই। আবু সুফিয়ান ক্ষোভে ও ক্রোধে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই সে বিলম্ব করতে চাচ্ছিল না। সে মক্কা থেকে দু'শ লোকের একটা সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য অভিযান শুরু করল। মদীনা থেকে বেশ কয়েক ক্রোশ দূরে উরাইজ নামক একটি জায়গা আছে। তারা সেখানে পৌঁছে দেখল এক আনসার তার জমিতে কৃষিকাজ করছে। তার সাথে এক মজুরও ছিল। তারা এই দুই ব্যক্তিকে সেখানেই হত্যা করল। দুটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করল। তাদের কিছু খেজুর গাছ ছিল। সেগুলোও জ্বালিয়ে দিল। এভাবে আবু সুফিয়ান তার মনের আগুন কিছুটা প্রশমিত করল। তারপর সে তাদের নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল। প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনা শোনামাত্রই আবু সুফিয়ানকে ধাওয়া করলেন। কিন্তু পলাতক ব্যক্তিরা প্রমাদ গুণল। তাই আসন্ন বিপদ দেখে তারা উটের বোঝা হালকা করতে লাগল। সাথে ছাতুর বস্তা ছিল তা-ও ফেলে দিল। এভাবে পালিয়ে তারা জীবন বাঁচিয়ে ভালোয় ভালোয় ফিরে গেল। আরবে 'ছাতু'কে 'সউয়িক' বলে। সে জন্য এ ঘটনা 'গজওয়ায়ে সওয়িক' (গজওয়ার যুদ্ধ) নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। দ্বিতীয় হিজরির জিলহজ্জ মাসে এই ঘটনা ঘটেছিল।

মদীনায় ইহুদিদের একটি গোত্রের বসবাস ছিল। তা 'বনী কাইনুকা' নামে পরিচিত ছিল। যেখানে তারা বাস করত সেখানে তাদের ব্যবসায়ী ক্ষেত্রও ছিল। ঐ গোত্রের লোকেরা 'স্বর্ণকার' এর কাজও করত। ইহুদিদের অন্য গোত্রের

লোকেরা মদীনার বাইরে বাস করত। 'খায়বার' সহ অন্যান্য স্থানেও তাদের বসবাস ছিল। এই কায়নুকা গোত্রের লোকেরাও এবার মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরুদ্ধে শত্রুতা করতে লাগল।

এর কারণ খুব স্পষ্ট। কায়নুকা গোত্র প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। তারা শান্তি ও সহযোগিতার শর্তে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। কিন্তু ইসলামের ক্রমাগত উত্থান দেখে তারা হিংসায় জ্বলতে লাগল। তারা সামনে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার ভাণ করত কিন্তু পিছন থেকে ছুরি মেরে তাদের ধ্বংস সাধনের চক্রান্তে লিপ্ত থাকত। পৌত্তলিকরাও মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করত কিন্তু বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় থেকে তারাও ইহুদিদের পথ ধরল। তাদের এই দুমুখো নীতি ও চারিত্রিক দ্বিচারিতা মুসলমানদের জন্য বিপদজ্জনক বলে প্রতীয়মান হয়ে উঠল। এ দু গোত্র এখন মুসলমানদের সাফল্যে জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল।

তারা বোধ বুদ্ধিহীন হয়ে পড়েছিল। তারা চিন্তা করতে লাগল মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে শান্তিচুক্তি করেছিলেন। পরম বন্ধুত্বের সাথে আমাদের গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দেখতে দেখতে আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে তিনি অভিযান শুরু করে দিয়েছেন। ফলে, আমাদের ধর্ম নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে আর তাঁর ধর্ম মানুষের ঘরে ঘরে আলোর মতো জ্বলে উঠছে। শুধু তাই নয়; মুসলমানরাই এখন সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে বিপক্ষীয়দের পরাজিত করে বিজয়ীয় বেশে মদীনায় ফিরে আসছে। পৌত্তলিক ও অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হচ্ছে আবার আল্লাহর কৃপায় তারা জয়লাভও করছে। এভাবে আরব সমাজে তার অপ্রতিহত প্রভাব সুবিস্তৃত হচ্ছে। তাদের ভয়ে লোকদের কম্পমান অবস্থা। পরশ্রীকাতর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ এরা মুসলমানদের এ সাফল্যে মরমে মরে যেতে লাগল। জ্বলতে লাগল হিংসায়। তারা প্রমাদ গুণলো। এবার তারা আর গোপন নয়; মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতায় অবতীর্ণ হল। প্রকাশ্যে ও গোপনে তারা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে লাগল। এবার তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে দু'ধারী তলোয়ারে পরিণত হল। তাদের এ বিরোধিতা সরাসরি প্রকাশ হয়ে পড়ল। তারা জনসাধারণকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগল। ব্যঙ্গ কবিতার মধ্যদিয়ে তারা উপহাস করতে লাগল। কথায় কথায় আঘাত দিয়ে তাদের হৃদয়কে ক্ষতি বিক্ষত করে তুলতে লাগল। অর্থাৎ তারা ইতিপূর্বে সম্পাদিত শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগল। শান্তির চুক্তির কোনো পরোয়াই তারা করল না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এহেন হীন আচরণে

খুবই দুঃখিত হলেন। অবশেষে তাদের সবাইকে ডেকে পরম বন্ধু ও অভিভাবকের মতো তাদের বললেন ঃ 'ইহুদি ভাইসব! আল্লাহর কসম, তোমরা বিশ্বাস করো যে, আমি আল্লাহর নবী। বদর যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কেও নিশ্চয় তোমরা অজ্ঞ নও। আমরা চাই না যে, বদর যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে তোমরাও শিক্ষা লাভ করো।'

কিন্তু এরাও ক্ষমতার মদমত্তে অন্ধ হয়ে উঠেছিল। তাই তারা সে কথায় গুরুত্ব না দিয়ে নির্লজ্জের মতো জবাব দিলঃ 'মুহম্মদ! বিভ্রান্ত হবেন না। যাদের পরাজিত করে আপনি এত গর্ব করছেন তারা ছিল নাদান লোক। কিন্তু আমরা তা নই। আমাদের যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র আর লোকবল আছে। তাছাড়া আমরা যুদ্ধের ময়দানের লড়াকু সিংহ। আমাদের যদি যুদ্ধে নামতে হয় তাহলে যুদ্ধ কাকে বলে দেখিয়ে দেবো।'

ইহুদীদের এ উদ্ধত্যপূর্ণ আস্ফালন ছিল পূর্বের প্রতিশ্রুতি ও শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য হুমকি। ফলে, ইহুদিদের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক নাশ হল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশেষে নিরুপায় হয়ে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি অবিলম্বে তাদের পুরো এলাকা ঘিরে ফেলার নির্দেশ দিলেন। শুধু আদেশেরই অপেক্ষা ছিল। দেখতে দেখতে মুসলমানরা ইহুদিদের ঘিরে ফেললেন। পরাজিত হয়ে তারা আত্মসমর্পণ করল। মুসলমানরা বললেন ঃ 'এদের হত্যা করা হোক।' মুনাফিক বা কপট আবদুল্লাহ বিন উবাই ছিল ইহুদিদের সহযোগী। সে ছিল মুনাফিকদের নেতা। সে ইহুদিদের জন্য সুপারিশ করতে লাগল। বললঃ 'দেশ থেকে এদের বের করে দেয়া হোক।' প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে প্রস্তাবে সম্মত হলেন। বললেনঃ 'তিন দিনের মধ্যেই তাদের মদীনা থেকে চলে যেতে হবে।'

ইহুদিরা মদীনা ছেড়ে চলে গেল। তাদের সাথে তাদের স্ত্রীপুত্র কন্যারাও গেল। যতটা ধনসম্পদ সাথে করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল তাও তারা সাথে করে নিয়ে গেল। সিরিয়ায় 'আজরাত' নামে একটি জায়গা আছে। সেখানে গিয়ে তারা বসতি স্থাপন করল। এই দলে ছিল সাত'শ লোক। এদের মধ্যে তিন শ' ছিল কবচধারী।

বনী কায়নুকাদের দেশত্যাগের ফলে ইসলামের অনেক কল্যাণ হল। ইসলামের শক্তি সম্পর্কে অমুসলমানদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হল। তারা ভাবলঃ মুসলমানদের নির্দেশে এতবড় একটা শক্তিশালী গোত্র দেশ ছাড়া হয়ে গেল!' এর দ্বারা বোঝা যায় মুসলমানরা কতটা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। এখন তারা অসীম শক্তির অধিকারী হয়ে পড়লেন। মদীনার আশে-পাশে বনী নজীর ও বনী কুরাইজাদের দুটি গোত্রের বসবাস ছিল। এরাও ছিল ইহুদি। এ দুটি গোত্রও

মুসলমানদের ভয়ে চুপ হয়ে রইল। আরবের অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও ভয়ে নিশ্চুপ হয়ে রইল। কয়েকটি গোত্র চিন্তা করল ঃ এই যদি অবস্থা হয় তাহলে তো সমগ্র আরব দেশ তাদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে। তাই আর বিলম্ব নয়, অবিলম্বে এদের নির্মূল করা উচিত যাতে এদের অবশিষ্ট আর না থাকে। সে জন্য তারা মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে দিল। এ খবর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথাসময়ে অবগত হলেন। ফলে, এ শত্রুদের নির্মূল করার জন্য অভিযান শুরু করলেন। এ গোত্রগুলি এ সংবাদ পাওয়া মাত্রই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। অবশেষে প্রাণভয়ে তারা মরুভূমিতে পালিয়ে গেল। কেউ বা পাহাড়ে আর কেউবা গুহার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করল।

কুরাইশদের অর্থনৈতিক অবস্থাসহ আরো অনেক কিছুই সিরিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। সেজন্য তাদের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়াটা ছিল তাদের অস্তিত্ব রক্ষার বিরুদ্ধে বিরাট এক হুমকি স্বরূপ। কিন্তু সমস্যা হল তারা সিরিয়ায় যাবে কোন পথ দিয়ে। মদীনা হয়ে সিরিয়া যাওয়ার সাহস তাদের আর ছিল না। কেননা, সেখানে মুসলমানদের আক্রমণের ভয়। নিরুপায় হয়ে অবশেষে তারা ইরাকের পথ ধরল। যদিও এ পথ ছিল খুবই দীর্ঘ। তাছাড়া অন্য অসুবিধাও ছিল। সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল পানির। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। কুরাইশদের এ পরিকল্পনাও গোপন থাকল না। সে খবর যথাসময়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাথীদের কানে পৌঁছে গেল। তিনি বিলম্ব না করেই জায়েদ বিন হারিসাকে (রাঃ) ঝটিকা অভিযানে পাঠালেন। কেননা, তখন শান্তির নয়; ছিল যুদ্ধের অবস্থা। তাই শত্রুদের ক্ষতিসাধনের কবল থেকে বাঁচবার জন্য তাদের ক্ষতি-সাধন তাই জরুরী হয়ে পড়েছিল। এক'শ সদস্যের বাহিনী ছিল। আরবের 'নজদ' অঞ্চলে 'বারদা' নামক এক স্থানে কুরাইশ কাফেলার সাথে জায়েদের (রাঃ) বাহিনীর সাক্ষাৎ হল। কাফেলার লোকেরা সহায় সম্পত্তি ফেলে প্রাণভয়ে পালিয়ে গেল। যার ফলে, সমস্ত মালামাল মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হল। বাহিনী আনন্দিত চিত্তে মদীনায় ফিরে এলো। মহানবী আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে মদীনায় আসার পর অনবরত সংগ্রাম ও জিহাদে লিপ্ত হয়ে রইলেন। এসবই ছিল ইসলামকে সুরক্ষিত করার সংগ্রাম। সেজন্য জান ও মাল উভয়ই উৎসর্গ করতে হয়েছে। এর মধ্যে স্বস্তি ও শান্তি ফিরে না আসাতে এক মুহূর্তের জন্যও আরাম করাটাকে তিনি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলেন না। কারণ, চারিদিক থেকেই বিপদ ও অশান্তির ঘনঘটা সমস্ত বাতাবরণকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। সে সময় তিনি আর এক

কাজ শুরু করলেন। তা হল পরস্পরের প্রতি আন্তরিকতা, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ও বিশ্বাসের সম্পর্ক স্থাপন। যাকে বলা যায় ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। তাঁর যে সাচ্চা সঙ্গী সাথীরা ছিলেন তাঁরা তো সকল সময়েই তাঁর কাছে কাছেই থাকতেন। তাঁদের সাথে তাঁর সম্পর্কও ছিল অতি দৃঢ়। তাছাড়া সকলের সাথেই তাঁর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত আন্তরিকতাপুর্ণ। এ সুন্দর আচার-আচরণ আশেপাশের সকলেই মন জয় করে নিয়েছিল। তিনি সকলের সাথে আরো মজবুত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আরো কিছু পদক্ষেপ নিলেন। তা হল পরস্পরের মধ্যে আত্মিক বন্ধন স্থাপন। তিনি তা-ও করলেন। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে ভালবাসা, বিশ্বাস ও আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করে নিলেন। তাঁর যে দু'জন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ততম অনুচর ও বন্ধু ছিলেন– যারা ছিলেন তাঁর বাম হাত ও ডান হাত স্বরূপ তাদের সাথে তিনি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করলেন। হয়রত আবু বকরের (রাঃ) কন্যা হযরত আয়েশার সাথে তিনি ইতিপূর্বেই পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এ বিয়ে হয়েছিল মক্কাতেই। আয়েশার (রাঃ) বয়স কম হওয়াতে তখনো তিনি পিতৃগৃহেই থাকতেন। মদীনায় আসার পর তিনি মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গৃহেই চলে আসেন। হযরত উমর ফারুকের (রাঃ) কন্যার নাম ছিল হাফসা (রাঃ)। তিনি তাঁর সাথেও পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। তিনি তাঁর বিশিষ্ট অনুচরদের সাথেও নিজের কন্যাদের বিয়ে দিয়ে,আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা হযরত ফাতিমাকে (রাঃ) বিশ্বস্ত বন্ধু ও অনুচর হযরত আলির (রাঃ) সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর আর এক কন্যা রুকাইয়াকে (রাঃ) বিয়ে দিয়েছিলেন হযরত উসমানের (রাঃ) সাথে। এঁরা ছিলেন মহানবীর জন্য নিবেদিতপ্রাণ অনুচর। প্রিয়নবীর (রাঃ) বদরের যুদ্ধে ব্যস্ত থাকাকালীন সময়ে রুকাইয়া (রাঃ) ইন্তিকাল করেন। প্রথম থেকেই তিনি ছিলেন খুবই রুগ্ন। হযরত উসমান (রাঃ) তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিলেন বলে তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ নিতে পারেন নি। রুকাইয়ার (রাঃ) ইন্তিকালের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আরেক কন্যা উম্মে কুলসুমকে উসমানের (রাঃ) সাথে বিয়ে দেন। সেজন্য হযরত উসমান (রাঃ) 'যিন্নূরাইন' (দু জ্যোতি বিশিষ্ট) উপনামে পরিচিত হন।

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিধবাদের প্রতিও গভীর আন্তরিকতা প্রদর্শন করলেন। তিনি তাঁর সাথীদেরও বোঝালেন, যে নারী বিধবা হয়ে বা স্বামীপুত্র হারিয়ে অসহায়ভাবে দিন গুজারা করছে তাদের প্রতি যথাযথ নজর রাখতে। তাদের প্রতি শুধু গভীর অন্তরিকতা প্রদর্শনের কথা বলে ক্ষান্ত হলেন না; বরং সম্ভব হলে তাদের বিয়ে করে পারিবারিক বন্ধনের মধ্যেও আবদ্ধ করে নেওয়ার কথা বললেন। এমন কি কোন অসহায় নারীদের যদি সন্তানাদিও থাকে

তাহলে সে সন্তানরা যাতে তাদের বোঝাস্বরূপ না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রেখে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা দানের কথা বললেন। তিনি শুধু তা বলে ক্ষান্ত হলেন না; নিজে দৃষ্টান্তও রাখলেন। জয়নব (রাঃ) নামে তাঁর এক স্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন খুজাইমার কন্যা। ইনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র ও সৎকর্মপরায়ণা নারী। তিনি দান-খয়রাতে ছিলেন প্রসারিত হস্ত। এজন্য তাকে বলা হত 'উম্মুল মাসাকিন' বা গরীবের মা। এই পুণ্যবতী রমণীর স্বামী বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান। তখন বিধবা জয়নাবকে (রাঃ) বিয়ে করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে তাঁর সম্মানিত পরিবারের একজন সদস্য করে নেন।

বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের মুখ পুড়েছিল। এ অপমান নীরবে মেনে নেয়াটা ছিল তাদের জন্য খুবই কষ্টদায়ক ব্যাপার। এ পরাজয় তাদের ইজ্জত ও সম্ভ্রমের জন্য ছিল বিরাট এক চপেটাঘাত। এ পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে বেঁচে থাকাটা তাদের কাছে এক অসহনীয় ব্যাপার বলে মনে হচ্ছিল। এই পরাজয়ের বোঝা তাদের দিনের পর দিন বয়ে বেড়াতে হচ্ছিল। এর পুরো ব্যাপারটাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবগত ছিলেন। তিনি জানতেন যে, কুরাইশরা পরাজয় মেনে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকার পাত্র নয়। তারা খোঁচা খাওয়া বাঘের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। প্রতিশোধের আগুন তাঁদের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলছে। প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত সে আগুন নিভবে না। তাদের যে বীর সিপাহী ও যুবকরা নিহত হয়েছে তার বদলা না নেয়া পর্যন্ত তারা স্বস্তি ও শান্তি ফিরে পাবে না। তাছাড়া ইতিমধ্যে তাদের বাণিজ্য কাফেলায় হামলা চালিয়ে তা লুট করে নিয়ে গেছে। যদিও এই ভয়ে তারা অন্য পথ ধরেছিল। এসব ব্যাপারে তাদের মনের আগুনের ঘৃতাহুতি দিয়েছিল। আর প্রতিশোধের নেশায় তারা উন্মাতাল হয়ে উঠছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথেই এসব বিষয় পর্যবেক্ষণ করে তাই নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, আজ হোক, কাল হোক যুদ্ধ আবার বাধবেই।

মক্কায় খুব জোরে-শোরে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা হযরত আব্বাস ইতিপূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তখনো তিনি মক্কায় ছিলেন। তিনি এক শক্তিমান যুবককে নিয়োগ করলেন এই শর্তে যে, মক্কা থেকে তিন দিন তিন রাতের মধ্যেই কুরাইশদের এই যুদ্ধের প্রস্তুতির খবর মদীনায় মহানবীর কাছে পৌঁছে দেবেন। তিনি ঐ যুবক মারফৎ যে খবর পাঠালেন তার মর্ম এইরূপঃ 'কুরাইশরা মদীনা আক্রমণ করতে যাচ্ছে। বহু সৈন্য ও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে তাদের এ অভিযানে।'

এ খবর শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোটেই আশ্চর্য হলেন না। এতে আশ্চর্যের কিছুই ছিল না। আগে থেকেই তো তিনি এ আশঙ্কা

পোষণ করে আসছিলেন। কিন্তু এত বিরাট বাহিনী। এত মাল সামান ও অস্ত্রশস্ত্র! তাও আবার এত কম সময়ের মধ্যে! তিনি এতেই আশ্চর্যান্বিত হলেন।

কুরাইশদের মধ্যে বিরাট প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র ও মাল-সামান জমা করা হচ্ছে। বেছে বেছে সৈন্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। কুরাইশরা শুধু এ ব্যাপারে আরো অসংখ্য গোত্রের সাথে সমঝোতা করে নিয়েছে। আরবের উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী তাবৎ কবি ও বক্তাকে তারা এ কাজে নিয়োজিত করেছে। তারা উত্তেজনাকর কাব্য কবিতা ও ভাষ্য রচনা করে প্রত্যেক গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তাদের যুদ্ধে যাওয়ার জন্য উত্তেজিত করতে লাগল। দেখতে দেখতে কুরাইশরা বিরাট এক বাহিনী গঠন করে ফেলল। সেই সাথে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রও মজুদ করল।

মক্কায় এরকম অনেক মহিলা ছিল বদরের যুদ্ধে যাদের স্বামী, পুত্র, বা পিতা– কেউ না কেউ নিহত হয়েছিল, কেউ শোকাহত মহিলারা প্রতিশোধের জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। এতে পুরুষদের তারা উম্মাতাল করে তোলার কাজে লিপ্ত ছিল। এদেরই একজন ছিল হিন্দ নামে এক মহিলা। সে ছিল উৎবার কন্যা আর আবু সুফিয়ানের স্ত্রী। বদর যুদ্ধে এই মহিলাটি তার বাপ, ভাই ও চাচাকে হারিয়েছিল। এদের মৃত্যু সংবাদে ক্ষোভে, দুঃখে রাগে সে উন্মাতাল হয়ে উঠেছিল। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, এ হত্যার প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত সে জীবনে আর কখনো সুগন্ধি ব্যবহার করবে না।

সৈন্যদের যুদ্ধে যাওয়ার সময় হওয়ার সাথে সাথে হিন্দ অন্যান্য মেয়েদের নিয়ে একটি দল গঠন করে তাদের সাথে সাথে চলল। পুরুষেরা তাদের রোখার চেষ্টা করল। কিন্তু সে কাউকেই গ্রাহ্য করল না। তুয়াইমা বিন আদী, জুবাইর বিন মুত্ইমের চাচা ছিল। বদর যুদ্ধে সে-ও নিহত হয়েছিল। জুবাইয়ের এক হাবশী গোলাম ছিল। তার নাম ছিল ওয়াহ্শী। সে ছিল নির্দিষ্ট লক্ষ্যে বর্শা ছুঁড়ে মারার উস্তাদ। কেননা, বর্শা ছিল হাবশিদের প্রধান হাতিয়ার। জুবাইর তার ক্রীতদাসকে বলল ঃ 'ওয়াহ্শী! যদি তুমি আমার চাচার হত্যার বদলায় মুহম্মদ অথবা হামজাকে অথবা আলিকে তুমি হত্যা করে আসতে পারো তাহলে আমি তোমাকে মুক্ত করে দেবো।'

হিন্দ বললঃ 'ওয়াহ্শী! আমার আত্মীয়দের কোন হত্যাকারী অথবা মুহম্মদ অথবা হামজা অথবা আলী যে কাউকে যদি হত্যা করতে পারো তাহলে আমি অনেক মূল্যবান জিনিস দিয়ে তোমাকে পুরস্কৃত করব।'

ওয়াহ্শী দু'জনের কাছ থেকেই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করল। তিন হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী মদীনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করল। সাথে দু'শ ঘোড়া ও তিন হাজার উট। এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করল আবু সুফিয়ান। সঙ্গে চলল পনের জন

মহিলা। দফ বাজিয়ে সৈন্যদের প্রেরণা দেয়াই এদের কাজ। বদরের যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এরাই বিলাপ করে পুরুষদের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এরাই পরাজিত পুরুষদের উপহাস করে লজ্জা দিত। তাদের পরাজয়কে ঠাট্টা করত। এই বাহিনীতে আবু আউসীও শামিল ছিল। সে ছিল আউস গোত্রের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। সে ছিল ইসলামের ঘোর শত্রু। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরতের পর সে মদীনা ছেড়ে মক্কায় চলে এসেছিল। এর সাথে তার অন্যান্য সঙ্গীসাথীরাও মক্কায় চলে এসেছিল। সে কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বললঃ 'চলো, এবার বেশ মজা করা যাবে। মুহম্মদের মোকাবিলায় এ বাহিনীতে আমাকে দেখলে আউস গোত্রের লোকেরা দলে দলে এসে আমাদের বাহিনীতে যোগ দেবে। মুহম্মদের পক্ষে একটা লোকও আর থাকবে না।'

চলতে চলতে কুরাইশ বাহিনী আবওয়া নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছাল। সেখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মায়ের কবর অবস্থিত। হিন্দ লোকদের বলল ঃ 'উপযুক্ত সুযোগ। তোমরা মুহম্মদের মায়ের কবরটি ধ্বংস করে দাও৷ আমাদের কেউ বন্দী হলে প্রতিদানে আমরা আমাদের শরীরের প্রতিটি অংশের বিনিময়ে তোমাদের মুক্ত করব।' কিন্তু কিছু লোক এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করল এবং বললঃ 'এই ভুল তোমরা কখনোই করো না। তাহলে বনী খুজাআ ও বনী বকরের লোকেরাও আমাদের কবরগুলোকে ধ্বংস করে দেবে।'

বাহিনী এগিয়ে চলল। চলতে চলতে আতিক নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছাল। এই বিখ্যাত স্থানটি মদীনা থেকে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত।

ঠিক এই সময়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচার পাঠানো পত্রটি হাতে পেলেন। উবাই বিন কাআব সেই চিঠি পড়ে শোনাল। পত্রের মর্মবাণী শোনার পর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ 'আচ্ছা। একথা তোমরা কাউকে বলো না।' তারপর তিনি মদীনায় সা'দ বিন রবীর (রাঃ) বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি সেই পত্রের কথা তাকে শোনালেন। এ ঘটনা তখন শুধু সতর্ক ও বিজ্ঞ অনুচরদের সাথেই আলোচনা করতে বাকি ছিল। সে জন্য তিনি সেকথা কাউকেই বলতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কাছেই সা'দের স্ত্রীও ছিলেন। তিনি সে কথা শুনে ফেলেছিলেন। এর ফলে, এ খবর আর গোপন রইল না। বিজ্ঞ অনুচরদের সাথে পরামর্শ করার পূর্বেই তা নিয়ে সর্বত্রই আলোচনা হতে লাগল।

হিজরতের তৃতীয় বছরের শাওয়াল মাসের পাঁচ তারিখের কথা। তিনি আনাস ও মুরিস (রাঃ) নামক দু প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবীকে কুরাইশ বাহিনী সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য পাঠালেন। তাঁরা এসে খবর দিলেন কুরাইশ

বাহিনী মদীনার কাছাকাছি স্থানে এসে গেছে। সেখানকার খেতগুলোতে উট ও ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছে। মদীনার অনেক ফসল খেত ও তারা সাফ করে ফেলেছে। তিনি হুবাব বিন মুনজিরকে পাঠালেন কুরাইশ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ নিরূপণ করার জন্য। তিনি সেখানে গিয়ে সমস্ত খবরাখবর নিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তা অবগত করালেন।

মদীনাবাসীদের জন্য এ রাত ছিল বড়ই ভয়ঙ্কর ও দুঃস্বপ্নের রাত। যে কোনো মুহূর্তেই শত্রুর আক্রমণে সব তছনছ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। কারণ, শত্রুবাহিনী ছিল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক ভয়ংকর বাহিনী। শহরে যে কোনো মুহুর্তে হামলার আশঙ্কা ছিল। কয়েকজন বীর সাহাবি সামরিক পোষাকে সজ্জিত হয়ে সারা রাত ধরে মদীনার সীমানায় পাহারা দিলেন। সা'দ বিন উবাদা ও সা'দ বিন মাআজ সারা রাত ধরে মসজিদে নববীর দরজায় টহল দিলেন।

অবশেষে সেই দুঃস্বপ্নের রজনীর অবসান হল। আজ জুমুআর দিন। লোকেরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সেবায় উপস্থিত হলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলের উদ্দেশ্যে বললেনঃ 'আমার ইচ্ছা যে, আমরা মদীনাতেই অবস্থান করি। শত্রুদের আমরা কিছুই বলব না। যদি তারা সেখানেই পড়ে থাকে তাহলে তারা সেখানেই পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর যদি তারা মদীনার উপর চড়াও হয় তাহলে আমরা এই শহরে থেকেই তাদের মোকাবিলা করব এবং তাদের ঘিরে ফেলে আমরা তাদের উপর আক্রমণ চালাব। কেননা, মদীনার গলি-ঘুঁচি সম্পর্কে তারা আমাদের চেয়ে বেশি জানে না। বলো, তোমাদের কী অভিমত ?'

যারা বয়স্ক ও অভিজ্ঞ লোক ছিলেন তাঁরা সবাই একবাক্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথায় সায় দিলেন। আবদুল্লাহ বিন উবাই উঠে নিবেদন করলেন ঃ 'আল্লাহর রসূল! আপনার সিদ্ধান্তই সঠিক। আমরা মদীনাতেই অবস্থান করতে থাকি। আমরা বাইরে যাব না। আল্লাহর কসম! আমার তো বারবারই এ কথাই মনে হচ্ছে– আমরা যদি শহরের বাইরে গিয়ে শত্রুদের মোকাবিলা করি তাহলে আমাদের পরাজয় বরণ করতে হতে পারে। আর যদি শত্রুরা শহরের উপরে হামলা চালায় তাহলে তাদের পরাজয়ের সম্ভাবনা প্রবল। আল্লাহর রসূল! ওদের ওখানেই পড়ে থাকতে দিন। যদি তারা সেখানেই পড়ে থাকে তাহলে তারা সেখানেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর যদি শহরে হামলা করে তাহলে গলিতে গলিতে ওদের ঘিরে ফেলে এমন মার দেবো যে, তারা আর পালাবার পথ পাবে না। আর আমাদের বাচ্চা-কাচ্চা আর মেয়েরাও ছাদের উপর থেকে পাথর বর্ষণ করে তাদের দিশেহারা করে ফেলবে।'

এমন কিছু মুসলমান ছিলেন যারা পরে ঈমান আনার দরুন বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। তাদের মনে আকাঙক্ষা ছিল, হায়, যদি আমরা বদর যুদ্ধে অংশ নিতে পারতাম তাহলে আমরা কত বড় গৌরবের অধিকারী হতে পারতাম। আরো কিছু যুবক ছিল যারা বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং মুসলমানদের গৌরবজনক বিজয়ও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ দু পক্ষ বিজয়ের আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে পড়েছিল। তাই তারা চাচ্ছিল যে, শহরের বাইরে গিয়ে শত্রুদের উপর হামলা করা হোক। এই দলের এক যুবক বললঃ 'আল্লাহর রসুল! শত্রুদের মোকাবিলায় বেরিয়ে চলুন। তারা যাতে কখনোই মনে করতে না পারে যে, তাদের ভয়ে আমরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি। এর ফলে, তাদের সাহস আরো বেড়ে যাবে। আল্লাহর রসূল! বদরের যুদ্ধে তো আমরা মাত্র তিন'শ জন ছিলাম আর আজ তো আমরা তার চেয়ে অনেক বেশি। আমরা তো এই দিনের জন্যই অপেক্ষায় ছিলাম।'

অন্য এক যুবক বলল ঃ 'আল্লাহর রসুল! শত্রুরা আমাদের এলাকায় ঢুকে পড়েছে। আমাদের শস্যক্ষেত্রে তারা ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে। এখন আমাদের যুদ্ধ ছাড়া আর কী উপায় আছে?

খাতমা (রাঃ) বললেনঃ 'অনেক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। আমার পুত্র অংশ নিয়েছিল সে শহীদ হয়ে গেছে। কাল রাত্রে আমি তাকে স্বপ্নে দেখেছি। সে বলছিলঃ 'আপনিও চলে আসুন। জান্নাতে আমার সাথেই থাকবেন। আল্লাহ তায়ালা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেইমতো আমি জান্নাতবাসী হয়েছি।'

হযরত হামজা (রাঃ) বললেন ঃ 'আল্লাহর রসূল! সেই সত্তার শপথ! যিনি আপনার উপর কুরআন অবতরণ করেছেন। আমি তো আহার গ্রহণ করব না যতক্ষণ পর্যন্ত বাইরে না বেরিয়ে শত্রুদের মোকাবিলা করব।'

অর্থাৎ এই নও মুসলিমরা যুদ্ধের উন্মাদনায় শহরের বাইরে গিয়ে শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিলেন। বদর যুদ্ধের কিছু সফল যোদ্ধাও এতে উৎসাহ যোগাচ্ছিলেন। প্রত্যেকের একটাই আকক্ষা ছিল যে, ইসলামের পথেই জীবন উৎসর্গ করেছি। যাতে ইসলামের উপর সামান্যতম আঘাতও না আসতে পারে। এরা প্রত্যেকেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের আকাঙক্ষায় অধীর হয়ে উঠেছিলেন।

এখন যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংখ্যাগরিষ্ঠের মত গ্রহণ করে শহরের বাইরে গিয়ে শত্রুদের মোকাবিলা করার কথা ঘোষণা দিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমুআর নামায পড়লেন। জুমুআর খুৎবায় জিহাদের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত

হৃদয়গ্রাহী ও প্রেরণাদায়ক ভাষণ দিলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ 'যদি তোমরা ধৈর্যের সাথে কাজ করো তাহলে তোমরা বিজয়ী হবে।' আসর নামাযের পরে তিনি গৃহে পদাপর্ণ করলেন। আবুবকর ও উমর (রাঃ) ও তাঁর সাথে গেলেন। তারা দুজন তাঁকে কবচ পরিয়ে দিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর গলায় তলোয়ার লটকিয়ে দিলেন। অর্থাৎ তিনি এখন যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত।

এদিকে বাইরে কিছু লোক যুদ্ধের যাওয়ার আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু কিছু লোক শহরের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার বিপক্ষে ছিলেন। কারণ, তাঁরা তা বিপজ্জনক বলে অনুমান করছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহে প্রবেশ করার পর এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে বির্তক শুরু হয়ে গেল। যারা শহর ছেড়ে বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে উৎসাহী ছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে সা'দ বিন মাআজ ও উমাইদ বিন উজাইর বললেনঃ 'তোমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথায় বিরোধিতা করে তাঁকে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করে তুলেছো। সেহেতু তাঁর উপর প্রত্যাদেশ (ওহী) অবতীর্ণ হচ্ছে। এখন এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে তাঁর উপরেই ছেড়ে দাও। তিনি যা বলবেন, তাই করো। তিনি যেদিকে ঝুঁকবেন সেদিকে তোমরাও ঝুঁকে যেও।'

এসব কথা শেষ হতে না হতেই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। যারা বাইরে যাওয়ার জন্য অত্যুৎসাহী ছিল তারা লজ্জিত হল। তারা অগ্রসর হয়ে নিবেদন করল ঃ 'আল্লাহর রসূল! আপনার কথা না শুনে আমরা অন্যায় করে ফেলেছি। আপনার যা ইচ্ছা হয় তাই করুন।'

তিনি বললেন ঃ 'আমি প্রথমে এ কথাই বলেছিলাম। কিন্তু তোমরা তা মানোনি। যুদ্ধসাজ ত্যাগ করা পয়গাম্বরদের শোভা পায় না। এখন আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু মনে রেখো, আমি যা বলব, তোমরা তা মেনে চলবে। আল্লাহর নাম নিয়ে বেরিয়ে চলো। যদি তোমরা ধৈর্যের সাথে কাজ করো তাহলে তোমাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।'

সাথীরা রণসাজে সজ্জিত হয়ে শত্রুদের মোকাবিলায় রওয়ানা হয়ে গেলেন। এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনী। সাথে মাত্র দুটি ঘোড়া-এর মধ্যে একটি খোদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য নির্দিষ্ট।

বাহিনীতে কয়েকজন কিশোর ছিল। তারা ইসলামের পক্ষে জীবন উৎসর্গ করার স্বর্গীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতে বেরিয়েছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৈন্যবাহিনী পরিদর্শনকালে তাদের জন্য বাদ সাধলেন। এদের মধ্যে দুই সৌভাগ্যবান কিশোরকে মাত্র যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হল।

এদের একজন ছিল তীর ছোড়ার উস্তাদ। অন্যজন ছিল গায়ের শক্তিতে শক্তিমান। প্রথম জনের নাম ছিল রাফিআ ও দ্বিতীয় জনের নাম ছিল সামুরা। তারা উভয়েই ছিল পনেরো বছরেরে কিশোর। এই বাহিনীতে আবদুল্লাহ বিন উবাইও সামিল ছিল। সে ছিল কপটচারীদের (মুনাফিক) নেতা। সাথে তার তিন'শ সাথীও ছিল। সে তার সাথীদের নিয়ে কিছু দূর চলার পর মূল দল থেকে পৃথক হয়ে সদল বলে পুনরায় মদীনা অভিমুখে ফিরে চলল। হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম তাকে প্রাণপণে বোঝালেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চুক্তির কথাও তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন; কিন্তু সে তা মানল না। বরং উল্টো অভিযোগের সুরে বললঃ 'মুহম্মদ তো আমাদের কথা মানেননি। এ লোকেদের কথা মেনে যুদ্ধে চললেন।

এবার হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর তার সাথীদের বোঝাতে চাইলেন এবং বড়ই আবেগ মথিত কণ্ঠে বললেন; 'ভাইসব! আল্লাহর দোহাই। আমরা এখন শত্রুদের মুখোমুখি। এমতাবস্থায়, তোমরা তোমাদের নবী ও স্বজাতীয় ভাইদের ত্যাগ করে কখনোই চলে যেয়ো না।'

কিন্তু তারা শুনল না। চলে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল ঃ 'আমাদের যদি বিশ্বাস হত যে, শত্রুদের আমরা পরাজিত করতে পারব তাহলে আমরা তোমাদের কখনোই ত্যাগ করতাম না। কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে এতে কোনো সুবিধা করা যাবে না।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাকি সৈন্যদের নিয়ে এগিয়ে চললেন। সাথে রইল মাত্র সাত'শ মুসলমানের এক বাহিনী। এঁরা তিন হাজার সৈন্যের বিশাল এক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চলেছেন। ক্রোধান্ধ শত্রুরাও বেরিয়েছিলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে রক্তের বদলা নিতে।

২

ঐ দেখা যায় উহুদ[১] প্রান্তর। ঐ ময়দানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাহিনী ও তাঁর প্রবল শত্রু কুরাইশ বাহিনী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। একদিকে আল্লাহর পথে নিবেদিত প্রাণ একদল পবিত্রাত্মা বান্দা অন্যদিকে আল্লাহর শত্রু ও বিপথগামী একদল পাপাত্মা।

দু'পক্ষই ব্যূহ রচনার কাজে নেমে পড়ল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদের আগেই ব্যূহ রচনা করলেন। হযরত মুসআব বিন উমাইর (রাঃ) এর হাতে পতাকা অর্পণ করা হল। পাহাড়-ঘেরা এই উপত্যকার পিছন দিক থেকে শত্রু বাহিনীর আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পঞ্চাশ ধনুর্ধর সৈন্যকে মোতায়েন করলেন ঐ উপত্যকার পিছনে। তিনি

---

১. উহুদ একটি পাহাড়ের নাম। মদীনার দেড় মাইল উত্তরে সেটি অবস্থিত।

তাদের স্পষ্ট ভাষায় এই বলে নির্দেশ দিলেন ঃ 'তোমাদের প্রধান এবং একমাত্র কাজ হল আমাদের পশ্চাদভাগ রক্ষা করা। কোনো অবস্থাতেই যেন শত্রুরা পিছন থেকে আমাদের ঘিরে ফেলতে না পারে। সর্বদাই তোমরা ঐ স্থানে মোতায়েন থাকবে। কখনোই ওখান থেকে হটে যাবে না। আমরা যদি জয়লাভ করি এবং শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করি তা সত্ত্বেও তোমরা ঐ স্থান ত্যাগ করবে না। এমন কি যদি আমরা শত্রুবাহিনীর হাতে নিশ্চিহ্নও হয়ে যাই তবুও তোমরা আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে না। হাঁ, ওখান থেকে তোমরা শত্রুদের উপর সর্বদাই তীর বর্ষণ করতে থাকবে। কেননা, ঘোড়া তীরকে ভয় পায়।'

ওদিকে কুরাইশরাও মজবুত করে ব্যূহ রচনা করল। এক পংক্তির দায়িত্ব অর্পিত হল খালিদ বিন ওয়ালিদের উপর এবং অন্য পংক্তির দায়িত্ব দেওয়া হল ইকরামার উপর। পতাকা দেওয়া হলো আব্দুদ্দার গোত্রের লোকেদের হাতে এবং সমগ্র বাহিনীর নেতৃত্বে থাকল আবু সুফিয়ান।

আবু সুফিয়ান ধ্বজাধারীদের মধ্যে উন্মাদনা জাগানোর উদ্দেশ্যে বলল ঃ 'পতাকার উপরেই জয় পরাজয় নির্ভর করে। সেজন্য তোমরা তার মর্যাদা রক্ষার জন্য হয় তা ধারণ করো অথবা তা ত্যাগ করে রণক্ষেত্রের বাইরে চলে যাও।'

আব্দুদ্দার গোত্রের লোকদের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা জেগে উঠল। তাদের মধ্যে প্রবল অহংকার জেগে উঠল। তারা বুক ফুলিয়ে বলল ঃ 'মোকাবিলা তো হতে দাও। তখনই দেখতে পাবে আমাদের শক্তি ও সাহস।'

উন্মাদনা সৃষ্টির ব্যাপারে মহিলারাও মোটেই পিছিয়ে রইল না। এদের মধ্যে হিন্দই ছিল সবার চেয়ে অগ্রসর। তারা সৈন্যদের ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করে ঘুরে ঘুরে দফ বাজিয়ে আর নেচে গেয়ে তাদের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করতে লাগল। তারা বলতে লাগলঃ 'আব্দুদ্দারের যুবকগণ! অগ্রসর হও। মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষা করো। শত্রুদের বিরুদ্ধে নির্মমভাবে অস্ত্র চালাও।'

তারপর তারা নেচে নেচে এই কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল ঃ

'আমরা আরব, দূর আকাশের চাঁদসিতারার মেয়ে।
আমরা চলি আকাশ গাঙে সোনার তরী বেয়ে।
যদি তোমরা আগ বাড়িয়ে লড়াই করো
নিঠুরভাবে তোমরা যদি শত্রু নিধন করো
জেনো তবে ধন্য হবে বক্ষে মোদের পেয়ে,
হারো যদি হবে নরাধম সব অধমের চেয়ে।
আমরা তবে করব ঘৃণা সব ঘৃণার চেয়ে॥

হিন্দ ওয়াহ্শীর কাছে গিয়ে তার পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলল ঃ 'আবু দসমা! তুমি আমায় জুড়িয়ে দাও। তুমি নিজেও মুক্তি পেয়ে স্বস্তি লাভ করো।'

আবু আমীর আউসী ব্যূহ থেকে বেরিয়ে ময়দানে নেমে এলো। তার সাথে সাথে দেড়'শ সাথীও বেরিয়ে এলো। তার ধারণা ছিল যে, তাকে দেখামাত্রই মদীনার আনসাররা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ত্যাগ করে তার পক্ষে যোগ দেবে। সে চীৎকার করে বললঃ 'আউস গোত্রের লোকসকল! আমি আবু আমীর বলছি।'

সাথে সাথে মুসলমানরা জবাব দিলেনঃ 'পাপাত্মা নরাধম। তোর মুখে চুণকালি পড়ুক।'

আবু আমীর বলল ঃ 'আমার অভাবে আমার গোত্রের লোকেরা নষ্ট হয়ে গেছে।'

তারপর কিছুক্ষণ পর্যন্ত দু'পক্ষের পক্ষের মধ্যে পাথর ছোড়াছুড়ি চলল। অবশেষে, আবু আমীর সদলবলে পিছু হটে গেল।

আবু সুফিয়ান চীৎকার করে বললঃ 'আউস ও খাযরাজ গোত্রের ভাইসব! তোমরা মাঝখান থেকে পিছু হটে যাও। আমাদের ভাইদের সাথে আমাদের মোকাবিলা করতে দাও। আমরা তোমাদের কিছু বলব না।'

আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা একথা শোনামাত্রই আবু সুফিয়ানকে যা ইচ্ছে তাই করে গালমন্দ করল।

এবার প্রিয়নবী হামলা করার অনুমতি দিয়ে দিলেন। কিছু সৈন্যকে তিনি মায়মুনার দিকে আর কিছু সৈন্যকে মাইসরার দিকে পাঠিয়ে দিলেন এবং আরেকটি লড়াকু বাহিনীকে শত্রুদের ব্যূহ ভেদ করে আক্রমণ করার হুকুম দিলেন। ইসলামের শের মহাবীর হামজা (রাঃ) অগ্রসর হলেন। ভীষণ গর্জন করে ধ্বনি দিয়ে বললেন ঃ 'শত্রু নির্ধন করো।' বাস্তবিকই এ ছিল সমস্ত মুসলমানদের অন্তরের ধ্বনি।

হযরত আলি (রাঃ) শত্রু সৈন্যদের ব্যূহ ভেদ করে ভিতরে চলে গেলেন। সৈন্যদের পতাকা ছিল তালহার হাতে। সে মোকাবিলার জন্য সামনে অগ্রসর হতেই হযরত আলি (রাঃ) বিদ্যুৎ বেগে তার উপর আক্রমণ হানলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার ভাই উসমান পতাকা হাতে তুলে নিল। এবার হযরত হামজা (রাঃ) অগ্রসর হয়ে তার উপরে আগাত হানলেন। যে হাতে পতাকা ছিল সে হাতটি সঙ্গে সঙ্গে দেহ থেকে বিচ্ছিন হয়ে গেল। উসমান সঙ্গে সঙ্গে অন্য হাতে পতাকা নিয়ে নিল। হযরত হামজা (রাঃ) এবার অন্য হাতে আঘাত হানলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে হাতটিও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এবার

পতাকা হাতে তুলে নিল উসমান ও তালহার ভাই সাঈদ। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস তাকে লক্ষ করে তীর নিক্ষেপ করলেন। তা তার বুক বিদীর্ণ করে দিল। ওখানেই তার ইহলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল। এভাবে তালহা ও তার ভাইদের হাতে হাতে ঘুরতে ঘুরতে এবার তার দু পুত্র মুসাফিআ ও তালহার হাতে এসে গেল। এবার হযরত আসিম বিন আফলাহ (রাঃ) তাদের দু'জনকে লক্ষ করে আঘাত হানলেন। তারা দুজনেই ভূপাতিত হয়ে তড়পাতে লাগল। কুরাইশ মহিলাদের মধ্যে তাদের মা সুলাফাও ছিল। সে অবিলম্বে তার সন্তানদের কাছে পৌঁছে গিয়ে তার দু ছেলেকে নিজের দুকোলে শুইয়ে নিল। তাদের অন্তিমক্ষণ ঘনিয়ে এসেছিল। সুলাকা অশ্রুভারাক্রান্ত নেত্রে বললঃ 'আমার কলিজার টুকরো সন্তানেরা! বলো, তোমাদের কে মেরেছে?' ছেলেরা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে বললঃ 'আমাদের যখন তীর লেগেছিল, তখন আমাদের কানে এ কথাটি পৌঁছেছিলঃ 'এ নাও আমি আবুল আফলাহর পুত্র।'

সুলাকা সে সময় মান্নত করল ঃ 'আবুল আফলাহর মাথার খুলি ভরে আমি শরাব পান করব। আর যে তার মাথা কেটে আনতে পারবে তাকে আমি একশত উট উপহার দেবো।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতে তলোয়ার নিয়ে বললেন ঃ 'এর হক কে আদায় করবে?'

এই কাজের কৃতিত্ব লাভের জন্য অনেকেই এগিয়ে এলেন। হযরত আবু দুজানা আনসারিও উঠে এলেন। তিনি আরবের বিখ্যাত পালোয়ান ছিলেন। তিনি নিবেদন করলেনঃ 'আল্লাহর রসূল! এর হক কী?'

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'যতক্ষণ এ অস্ত্র ভোঁতা না হয়ে যাবে ততক্ষণ শত্রুদের উপর অনবরত আঘাত হানতে থাকো।'

হযরত আবু দুজানা সে তলোয়ার হাতে তুলে নিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী এক বীর পুরুষ। তার এক রুমাল ছিল। তিনি যখন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতেন তখন সেটি মাথায় বেঁধে নিতেন। তখন লোকেরা বুঝতে পারত যে, আবু দুজানা লড়াই করবেন। তিনি মৃত্যুর রুমাল বের করলেন। তিনি তা মাথায় বেঁধে বীর বিক্রমে সেনাদল থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। এটা তাঁর জন্য নতুন কোন ব্যাপার ছিল না। লড়াইয়ের সময় তিনি এভাবেই চলতেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দেখে বললেন ঃ 'এভাবে চলা আল্লাহ পছন্দ করেন না কিন্তু এখনকার জন্য তা পছন্দনীয়।'

হযরত আবু দুজানা শত্রুসৈন্যের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। তাঁর মাথায় ছিল মৃত্যুর পতাকা বাঁধা। পৌত্তলিকদের লক্ষ করা মাত্রই এক আঘাতে তাদের মাথা উড়িয়ে দিতে লাগলেন। কোন শত্রু সামনে এলে তার আর নিস্তার নেই। সঙ্গে

সঙ্গে মাথা উড়িয়ে দিতে লাগলেন। একের পর এক পংক্তি নির্মূল করে দিতে লাগলেন। তিনি বীর বিক্রমে অগ্রসর হতে গিয়ে দেখলেন এক ব্যক্তি লোকদের উত্তেজিত করে তুলছে। তাদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। তিনি তলোয়ার উঠালেন তাকে নির্মূল করার জন্য। কিন্তু সে সময় সে খুব জোরে চীৎকার করে উঠলে দেখা গেল, সে আর কেউ নয়– উৎবার কন্যা হিন্দ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র সংবরণ করলেন, কেননা, কোন নারীকে হত্যা করা এ তলোয়ায়ের জন্য অবমাননাকর।

প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিল। শত্রুদের প্রতি মুসলমানরা বীর বিক্রমে আঘাত হেনে চলেছেন। সব দিক দিয়েই তারা শত্রুদের দাবিয়ে রাখছিলেন। সৈন্যরা শত্রুব্যূহ ছিন্ন করে বীর বিক্রমে আঘাত হানছিলেন। একের পর এক লাশ পড়ছিল। তীরন্দাজ বাহিনী নিপুণ হাতে তীর নিক্ষেপ করছিলেন আর তা শত্রুদের বুক বিদীর্ণ করে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

হযরত হামজার (রাঃ) বীরত্বের কোনো তুলনা ছিল না। তিনি বাঘের মতো ঝাপিয়ে পড়ে শত্রুদের যমালয়ে পাঠাতে লাগলেন। শত্রুব্যূহ তিনি ছিন্নভিন্ন করে দিতে লাগলেন। কিন্তু ক্রীতদাস ওয়াহ্শী তাকে শকুনের মতো লক্ষ্য রেখে যাচ্ছিল। সে শুধু আক্রমণের সুযোগ খুঁজছিল। তার একটাই মাত্র লক্ষ্য শুধু মুক্তি।

সেই মুহূর্তটিও এসে গেল যে মুহূর্তটির জন্য সে এতদিন ধরে অপেক্ষমাণ ছিল।

হযরত হামজা (রাঃ) এক শত্রুর উপর আক্রমণ হানছিলেন। পাশেই ছিল এক পাহাড়ি টিলা। ঐ টিলার পিছনে ওয়াহ্শী স্থির লক্ষ নিয়ে বসে ছিল। সে আক্রমণের জন্য বর্শা তাক করছিল। হামজা তা মোটেই জানতেন না। সুযোগ বুঝেই সে হামজাকে (রাঃ) লক্ষ করে বর্শা নিক্ষেপ করল। সেই বর্শা তাঁর নাভি দিয়ে ঢুকে অপর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। হযরত হামজা (রাঃ) দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন সেটি কোন দিক দিয়ে এসেছে। তিনি দেখেতে পেলেন আঘাতকারী ওয়াহ্শী সাফল্যের আনন্দে হাসছে। হযরত হামজা (রাঃ) সমস্ত শক্তি নিয়ে তার দিকে ধাবিত হলেন কিন্তু শেরে খোদা হামজার (রাঃ) পদদ্বয় স্তব্ধ হয়ে গেল। তিনি ভূপাতিত হলেন। তিনি জীবনের সর্বশেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগ করছিলেন। আর আল্লাহর দুশমন দাঁড়িয়ে দেখল যে, আল্লাহ্ প্রেমিক এক মহান বান্দা তাঁরই মিলনের জন্য পরলোকপ্রাপ্ত হলেন। তাঁর প্রাণপাখি উড়ে গেল। তাঁর পুরো দেহ নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এবার ওয়াহ্শী অগ্রসর হয়ে তাঁর শরীর থেকে বর্শাটি টেনে বের করল। তারপর এক পাশে গিয়ে চুপচাপ বসে রইল। এখন তার যুদ্ধ করার আর কোনো প্রয়োজন নেই।

হযরত হামজা (রাঃ) শহীদ হয়ে গেলেন। কিন্তু শত্রুরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হতে লাগল। মুসলমানরা সমগ্র রণক্ষেত্র জুড়ে অব্যাহতভাবে আক্রমণ

চালিয়ে যেতে লাগলেন কুরাইশদের পতাকা আবদুদ্দারের পরিবারের লোকদের হাতে ছিল। তারা মুহূমুর্হূ এগিয়ে যেতে লাগল আর সাথে সাথে প্রাণ দিতে লাগল। সবশেষে পুরো পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। পতাকা এবার মাটিতে পড়ে রইল। শত্রুদের পা দেবে যাচ্ছিল। তাদের মনোবল ভেঙে চূর্ণবিচুর্ণ হয়ে পড়েছিল। তাদের ব্যূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছিল। ফলে, তারা রণক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে লাগল আর মুসলমানরা তাদের তাড়িয়ে ধরে মারতে লাগল। মুসলমানদের অস্ত্রাঘাতে মূহুমুর্হূ তারা প্রাণহীন দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল। আর যে মহিলারা এতক্ষণ রণক্ষেত্রে পুরুষদের উত্তেজিত করছিল অবশেষে তারাও পালাতে লাগল এবং নিকটবর্তী উপত্যকায় গিয়ে আশ্রয় নিতে লাগল।

মুসলমানরা এ দৃশ্য দেখে তাদের বিজয় নিশ্চিত মনে করে শত্রুনিধনে তৎপর না হয়ে তাদের ধনসম্পদ লুটের কাজে মনোযোগী হয়ে পড়ল। শত্রুদের প্রতি তাদের আর কোন ভ্রূক্ষেপ রইল না।

যে তীরন্দাজ বাহিনী গিরি উপত্যকায় পাহারায় নিয়োজিত ছিলেন তাঁরা দেখলেন যে, শত্রুরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেছে। আর মুসলমানরা যুদ্ধে পূর্ণরূপে জয়লাভ করেছে। তারা এও দেখল যে,মুসলমানরা শত্রুদের শত্রুসীমানায় প্রবেশ করে তাদের ধন-সম্পদ লুট করছে। তা দেখে তাদের কয়েকজন সাথী বলল ঃ 'এখানে অকারণে পড়ে থেকে আর কী লাভ? শত্রুরা তো হেরে পালিয়ে গেছে। ঐ দেখো আমাদের সহযোদ্ধারা লুটতরাজে নেমে পড়েছে। চলো, আমরাও যাই।'

অন্য কয়েকজন সাথী তাদের বাধা দিয়ে বললঃ 'তোমরা কী প্রিয়নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধাজ্ঞার কথা ভুলে গেছো? তিনি তো আমাদের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত রেখেছেন। কোনো অবস্থাতেই তিনি আমাদের এ স্থান ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন।'

পূর্বোক্ত লোকেরা বলল ঃ 'তাঁর কথার অর্থ এ ছিল না যে, শত্রুরা হেরে পালিয়ে গেলেও তোমরা এখানে পড়ে থাকবে।'

তাদের সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রাঃ) তাদের রোখার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন কিন্তু তা তারা শুনল না। তারাও মুসলমানদের সাথে লুটতরাজে লিপ্ত হয়ে পড়ল। ঐ গিরিপথে মাত্র কয়েকজন তীরন্দাজ মুসলিম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিষেধাজ্ঞা মেনে পাহারায় নিযুক্ত রইলেন। তাঁরা তাদের নেতার আদেশ মেনে নিয়ে নিষ্ঠার সাথে তাদের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রইলেন।

হঠাৎই খালিদ বিন ওয়ালিদের দৃষ্টি ঐ দিকে নিক্ষিপ্ত হল। দেখল যে, গিরিপথ একেবারেই শূন্য। কেবলমাত্র কয়েকজন তীরন্দাজ সেখানে মওজুদ রয়েছে। খালিদ বিলম্ব না করেই কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে সেখানে নির্ভয়ে আক্রমণ চালিয়ে দিল। এভাবে মাইসারা দলের নেতা ইকরামাও এসে উপস্থিত হল। হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রাঃ) তাঁর সাথীদের নিয়ে প্রাণপ্রণে বাধা দিলেন কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। শত্রুদের অস্ত্রাঘাতে তাঁরা সবাই শহীদ হয়ে গেলেন।

শত্রুদের বাধা দেয়ার মতো আর কেউ ছিল না। ফলে তারা নির্বিঘ্নে এগিয়ে চলল। যেখানে মুসলমানরা লুটতরাজে লিপ্ত ছিলেন এবং পৌত্তলিকরা যে স্থান ছেড়ে পালিয়েছিল তারা সেখানে পুনরায় ফিরে এসে চীৎকার করে সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলঃ 'উজ্জা– হুবুলের জয়। উজ্জা হুবুলের জয়।'

এবার মুসলমানদের মাথার উপরে শত্রুদের অস্ত্র ঝনঝন করতে লাগল। মুসলমানরা লুটতরাজে লিপ্ত ছিল। হঠাৎ এই বিপদ দেখে তারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ল। সবকিছু ত্যাগ করে তারা নিজেদের সামনে নিয়ে অস্ত্র বের করে লড়াই শুরু করল। কিন্তু তারা শত্রুবেষ্টিত হয়ে পড়েছিল। তারা প্রাণপণে শত্রু নিধনে প্রবৃত্ত হলেন কিন্তু বিপদ ঘনিয়ে এসেছিল। শত্রুমিত্র জ্ঞান হারিয়ে তারা এলোপাতাড়ি অস্ত্র চালাতে লাগল। ফলে, মুসলমানের অস্ত্রাঘাতে মুসলমান নিধন হতে লাগল। তাদের মুল লক্ষ্য থেকে তারা বিচ্যুত হয়ে পড়ল ফলে শত্রুমিত্রের কোন পার্থক্য করতে তারা ব্যর্থ হয়ে পড়ল। প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ চলল। কিন্তু মুসলমানরা কোণঠাসা হয়ে পড়ল। শত্রুপক্ষের যুদ্ধের পাল্লা ভারি হয়ে উঠল। এরই মধ্যে এক পৌত্তলিক শত্রু চীৎকার করে বলে উঠল ঃ 'মুহম্মদ নিহত হয়েছে।'

একথা শত্রুমিত্র নির্বিশেষে বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়ল। পুরো রণক্ষেত্রে তা যেন এক যাদুকরী প্রভাব ফেলল। একথা শুনে মুসলমানদের উপরে নিরাশার কালো মেঘ ছেয়ে গেল। অনেকেই উদ্যমহীন হয়ে পড়ল। এ খবর শত্রুদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল আর মুসলমানরা নিরাশার আঁধারে ডুবে যেতে লাগলেন। মুসলমান বীর সিপাহীদের অনেকের হাত-পা যেন স্থির হয়ে গেল। কেউ বা অস্ত্র ত্যাগ করলেন। কিন্তু এমন সিপাহীও ছিলেন যাদের মধ্যে প্রেরণার আগুন জাজ্বল্যমান ছিল। তারা ঈমানী চেতনায় ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলেন। যারা উদ্যমহীন হয়ে পড়েছিল তাঁদের অনুপ্রাণিত করতে লাগলেন। কিছু লোক বলতে লাগলেন ঃ 'মুহম্মদ নিহত হয়েছেন তো এখন আর বেঁচে থেকে লাভ কী? লড়াই চালিয়ে যাও। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সত্যের জন্য জীবন দিয়েছেন সেই সত্যের জন্য

তোমরাও জীবন দিয়ে দাও।' কিছু লোক বলল : 'মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কর্তব্য সমাধা করে গিয়েছেন। আল্লাহর বাণী তিনি আমাদের মধ্যে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছেন। এখন তা তোমরা রক্ষা করো এবং তাঁর জন্য লড়াই করো। আল্লাহ তো জীবিত আছেন। তিনি তো অবিনশ্বর। তাঁর তো মৃত্যু নেই।'

মুসলমানদের রক্ষণভাগ ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। যে যেখানে ছিল সে সেখানেই আটকা পড়ে গিয়েছিল। ও দিকে শত্রুবাহিনী বিরাট শক্তি প্রয়োগ করেছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওদিকে। শত্রুদের গতি ছিল নির্বিঘ্ন। শত্রুদের একটা দল মহানবীকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘিরে ফেলল। তারা তাঁকে হত্যা করার লক্ষ্যে তাঁর উপর নির্মমভাবে পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল। সেই সাথে অনবরত তীর নিক্ষেপ করতে লাগল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাদের মোকাবিলায় তীর বর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁর চারপাশে কয়েকজন জানিসারও ছিলেন। তারা তাঁকে প্রাণপণে রক্ষা করে যাচ্ছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘিরে থেকে তাঁরা তাঁর প্রতি বর্ষিত সমস্ত অস্ত্র তীর ও প্রস্তরাঘাত নিজেদের দেহে ধারণ করে তাকে রক্ষা করে যেতে লাগলেন। কয়েকজন বীর উল্টো আক্রমণও চালাতে লাগলেন। শত্রুদের প্রতি তাঁরাও যথারীতি তীর ও পাথর বর্ষণ করতে লাগলেন। বিখ্যাত তীরন্দাজ হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস ও (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও সমানে তীর নিক্ষেপ করে যেতে লাগলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে তাঁকে তীর উঠিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন : 'তোমার উপর আমার মাতা-পিতা উৎসর্গিত হোন। তুমি তীর চালিয়ে যাও। আবু তালহাও (রাঃ) নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিখুঁতভাবে তীর নিক্ষেপ করতে পারতেন। তিনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শত্রুদের প্রতি বহুসংখ্যক তীর নিক্ষেপ করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষার চেষ্টা করতে লাগলেন। হযরত আবু দোজানা (রাঃ) ঝুঁকে গিয়ে ঢাল হয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষা করতে লাগলেন। শত্রুবাহিনীর তীর তাঁর পিঠে এসে বিদ্ধ করতে লাগল। হযরত তালহা (রাঃ) নিজের হাত দিয়ে তলোয়ারের আঘাত প্রতিহত করতে লাগলেন। এর ফলে একটি হাত তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এমতাবস্থায় এক হতভাগ্য বাধা অতিক্রম করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে এসে তলোয়ার দিয়ে তাঁকে আঘাত করল। এ ছিল এক জোরালো আঘাত। সে আঘাতে দুটো লোহার শিক তাঁর দেহের মধ্যে গেঁথে গেল। এক শত্রু তাঁর উপর পাথর নিক্ষেপ করলে তা তাঁর পবিত্র মুখে লাগল। ফলে, তাঁর দুটি দাঁত শহীদ হয়ে গেল। সারা শরীর রক্তে ভেসে গেল। একদিকে অত্যাচারীরা আঘাতে আঘাতে তাঁকে জর্জরিত করছিল অন্যদিকে তাঁর পবিত্র মুখ দিয়ে এ বাক্য বেরিয়ে আসছিলঃ 'হে প্রভু! তুমি আমার কওমকে ক্ষমা করে দাও। তারা অবুঝ।'

এদিকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই অবস্থা ওদিকে মুসলমানরা নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি শহীদ হয়ে গেছেন। আর শত্রুরা আনন্দে নৃত্য করছিল। তাদের বহু বছরের সাধ এবার মিটেছে। প্রকৃতপক্ষে, শহীদ হয়েছিলেন হযরত মুসআব বিন উমাইর (রাঃ)। যে শত্রু তাকে শহীদ করেছিল তার নাম ছিল ইবনে কামিতা। হযরত মুসআবের চেহারার সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চেহারার কিছুটা মিল ছিল। সে জন্য ইবনে কামিতা মনে করেছিল যে সে মুহম্মদকে হত্যা করেছে। সে-ই প্রচার করল যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত হয়েছেন। সেই ভুল সংবাদই সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ল।

যে বীর সাথীরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষা করে যাচ্ছিলেন। তাঁরা চাইলেন এ খবরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আসল খবর প্রচার করতে কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করলেন। ফলে, তাঁরা নীরব হয়ে রইলেন। শত্রুদের মনে পুরো বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, মুহম্মদ প্রকৃতই নিহত হয়েছেন। কুরাইশদের লোকেরা সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃতদেহের সন্ধান করতে লাগল। প্রত্যেকেই চাচ্ছিল যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃতদেহের সন্ধান পাওয়ার মর্যাদা সেই প্রথম লাভ করবে এবং তাঁর মৃতুদেহকে অপমান করে তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা মিটিয়ে নেবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসন্ধানকারীদের মধ্যে আবু সুফিয়ানও ছিল। সে পাগলের মতো ছোটাছুটি করে তাঁর লাশ খুজতে লাগল এবং নিরাশ হয়ে বলতে লাগল ঃ 'মুহম্মদের লাশ তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!'

মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃতদেহ খুঁজতে খুঁজতে আবু সুফিয়ান দেখতে পেল অদূরেই হযরত হামজার (রাঃ) মৃতদেহ পড়ে আছে। এবার তার আস্ফালন দেখে কে? তার মধ্যেকার সমস্ত পাশববৃত্তি যেন মুহূর্তের মধ্যে একদল হিংস্র প্রাণীর রূপ ধারণ করে বেরিয়ে এলো। হযরত হামজার (রাঃ) নীরব নিথর মৃতদেহটি নিয়ে আবু সুফিয়ান নিষ্ঠুর আচরণ করতে লাগল। অশ্লীল আর অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে করতে বলল ঃ 'ওরে শত্রু। বদরের যুদ্ধে তুই যা কিছু করেছিলি আজ তুই তার মজা দেখ।' এই বলে মৃতদেহটির উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে যেতে লাগল। হুসাইন বিন জাইয়ান নামে এক খোদাদ্রোহী (কাফির) সেখানেই উপস্থিত ছিল। সে মৃতদেহের উপর এরকম জঘন্য আচরণ করতে আর কখনো দেখেনি। সে আবু সুফিয়ানকে ধরে চীৎকার করে বললঃ 'লোক সকল! তোমরা দেখো, ইনি কুরাইশদের নেতা। নিজের ভাইয়ের সাথে তার আচরণটা তোমরা দেখো।'

আবু সুফিয়ান চমকে উঠল। বলল ঃ 'ভুল হয়ে গেছে। তুমি একথা আর কাউকে বলো না।'

এবার খালিদের সাথে আবু সুফিয়ানের সাক্ষাৎ হয়ে গেল। আবু সুফিয়ান বলল ঃ 'মুহম্মদের মৃত্যুর খবর কী সঠিক?'

খালিদ বললঃ 'কয়েকজন সাথীকে নিয়ে তাঁকে আমি পাহাড়ের উপরে উঠতে দেখেছিলাম।'

সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে স্থির বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যই নিহত হয়েছেন, কিন্তু তাদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ হযরত কা'ব বিন মালিকের (রাঃ) অনুসন্ধানী দৃষ্টি তাঁকে দেখতে পেল। তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন কিন্তু তাঁর চোখ যেন ঝলসে উঠল। হযরত কা'ব আপনা-আপনি চীৎকার করে বলে উঠলেন ঃ 'মুসলমান ভাইসব! আল্লাহর রসূল এখানে আছেন।'

এ যেন এক গায়েবি আওয়াজের মতো দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল। এ সংবাদ শোনামাত্রই মুসলমানদের রক্তে তড়িৎপ্রবাহ বয়ে গেল। নিভন্ত প্রদীপ যেন মুহূর্তেই জ্বলে উঠল। এক প্রবল আত্মশক্তিতে মুসলমানরা সূর্যের মতো জ্বলে উঠলেন। চারিদিক থেকে জানিসার বাহিনী ছুটে আসতে লাগল। দেখতে দেখতে তাঁর চারপাশে সবাই জমা হয়ে গেল। হযরত আবু বকর ও উমর (রাঃ) ছিলেন সকলের আগে। অবস্থা বিগড়ে গিয়েছিল। বিপদ ঘনিয়ে আসছিল। তাঁর সুবিশ্বস্ত বীর সাহাবিরা তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগলেন। কেননা, সেখানে শত্রুদের পৌঁছানো সহজ কথা ছিল না। আবু আমীর আউসী পাহাড়ের গায়ে বেশ কিছু গর্ত খুঁড়ে রেখেছিল যাতে মুসলমানরা পাহাড়ে উঠতে গেলেই পা পিছলে সেখানে পড়ে যায়। সেখান দিয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পা পিছলে গেল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পড়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু আলি (রাঃ) ও তালহা (রাঃ) তাঁকে দ্রুত ধরে ফেলায় সে যাত্রায় বেঁচে গেলেন। এভাবে তাঁরা পাহাড়ের উপরে পৌঁছে গেলেন। আবু সুফিয়ান এ দৃশ্য দেখে সদলবলে পাহাড়ে উঠতে লাগল। হযরত উমর (রাঃ) ও অন্য কয়েকজন অনুচর পাহাড়ের উপর থেকে অনবরত পাথর বর্ষণ করলেন। ফলে তারা আর পাহাড়ে উঠতে পারল না।

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুসংবাদ মদীনায় পৌঁছে যাওয়ার সাথে সাথে সেখানে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হল। লোকেরা দলে দলে উহুদের প্রান্তরে ছুটে চলল। হযরত ফাতিমা এ খবর শোনামাত্রই পাগলিনীর মতো কাঁদতে কাঁদতে ছুটে চললেন। এক সময় তিনি প্রাণপ্রিয় পিতার সন্নিধানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। গিয়ে দেখলেন তখনো মহানবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ক্ষতস্থানগুলো থেকে অঝোরে রক্ত ঝরছে। তা দেখে তিনি বেদনাভারাক্রান্ত হয়ে উঠলেন। দুই চোখ ভরে অশ্রু বয়ে যেতে লাগল। হযরত আলি (রাঃ) পাত্র ভরে পানি আনতে লাগলেন আর ফাতিমা (রাঃ) ক্ষতস্থান ধুয়ে দিতে লাগলেন। তবুও রক্ত বন্ধ হয় না। অবশেষে চাটাই পুড়িয়ে তার ছাই ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিতেই রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল।

উবাই বিন খলফ ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এক জঘন্যতম শত্রু। মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবিত থাকার সংবাদে সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। সে কয়েকজন সাথী নিয়ে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পানে ছুটে চলল। সে ক্রোধে চীৎকার করে বলল ঃ 'মুহম্মদ কোথায়? সে যদি বেঁচে থাকে তাহলে আমার বেঁচে থাকা হারাম।'

সে যখন সবেগে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে গিয়ে হাজির হল তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাথীদের কাছ থেকে একটি বর্শা নিয়ে তাকে খুব সামান্য পরিমাণ খোঁচা দিলেন। সে মুহূর্তেই অস্থির হয়ে উঠল। তারপর আর্তচীৎকার করতে করতে ছটফট করে মারা গেল।

এই যুদ্ধে সত্তর জন মুসলমান শহীদ হন। শহীদদের মধ্যে অনেক বিখ্যাত বীর সাহাবিরা ছিলেন। শেরে খোদা হামজা(রাঃ)ও ছিলেন। ওয়াহ্শী আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। সে ছিল হামজার (রাঃ) হত্যাকারী। সে হিন্দের কাছে পৌঁছে গিয়ে তাকে তার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার পুরস্কার চাইলঃ 'আমি তো হামজাকে হত্যা করেছি। এখন তুমি আমাকে কী পুরস্কার দেবে?' হিন্দ বললঃ 'আমি তোকে আমার মুল্যবান হারটা দিয়ে দেবো। এখন আমাকে বল সে কোথায়?

'ওয়াহ্শী হিন্দকে সাথে করে হামজার (রাঃ) মৃতদেহের কাছে নিয়ে গেল। হামজার (রাঃ) মৃতদেহ দেখামাত্রই হিন্দ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। সে তার অস্ত্র দিয়ে হামজার (রাঃ) পেট কাটল। তারপর তাঁর কলিজা কেটে বার করে নিষ্ঠুরভাবে তা চিবোতে লাগল। যাতে তার অন্তর্জ্বালা জুড়িয়ে যায়। কিন্তু সে তা গিলতে না পেরে উগরে দিল। তারপর সে তার গলার হার খুলে ওয়াহ্শীকে দিয়ে দিল। তারপর সে অন্যান্য কুরাইশ মহিলাদের সাথে নিয়ে মুসলমানদের মৃতদেহ থেকে নাক-কান কেটে কেটে তা দিয়ে 'ফুলহার' বানিয়ে নিজের গলায় পরে নিল।

শত্রুরা তাদের নিজেদের লাশগুলো মাটি চাপা দিয়ে ফেলেছিল। এবার তারা মক্কার পথে রওয়ানা হল। তারা আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। তারা দৌড়ে পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে চীৎকার করে বলল ঃ 'মুসলমানগণ! বদরের প্রতিশোধ নিলাম। আগামী বছর বদরে তোমাদের সাথে আবার মোকাবিলা হবে।'

তারপর তারা ফিরে যেতে যেতে বলল ঃ 'সৈন্যদের মধ্যেকার কিছু লোক মৃত ব্যক্তিদের নাক-কান কেটে নিয়েছে। আমরা তাদের এ কাজ করতে হুকুমও দিইনি বাধাও দিইনি। আমরা এতে আনন্দিতও নই; খুশীও নই।'

মুসলমানরা পাহাড় থেকে নেমে এসে মৃত সাথীদের মৃতদেহ কবরস্থ করার কাজে নেমে পড়লেন। হযরত হামজার (রাঃ) উপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হল। তাঁর মৃতদেহ ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পড়ে ছিল। তিনি তা দেখে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তাঁর দু'চোখ বেয়ে এত অশ্রু বিগলিত হল যে, তাতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেল। তারপর, তাঁর ব্যথাহত কণ্ঠ হতে উচ্চারিত হল এই বাক্যটিঃ 'উহ! এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্য আমি আর কখনো দেখিনি।' তারপর তিনি বললেন ঃ যদি সাফিয়া (রাঃ) (হামজার (রাঃ) বোন) দুঃখ না পেত এবং আমার আশঙ্কা না থাকত যে, আমার পরে এ কাজ সুন্নত হয়ে যাবে তাহলে আমি তাঁর (হযরত হামজা (রাঃ)র)-এ মৃতদেহ এ অবস্থাতে রেখে যেতাম যাতে তাঁকে হিংস্র পশু ও শকুনে খেয়ে ফেলে। আল্লাহর কসম! তাই যদি হত তাহলে আমি তাদের ত্রিশ ব্যক্তিকে হত্যা করে এর প্রতিশোধ নিতাম।'

কিন্তু তাঁর এ বক্তব্য শেষ হওয়ার সাথে সাথেই পবিত্র কুরআনের এই মঙ্গলবার্তা অবতীর্ণ হল ঃ

'তুমি যদি প্রতিশোধ গ্রহণ করো তাহলে এতটাই করো যতটা তোমার প্রতি করা হয়েছে। কিন্তু যদি তুমি ধৈর্য ধারণকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকো তবে তাই যথেষ্ট এবং মুহম্মদ! ধৈর্য ধারণ কর এবং আল্লাহই তোমার সহায় হবেন। আর তুমি ঐ অত্যাচারীদের প্রতি দঃখিত হয়ো না এবং তাদের ঘৃণ্য আচরণে রুষ্ট হয়ো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের সহায় যারা আল্লাহর নাফরমানি হতে নিজেদের রক্ষা করে এবং তাঁর অসন্তুটিকে ভয় এবং যাঁরা সার্বিক আচরণে উত্তম।'

দ্বাদশ অধ্যায়

একেশ্বরবাদের প্রদীপের উপর অন্ধকারের যাত্রীদের হামলা

— বনী নজীরদের নির্বাসন

— রাস্তা থেকেই কুরাইশদের প্রত্যাবর্তন

— বনী নজীরদের দুরাচরণ

— সত্যধর্মের বিরুদ্ধে সমগ্র আববের মতৈক্য

— জানিসারদের সাথে রসূল্লাহ্‌র (সাঃ) পরামর্শ

— পরিখা খনন

— মদীনার সীমানায় শত্রুসৈন্যদের টহল

— নিজেদের চৌকিতে ইসলামী বাহিনী

— খন্দক পার হওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা

— শত্রুসৈন্যদের মধ্যে হতাশা

— বনী কুরাইজার বিশ্বাসঘাতকতা

— হযরত সফফিয়্যার আশ্চর্যজনক বীরত্ব

— হযরত আলীর (রাঃ) দৃষ্টান্তমূলক বীরত্ব

— তুফানী হামলা

— হযরত সাদের (রাঃ) শাহাদত

— শত্রুসৈন্যদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব

— বনী কুরাইজার শিক্ষাপ্রদ পরিণাম।

দ্বাদশ অধ্যায়

একেশ্বরবাদের প্রদীপের উপর অন্ধকারের যাত্রীদের হামলা

১

উহুদের দিনটি ছিল মুসলমানদের জন্য বড়ই কঠিন দিন। যুদ্ধ শেষ হলেও আঘাতে আঘাতে তাঁরা জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন। শরীরের সর্বত্রই ক্ষতচিহ্ন। এসব দেখে শত্রুদের আনন্দের সীমা ছিল না। মুহূর্মুহূ তারা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল। ইহুদিরা দুশমনদের ক্রোধের আগুনে অনবরত ঘৃতাহুতি দিতে লাগল। কপটচারীদেরও খুশীর সীমা রইল না। মুসলমানদের এ দুরবস্থা দেখে তারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠতে লাগল। এ যুদ্ধে যদিও মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন তা সত্ত্বেও শত্রুরা জয়ের মুখ দেখেনি। সেজন্য তাদের খুব বেশি খুশি হওয়ার বিশেষ কারণ ছিল না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিন্তা করলেন, শত্রুরা যেন একথা ভেবে খুব বেশি উদ্বেলিত না হয় যে, যুদ্ধে আমাদের ক্ষয়ক্ষতি দেখে পুনরায় আক্রমণ হেনে আমাদের নিঃশেষ করে দেবে। তাই তিনি তাঁর বিশ্বস্ত কয়েকজন সহচরকে ডেকে বললেন ঃ 'শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করতে তোমরা কে কে রাজি আছো ?' মুসলমানরা যদিও আঘাতে জর্জরিত ছিলেন তা সত্ত্বেও এক গভীর স্বর্গীয় প্রেরণায় উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন তাঁরা। সঙ্গে সঙ্গে সত্তরজন সাহাবী প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা বাহিনী প্রস্তুত হয়ে গেল। এ বাহিনীতে আবুবকর (রাঃ) ও যুবাইরের (রাঃ) মতো বিশিষ্ট সাহাবীরা ছিলেন।

ওদিকে আবু সুফিয়ান সসৈন্যে মক্কায় ফিরে যেতে যেতে চিন্তা করল কাজ তো এখনও সম্পূর্ণ হল না। তাই সে ভাবল, মদীনায় ফিরে গিয়ে পুনরায় আক্রমণ চালিয়ে দেবে। মুসলমানরা তো আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে রয়েছে। আমাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে তাদের শক্তি ও সাহসে আর কুলাবে না। কিন্তু সে অবিলম্বেই বুঝতে পারল যে, মুসলমানরা অত সহজে তাকে ছাড়বে না। আর প্রিয়নবী নিজেই সদলবলে তার পশ্চাদ্ধাবন করে অতি দ্রুত এগিয়ে আসছেন। তাই সে ভাবল, আর নয়; বরং আমাদের তাড়াতাড়ি মক্কায় নিরাপদ স্থানে ফিরে যাওয়া উচিত। যাতে পুনর্বার যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ফলে, আবারো পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফিরে না আসতে হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পশ্চাদ্ধাবন করে 'হামরা-এ-আসাদ' পর্যন্ত এসে পৌঁছালেন, কিন্তু আবু সুফিয়ানের টিকিটিও পর্যন্ত পাওয়া গেল না। তারপর ফিরে এলেন। ঐ স্থানটি মদীনা থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত।

কী আশ্চর্য জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা যে আল্লাহ তাঁকে দান করেছেন তা ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে পারা যায় না। তিনি এমন একটা সময়ে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন, যে সময় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আঘাতে জর্জরিত হয়ে ছিলেন। যুদ্ধে বিফল মনোরথ হওয়ার মতো হৃদয়-বিদারক অবস্থাও তাঁর মধ্যে বিরাজিত ছিল। সে সাথে যুদ্ধক্ষেত্রের নিহত ব্যক্তিদের উপর পাশবিক অত্যাচারের হৃদয়বিদারক দৃশ্যও তাঁর চোখের সামনে ভাসছিল।

উহুদ যুদ্ধের বেদনাদায়ক পরিণতিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানসিকভাবে অনেকটা দুঃখাহত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা ছিল শত্রুদের জঘন্য আচরণ। তারা এটাকে তাদের জন্য বড় একটা সুযোগ বলে মনে করতে লাগল। কয়েকটি গোত্র তাঁর বিরুদ্ধে সরাসরি শত্রুতায় অবতীর্ণ হল। ফলে, বাধ্য হয়ে তাদের মোকাবিলায় নামতে হল। ছোটখাটো যুদ্ধও হল। যুদ্ধে জয়লাভও হল। ফলে, কিছু ধন-সম্পদও হাতে এসে গেল। কিন্তু কিছু মানুষের জীবনান্ত হল। ঐগুলির মধ্যে একটি ঘটনা সবচেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তার পরিণাম ও ফলাফলও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তা হল বনী নজীর গোত্রের নির্বাসনের ঘটনা। এটি ছিল একটি ইহুদি গোত্র। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে তারা চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা বিশ্বাসভঙ্গ করে। তারা ধোঁকা দিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার চক্রান্ত করে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা জানতে পারেন। ফলে, তিনি তাদের মদীনা থেকে বের করে দিতে বাধ্য হন। বেরিয়ে তো গেল, কিন্তু তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্থায়ী শত্রুতে পরিণত হল। এবার তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমে পড়ল। তারা তাঁকে পদে পদে ব্যর্থ করে দেয়ার শপথ নিল। তারা একের পর এক গোত্রে গিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগল।

কুরাইশরা উহুদ থেকে ফিরে যাওয়ার আগে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দর্পভরে জানিয়ে গিয়েছিল ঃ 'আগামী বছর বদর প্রান্তরে তোমাদের সাথে আবারো মোকাবিলা হবে।' দেখতে দেখতে সে সময় সম্মুখবর্তী হয়ে এলো। সাহস তো ছিলই না। একথা বলে যাওয়ার জন্য নিজেরা নিজেদের কাছে অপদস্ত হয়ে পড়েছিল। তারা উদ্যমহীন হয়ে পড়েছিল। এ ও ছিল তাদের জন্য একটা বদনামের ব্যাপার। এর ফলে, সমাজে তার সম্ভ্রমহানিরও আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। সর্বত্রই তাদের কাপুরুষতার কথা প্রচার হয়ে যাওয়ার ভয় ছিল। ফলে, তারা একটা নতুন চাল চালল। তারা মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের লোক পাঠিয়ে দিল যাতে তারা কুরাইশদের যুদ্ধের প্রস্তুতির কথা শুনিয়ে মুসলমানদের ভীতসন্ত্রস্ত

করে তোলে। তাদের লোক-লশকর, হাতি-ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্রসহ যুদ্ধের প্রস্তুতির মিথ্যা খবর বাড়াবাড়ি করে প্রচার করে যুদ্ধে মুসলমানদের নিরুৎসাহিত ও ভয়-ভীত করার কাজে লাগানো হল। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দ্বারা কবেই বা ভয়ভীত ছিলেন ? এতে তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহসে বিন্দুমাত্রও ভাঁটা পড়ল না। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ঐ দিনই তিনি সদলবলে বদর ময়দানে পৌঁছাবেন। পরিণামে যাই হোক না কেন।

দেখতে দেখতে সে দিন এসে গেল। তিনি তাঁর সাথীদের নিয়ে বদর অভিমুখে রওয়ানা হলেন। সে মওসুমে প্রতি বছরই সেখানে বাজার বসে যেত। তাঁর সাথীরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সাথে কিছু কিছু মালপত্রও নিয়ে নিলেন। গিয়ে দেখলেন, সেখানে কুরাইশদের নামনিশানা পর্যন্ত নেই। বীর মুসলমানরা সেখানে কুরাইশদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

মান-সম্মান ও লজ্জা-শরমের একটা ব্যাপার ছিল। কুরাইশদের লজ্জা নিবারণেরও একটা ব্যাপার ছিল। এ ছাড়া তাদের আর কোনো পথ ছিল না। কিন্তু ভয়ংকরভাবে পরাজিত হবার একটা ভয় ছিল। সে জন্য কোন অবস্থাতেই তারা যুদ্ধে যেতে রাজি ছিল না। তা সত্ত্বেও সাহসে ভর করে তারা বেরিয়ে পড়ল। দুদিন ধরে তারা বদরের পথে এগিয়ে চলতে লাগল। কিন্তু ভয়ে বুক কাঁপতে লাগল। আরও অগ্রসর হওয়াটা বিপজ্জনক বলে মনে হতে লাগল। আবু সুফিয়ান ছিল এ বাহিনীর সেনাপতি। সে বলল, 'ভাইসব! এটা একটা শুখা মওসুম। যুদ্ধ-বিগ্রহ ভালোই হচ্ছে। চলো, এবার আমরা মক্কায় ফিরে যাই। এসো। আমি তো চললাম।' খোদ সেনাপতির যেখানে এ অবস্থা তখন কে আর অগ্রসর হয় ? ফলে, সবাই মক্কার পথে ফিরে চলল। প্রিয়নবী বদর ময়দানে আটদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। বদরে বাজার বসে গিয়েছিল। সাথে মাল-সম্পদও ছিল। মুসলমানরা ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করলেন। আল্লাহ যথেষ্ট পরিমাণে অনুগ্রহ বর্ষণ করলেন। আটদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরও কুরাইশদের টিকিটি পর্যন্ত দেখা না যাওয়ায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথীদের নিয়ে মদীনায় ফিরে চললেন। পথে চলতে চলতে শত্রুদের কাপুরুষতা ও সাহস নিয়ে নানা কথাবার্তা চলতে লাগল। মুসলমানরা আল্লাহর অনুগ্রহের কথা পরম শান্তির সাথে বারবার স্মরণ করতে লাগলেন। শতমুখে উচ্চারিত হতে লাগল আল্লাহর প্রশংসা। আর সেই সাথে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মুসলমানদের শির তাঁর উদ্দেশ্যে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় পৌঁছে পূর্ণমাত্রায় ইসলাম প্রচারের কাজে নেমে পড়লেন। সত্য প্রচারের পথে বাধা আসতে লাগল, কিন্তু সে

স্বর্গীয় প্রেরণার পথে সেসব বাধা অতি সহজেই অতিক্রম করে যেতে লাগলেন। দেখতে দেখতে সমগ্র হিজাযে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ল। কেবলমাত্র হিজায নয়; সিরিয়ার সর্বত্রই ইসলামের আহ্বান ছড়িয়ে পড়ল।

২

কুরাইশরা মুসলমানদের লোহার মতো কঠিন ও সুদৃঢ় বলে মেনে নিয়েছিল। তারা তাদের শক্তি ও সাহস দুটোই হারাতে বসেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার। বনু নজীর গোত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি জ্বলে-পুড়ে মরছিল। এবার তাদের নেতা কুরাইশদের শরণাপন্ন হল। তাদের মধ্যে হুইয়াই বিন আখতাবও ছিল। সালাম বিন আবুল হুকাইকও গিয়েছিল তাদের সাথে। তারা সেখানে গিয়ে কুরাইশদের মনে সাহস যোগাতে লাগল। সেই সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উত্তেজিত করল। তারা বললঃ 'ভয় কিসের ? আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি। আমরা মুহম্মদকে ধ্বংস করেই তবে দম নেবো। সেজন্য আমরা তোমাদের সাথে চুক্তি করতে এসেছি।'

একথা শুনে কুরাইশরা উত্তেজিত হয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে নতুন করে শক্তি ও সাহস জেগে উঠল। তাদের মধ্যেকার নিভন্ত আগুন হঠাৎ আবার জ্বলে উঠল। তারা ইহুদিদের খাতির করতে লাগল। তারপর আহলাদে আটখানা হয়ে তাদের বলল ঃ 'হাঁ। আমরা তো এটাই চাই। মুহম্মদের শত্রুরাই আমাদের বন্ধু। এবার তাহলে আমরা তার দর্প চূর্ণ করে দিতে পারব।'

এরপর কুরাইশরা বলল ঃ 'ভাইসব! আগে থেকেই তো তোমাদের কাছে আসমানী কিতাব মওজুদ রয়েছে। মুহম্মদের সাথে আমাদের মতভেদ রয়েছে তা তোমরা জানো। অনুগ্রহ করে বলো তো, আমাদের ধর্ম ঠিক না মুহম্মদের ধর্ম ঠিক?'

সে হতভাগ্য মিথ্যুকরা বলল, 'তওবা করো। তোমাদের ধর্মের সাথে কী তার ধর্মের কোন তুলনা হতে পারে ? কোথায় ঠিক আর কোথায় বেঠিক। কোথায় সত্য আর কোথায় অসত্য ?'

এভাবে ইহুদিরা কুরাইশদের সাথে উত্তেজনাকর কথাবার্তা বলতে লাগল। কুরাইশদের সাথে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলে তাদের উত্তেজিত করল। কুরাইশরা ইহুদিদের ধোকাবাজিতে পড়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারা ক্রোধে অন্ধ হয়ে বলতে লাগল ঃ 'আমাদের শরীরের শেষ রক্তবিন্দুটুকু দিয়ে হলেও আমরা মুহম্মদের সাথে লড়ব। মুহম্মদের ধর্মকে কিছুতেই আমরা ছড়িয়ে পড়তে দেবো না। মুহম্মদের কবল থেকে দুনিয়াকে আমরা রক্ষা করবই। তার ধর্মের নাম-নিশানা মিটিয়ে না দেয়া পর্যন্ত আমাদের শান্তি নেই।'

অবশেষে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত হল। দিন তারিখও নির্ধারিত হয়ে গেল। ইহুদিরা শুধু কুরাইশদের মধ্যে যুদ্ধের আগুন জ্বালাল না; তারা অন্যান্য গোত্রেও গেল। সে সব জায়গাতেও যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে দিল। তারা জ্বালাময়ী ভাষণ দিল। লোকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিল। তারা আজফান গোত্রেও গেল। সেখানে লোকদের সবজির বাগ-বাগিচা দেখাল। লোভও দেখাল প্রচুর। তারপর তাদের বললঃ 'খায়বারের সমস্ত উৎপাদিত পণ্যের অর্ধেকটা তোমাদের দিয়ে দেবো। এ যুদ্ধে তোমরা আমাদের সাথী হও।' এভাবে তারা অন্যান্য গোত্রেও গেল। বনী সুলাইম, বনী আসাদ, বনী ফাজারা, বনী আশজা, এমন কী বনী মুররাদের কাছেও গেল। এদের সবাইকে তারা নতুন ধর্মের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করল। তারা তাদের ধর্ম রক্ষার জন্য মরণপণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য উত্তেজিত করল। এমন কী বাগ্-বাগিচাও দেখাল খুব।

এবার সমগ্র আরব মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করল। কী পৌত্তলিক, কী ইহুদি–সমস্ত ইসলাম-বিরোধী জনগোষ্ঠী তাদের শয়তানী আকাঙ্ক্ষা ও অপবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে ইসলামের আলোকে চিরকালের জন্য নির্বাপিত করে দেয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ হল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে বিরাট এক বাহিনী যুদ্ধাভিযানে বহির্গত হল। এ যেন এক জনসমুদ্র। কমপক্ষে দশ হাজার রক্তপিপাসু সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মুসলমানদের চেপে মারার জন্য অগ্রসর হল।

হে মুহম্মদ! আল্লাহ আপনার সহায়। তিনিই আপনাকে সাহায্যও করতে পারেন এবং শত্রুদের ধ্বংস করে দিতে পারেন!!

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারলেন যে, সমগ্র আরব তাঁর বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট হয়েছে। সবাই দল বেঁধে চারিদিক থেকে বন্যার পানির মতো ধেয়ে আসছে। মদীনা আক্রমণ করে তারা তছনছ করে দেবে এবং দুনিয়া থেকে ইসলামের নাম-নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দেবে। আল্লাহ রক্ষাকর্তা......। যে বাহিনীতে সমগ্র আরবজগৎ একত্রিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এগিয়ে আসছে, তিনি কোন শক্তির বলে সে বাহিনীর মোকাবিলা করবেন ? তাদের এ ধ্বংসযজ্ঞ তিনি কীভাবে প্রতিরোধ করবেন?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথীদের একত্রিত করে পরামর্শ করলেন। সকলেই বললেন ঃ 'বাইরে না বেরিয়ে মদীনায় থেকেই মোকাবিলা করা হোক।' হযরত সালমান ফারসি ইরানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সেখানকার যুদ্ধবিগ্রহের কিছু নিয়ম-কানুনও জানতেন। তিনি বললেন ঃ 'খোলা ময়দানে বেরিয়ে গিয়ে মোকাবিলা করাটা ঠিক হবে না। এক সুরক্ষিত স্থানে সৈন্য সমাবেশ করে সেখানে পরিখা খনন করা হোক।'

এ প্রস্তাবটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মনঃপুত হল। তারপর তিনি আদেশ করলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। অনতিবিলম্বেই মুসলমানরা কাজে নেমে পড়ল। দেখতে দেখতে গাঁইতি, শাবল, কোদাল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদির ব্যাবস্থা হল। বনী কুরাইজা গোত্রের ইহুদিরা মুসলমানদের সাথে পূর্ব থেকেই চুক্তিবদ্ধ ছিল। তাই বেশির ভাগ উপকরণ সেখান থেকেই এলো।

মদীনা নগর তিনদিক থেকে বাড়ি-ঘর ও খেজুর গাছ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। কেবলমাত্র একটা দিক খোলা ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথীদের নিয়ে সে রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে এসে পরিখা খননের কাজে নেমে পড়লেন। পরিখার নক্সা তিনিই তৈরি করলেন। তারপর প্রতি দশ জনের মধ্যে দশ গজ করে জমি খননের কাজ বণ্টন করে দিলেন। তিনি নিজেও খননকার্যে নেমে পড়লেন। তা দেখে তাঁর নিবেদিতপ্রাণ সাহাবিরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে কাজ করতে লাগলেন। এ আনন্দের সীমা-পরিসীমা ছিল না। শীতের রাত ছিল। প্রতি তিন দিন অন্তর কাজের বিরতি থাকত। নিবেদিতপ্রাণ মুসলমানরা এর মধ্যেও কাজ করে যেতে লাগলেন। ঝুঁড়ি ভর্তি মাটি নিয়ে 'সালাআ' পাহাড়ের পাদদেশে ফেলতেন এবং সেখানকার পাথর এনে পরিখার পাশে জড়ো করতে লাগলেন যাতে প্রয়োজন পড়লে শত্রুদের উপর নিক্ষেপ করা যেতে পারে।

তিন হাজার মুসলমানের পবিত্র হাত সে কাজে নিয়োজিত রইল। এক স্বর্গীয় প্রেরণার বলে তারা এমনভাবে কর্মব্যস্ত রইলেন যে, তারা ক্ষুৎ-পিপাসা পর্যন্ত ভুলে গেলেন। কিছুদিনের মধ্যেই পরিখা খননের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল। পরিখা খননের কাজ সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই মদীনা শহর সুরক্ষিত হয়ে গেল। মদীনা শহরের পাশে একটি পাহাড় ছিল। তা 'সালাআ' পাহাড় নামে পরিচিত। এ দুয়ের মধ্যে একটা লম্বা চওড়া ময়দান ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ ময়দানে সেনা সমাবেশ করলেন।

মদীনার অল্প বয়সী ছেলেরাও যুদ্ধে যাওয়ার আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল। বাহিনী রওয়ানা হওয়ার সাথে সাথে তারাও বাপ-ভাইদের পিছু ধরল। সৈন্যরা ময়দানে পৌঁছালে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সৈন্য গণনা করলেন। যাদের বয়স পনের বছরের বেশি ছিল কেবলমাত্র তাদের যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হল। যাদের বয়স কম ছিল অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হল।

এ ছিল হিজরতের পঞ্চম বছরের জীকাদা মাসের ঘটনা। শত্রুবাহিনীর একটি অগ্রগামী দলকে মদীনার নিকটবর্তী স্থানে দেখা গেল। আবু সুফিয়ানের ইচ্ছা ছিল যে, মুহম্মদের সাথে সে উহুদের প্রান্তরে মোকাবিলায় অবতীর্ণ হবে।

সেখানে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ না হওয়ায় বাহিনীকে মদীনা অভিমুখে চালিয়ে দিল। মদীনার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছে সে শিবির স্থাপন করল। সুফিয়ান ও আরো কয়েকটি গোত্র উহুদের নিকটবর্তী জায়গায় অবস্থান করতে লাগল।

শত্রুবাহিনীর একটি ছোট দল মদীনার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছাতেই মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করতে পারল। তারা সেখানে পৌঁছে সম্পূর্ণ নতুন একটি জিনিস দেখল। যা ছিল তাদের কল্পনারও অতীত। তারা আশ্চর্য হয়ে গেল। এ আবার কী ? এ তো দেখি পরিখা!! মদীনার সুরক্ষার জন্য তারা পরিখা খুঁড়েছে ? তাহলে কী আমাদের বাহিনী ঐ পরিখা অতিক্রম করে মদীনায় ঢুকতে ব্যর্থ হবে ? যার জন্য এত কিছু করা হল সে আয়ত্তের বাইরে রয়ে যাবে ? আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা কী তাহলে ব্যর্থ হয়ে যাবে ? আমরা কী কিছুই করতে পারব না ? মুহম্মদ কী তাহলে জীবনের মতো রক্ষা পেয়ে যাবে ?

এ ক্ষুদ্র দলটি তাদের মূল বাহিনীতে ফিরে গেল। তারা লোকদের এ 'অশুভ' সংবাদটি জানিয়ে দিল। সে শুনল, সে-ই হতবাক হয়ে গেল। তারা বলাবলি করতে লাগল ঃ 'আল্লাহর কসম! এ তো দেখছি সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পনা! আরব দেশে তো এ জিনিস আর কখনোই দেখা যায়নি!'

কুরাইশদের আগমনের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই মুসলমানরা তাঁদের ঘাঁটিতে সতর্ক হয়ে গেলেন। 'সালাআ' পাহাড়ের পাদদেশে এক তাঁবু ফেলা হল। যার রঙ ছিল লাল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে গিয়ে যুদ্ধের পরিকল্পনা রচনা করলেন। ইসলামী বাহিনীর লোকসংখ্যা ছিল তিন হাজার। তিনি তাদের কয়েকটি অংশে ভাগ করে দিলেন। কিছু সৈন্যকে কয়েকটি ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে পরিখা দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োজিত করা হল। পরিখার যে স্থানটিতে আক্রমণের আশঙ্কা বেশি ছিল সেখানেও কিছু সৈন্যকে পাহারা দেয়ার জন্য মোতায়েন করা হল। বাকি সৈন্যদের শত্রুদের মোকাবিলার জন্য পংক্তিবদ্ধ করা হল। এদের সম্মুখভাগকে পরিখার দিকে মুখ করে মোতায়েন করা হয়েছিল। হাতে বর্শা, তীর, ধনুক ও কামান নিয়ে তাঁরা সেখানে মোতায়েন রইলেন।

এবার উভয় পক্ষই মুখোমুখি। কুরাইশরা পরিখা পার হওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। মুসলিম বাহিনীর তীর বর্ষণে কুরাইশ বাহিনী নাজেহাল হয়ে পড়ল। ফলে তারা পিছু হটতে লাগল। এবার মুসলিম বাহিনী পরিখার অপর পাড় থেকে তীর বর্ষণ শুরু করল। এভাবে যুদ্ধ চলতে চলতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। দু'পক্ষই শিবিরে ফিরে গেল। পরদিন প্রভাতেই কুরাইশ বাহিনী পুনরায় পরিখা পার হওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু এবারও ব্যর্থ হল। এ ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল তারা। ব্যর্থতার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে অকথ্য ভাষায়

গালিগালাজ করতে করতে তারা নিজেদের শিবিরে ফিরে গেল। তারা এবার স্পষ্টরূপে বুঝতে পারল যে, তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। সে সময় প্রচণ্ড ঝড় ও তুফান সমানে বয়ে চলেছিল। সেই সাথে ছিল হাড়কাঁপানো শীত। এ শীতে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে তারা বরফের মতো জমে যাচ্ছিল। তাই তারা ক্ষোভে ও ক্রোধে ফেটে পড়ছিল।

একদিকে বিরূপ আবহাওয়া অন্যদিকে মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অভূতপূর্ব রণকৌশল কুরাইশদের এ অভিযানকে ব্যর্থ করে দিল। হতাশার কালো মেঘ কুরাইশ বাহিনীকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'মুহম্মদকে এখন কীভাবে পরাজিত করা সম্ভব ? হুইয়াই বিন আখতাব এ অবস্থা দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। সেনা সংগ্রহের জন্য সেই সবচেয়ে বেশি উদ্যোগী ছিল। মানসিকভাবে সে খুবই ভেঙে পড়েছিল। সে প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেল। অবশেষে সে বলল, 'সৈন্যরা তো এমনিতেই হতাশ হয়ে পড়েছে। এখন যদি তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাহলে কী উপায় হবে ? তখন তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। সেজন্য অবিলম্বে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।' সে আর দেরি না করে দৌড়ে আবু সুফিয়ানের কাছে এসে বলল ঃ 'আমার গোত্র বনী কুরাইজাও তো তোমার সাথে আছে। আর তাদের শক্তি ও সাহসের কথাও তোমার ভালো রকম জানা আছে।' আবু সুফিয়ান বলল ; 'তাহলে আর দেরি করো না, দৌড়ে যাও। গিয়ে বলো, মুহম্মদের সাথে শান্তিচুক্তি ভেঙে দাও।'

হুইয়াই বিলম্ব না করেই বনী কুরাইজাদের কাছে গিয়ে যে কোনো উপায়ে চুক্তি ভঙ্গ করে দু'একজনকে সাথে করে নিয়ে আসার জন্য ছুটে গেল।

বনী কুরাইজার সরদার একথা জানতে পারলেন। তিনিই মহানবীর (সাঃ) সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি হুইয়াইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করাটা মোটেও পছন্দ করলেন না। তাই বিলম্ব না করেই দুর্গের দরজা বন্ধ করে দিলেন। হুইয়ের মতলব তিনি টের পেয়ে গিয়েছিলেন। হুইয়াই দুর্গের দরজায় পৌঁছেই আওয়াজ দিলেন এবং দরজা খোলার জন্য বললেন। তাকে আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে বলল ঃ 'আমি জানি তোমরা কেন দরজা বন্ধ করেছো। তোমরা ভাবছ যদি আমি তোমাদের খাস পেয়ালায় শরীক হয়ে যাই ? কা'ব লজ্জা পেলেন। তিনি দরজা খুলে দিলেন। হুইয়াই বলল, 'দেখো ভাই কা'ব! আমি তোমার জন্য কত বড় মান-মর্যাদার সুসংবাদ নিয়ে এসেছি! সমুদ্রের মতো বিশাল এক বাহিনী নিয়ে এসেছি। সারা আরবভূমি উজাড় হয়ে এসেছে। কুরাইশ ও গাতফান গোত্রের সমস্ত নেতারাও এসেছেন। সবারই একটাই লক্ষ্য, তারা মুহম্মদের রক্ত পান করতে চায়। সবাই একমত হয়ে, মুহম্মদকে সদলবলে নির্মূল করা ছাড়া শান্তি নেই।'

কা'ব বললেন ঃ 'আল্লাহর কসম! তুমি আমাকে বেইজ্জতি করতে চাচ্ছো। আমি মুহম্মদের সাথে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ। এখন এ চুক্তি ভঙ্গ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মুহম্মদ সর্বদাই আমাদের সাথে চুক্তির শর্ত মেনে চলছেন।'

হুইয়াই তবুও নিরাশ হল না। সে বারবারই কা'বের মন ভাঙানোর চেষ্টা করতে লাগল। সে বলল ঃ 'সম্প্রদায়ের সমস্ত মানুষের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব এখন তোমার হাতে। তাদের ইজ্জত-সম্ভ্রমও তোমারই হাতে। তুমি একটু চিন্তা করে দেখো। এ সুযোগ হাতছাড়া করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তুমি মুহম্মদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করো এবং সৈন্যদের যাওয়ার রাস্তা দিয়ে দাও। তারা বন্যার মতো প্রবেশ করবে এবং মুহম্মদ ও তার বাহিনীকে নির্মূল করে দেবে। তারপর, সমগ্র আরবে আবার আমাদের আধিপত্য বিস্তার হবে। আমাদের ধর্মও নিষ্কণ্টক হয়ে যাবে। মদীনার সমস্ত ধন-সম্পদ আর জমি-জায়গাও আমাদের অধিকারে এসে যাবে।'

এবারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল না। হুইয়াইয়ের বক্তব্য যাদুর মতো কাজ করল। কা'ব তার মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে চুক্তি ভঙ্গ করতে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু তবুও সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। চুক্তিভঙ্গের পরিণাম সম্পর্কেও সে চিন্তিত হয়ে পড়ল। সে ভাবতে লাগল, 'কুরাইশ ও গাতফানদের সম্মিলিত বাহিনী যদি পরাজিত হয় তাহলে কী দশা হবে ? তারা তো নিজেদের বাঁচানোর জন্য তখন অন্য পথ ধরবে। আর আমরা তো একাকী হয়ে যাবো। তখন আমাদের কী উপায় হবে ? বনু নজীর ও বনু কায়নুকাদের মতোই পরিণাম আমাদের ভুগতে হবে।' কিন্তু এ আশঙ্কাও তার দূর হয়ে গেল। হুইয়াই বলল ঃ 'আল্লাহ্ না করুক, আমরা যদি হেরে যাই আর কুরাইশরা যদি রণক্ষেত্র ত্যাগ করে পালিয়ে যায় তাহলে আমি খায়বার ছেড়ে দিয়ে তোমাদের সঙ্গে এসে বসবাস করব। বিপদাপদে সর্বদাই আমরা তোমাদের সাথে থাকব।' এবার কা'ব পুরোপুরিভাবে তার পাতা ফাঁদে পা দিয়ে ফেলল। সেও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে শত্রুবাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। হুইয়াই আনন্দিত চিত্তে আপন বাহিনীতে গিয়ে এ সংবাদ জানিয়ে দিল। এবার তারা ভাবতে লাগল জয় আমাদের সুনিশ্চিত। কেবলমাত্র বনু কুরাইজাদেরই আগমনের অপেক্ষা।

বনু কুরাইজাদের শত্রুতার কথা হাওয়ার বেগে ছড়িয়ে পড়ল। এ খবর মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ল। এ ছিল মুসলমানদের জন্য এক বিপদঘন্টা স্বরূপ। তাঁদের বাহিনীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। মদীনা শহরও অরক্ষিত প্রতিপন্ন হল। মালপত্র পৌঁছানোর রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেল। শত্রুদের আক্রমণের আশঙ্কাও বৃদ্ধি পেয়ে গেল। কেননা, আক্রমণের এক নতুন রাস্তা মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এ রাস্তা দিয়ে শত্রুদের মদীনা আক্রমণের পথ সহজতর হয়ে গিয়েছিল।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য অতি দ্রুত একটি লোক পাঠিয়ে দিলেন। তিনি সেখানে গিয়ে দেখলেন শত্রুরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকটা ব্যক্তিই যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য সাদ বিন উবাদা (রাঃ) ও সা'দ বিন মুআজকে (রাঃ) বনী কুরাইজার নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ করার জন্য পাঠালেন। সাদ বিন উবাদা (রাঃ) ছিলেন সা'দ গোত্রের এবং সা'দ বিন মাআজ ছিলেন আউস গোত্রের নেতা। এরা বনী কুরাইজাদের সাথে সপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের দু'জনকে বললেন ঃ 'খবর যদি সত্যি হয় তাহলে তা আমাকে গোপনে জানাবে, যাতে মুসলমানদের মন ভেঙে না যায়। সে জন্য তা যেন উচ্চেস্বরে জানিয়ে না দেয়া হয়।'

এঁরা সেখানে পৌঁছে অত্যন্ত দুঃখজনক পরিস্থিতি অবলোকন করলেন। লড়াই করে মুসলিম বাহিনীকে নির্মূল করে দেয়ার সিদ্ধান্তে অটল। বিভিন্ন গোত্রের নেতাদের আস্ফালন ছিল সবচেয়ে দৃষ্টিকটু ও লজ্জাজনক। তারা নিঃশঙ্ক চিত্তে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছিল। সে হতভাগ্যরা একথাও পর্যন্ত বলছিল ঃ 'কে আল্লাহ ? কে আল্লাহর রসূল ? মুহম্মদের সাথে কোন রকমের আপস নেই।'

বীর মুসলমানদের মধ্যে উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ল। অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। হযরত সা'দ বিন মাআজ (রাঃ) তাঁর সাথীদের সামলে নিয়ে একথা বলতে বলতে চলে গেলেন 'কী আছে ? এদের সাথে আমাদের সম্পর্ক তো আগে এর চেয়েও খারাপ হয়ে পড়েছিল।'

দু বীর পুরুষ ফিরে গিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গোপনে সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করলেন, কিন্তু তা গোপন থাকল না। সেনাবাহিনীর মধ্যে অতি দ্রুত সে খবর ছড়িয়ে পড়ল। সর্বত্রই চাপা আতঙ্কের ভাব লক্ষ্য করা গেল। হতাশার কালো মেঘ সর্বত্রই ছড়িয়ে গেল। তারা বলাবলি করতে লাগল ঃ 'পরিখা তো খুব খনন করা হল। কিন্তু এবার পরিখায় কী করবে ? এবার বনী কুরাইজাদের দুর্গ থেকে হামলা হবে। হায়, এবার কী হবে ?'

এবার কঠোর অবরোধ জারি হল। এভাবে কয়েক দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। শত্রুরা পুরো মদীনা শহরকে কঠোরভাবে অবরোধ করে রাখল। মুসলমানদের কাছে তা বড় কঠিন বলে মনে হতে লাগল। কারো কারো কাছে তা বড়ই অসহনীয় বলে মনে হতে লাগল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশঙ্কা করলেন যে, সাথীদের অনেকেই হয়তো সাহস হারিয়ে ফেলবে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গাতফানদের কাছে এই মর্মে এক ব্যক্তিকে দিয়ে প্রস্তাব পাঠালেন যে, তারা যদি যুদ্ধ না করে মদীনা ত্যাগ করে

চলে যায় তাহলে মদীনার এক তৃতীয়াংশ আবাদী তাদের দিয়ে দেয়া হবে। গাতফান এ প্রস্তাব আনন্দের সাথে মেনে নিল। কথা পাকা করার জন্য তারা এক ব্যক্তিকে পাঠাল। কিন্তু এক তৃতীয়াংশ নয়; তারা অর্ধেকাংশ দাবি করল। আবু সুফিয়ান এ সবের কিছুই জানত না। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাদ বিন মাআজ ও সাদ বিন উবাদাকে ডেকে তাঁদের সাথে পরামর্শ করলেন। সাদ বিন মাআজ বললেনঃ 'আল্লাহর রসূল! এ যদি আল্লাহ্‌র আদেশ হয় তাহলে আপত্তির কারণ দেখি না। যদি আপনার ইচ্ছায় সিদ্ধান্ত হয় তাও স্বীকার আর যদি আমাদের লোকেদের পক্ষে সিদ্ধান্ত হয় তাহলে সবিনয়ে কিছু নিবেদন করি।'

মহানবী বললেন ঃ 'এটা তো তোমাদের সুবিধার জন্যই করছি। আমি চিন্তা করছি যে, এর ফলে শত্রুদের শক্তি কিছুটা কমবে।'

সা'দ বিন মাআজ নিবেদন করলেন ঃ 'যখন আমরা বিধর্মী ছিলাম তখন তো কেউ আমাদের কাছ থেকে কিছুই নিতে পারেনি। এখন তো আপনারই কল্যাণে আমরা অনেক উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছি। তাদের জন্য আমাদের অবশিষ্ট আছে নাঙ্গা তলোয়ার।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হিম্মত দেখে খুবই আনন্দিত হলেন। এর ফলে গাতফানদের সাথে চুক্তির ইচ্ছা তিনি তাঁর মন থেকে ত্যাগ করে দিলেন। আর সে সাথে গাতফানদের লোকটি চলে গেল।

গাতফান গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নাম ছিল নুয়াইম বিন মাসউদ। তিনি ভিতরে ভিতরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর গোত্রের কেউ তা জানত না। তিনি গোপনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে তাঁর ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ শুনিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে সবিনয়ে নিবেদন করলেন ঃ 'আল্লাহ্‌র রসূল! আমার ইসলাম গ্রহণের কথা কেউ জানে না। আপনার মন যা চায় তা আমার কাছ থেকে করিয়ে নিন।'

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'নুয়াইম! তুমিই তো একমাত্র ব্যক্তি। যেভাবেই হোক, এ মুসিবত দূর করো। এ জন্যে তোমার যা ইচ্ছা তাই করার অনুমতি দেয়া হল।'

নুয়াইম ফিরে গিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন ঃ 'কী করি ? কীভাবে শত্রুদের ব্যর্থ করি ? কীভাবে এ দুরাকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ করি ?'

শত্রুরা নতুন শক্তি ও প্রেরণার বলে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। প্রথম থেকেই তাদের মধ্যে এ উৎসাহ উদ্দীপনা কাজ করছিল। শীতের প্রতিও তাদের 'কুচ পরোয়া নেহী' ভাব। কারণ, বনী কুরাইজা তাদের সাথী হয়েছিল। এবার তাদের মনের আশা পূরণ হওয়াটাই শুধু বাকী। পদাতিক বাহিনীকে তিনটি ভাগে ভাগ

করা হয়েছিল। তারা সকল দিক থেকেই ইসলামী বাহিনীকে ঘিরে রেখেছিল যাতে তারা কোথাও বেরুতে না পারে। অশ্বারোহী বাহিনী এদিকে ওদিকে ঘুরে ঘুরে মুসলমানদের উপর নির্মমভাবে তীর বর্ষণ করতে লাগল।

মুসলমানরা বড়ই হয়রান হয়ে পড়েছিল। তাঁরা একেবারেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় তাঁরা অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তা ছাড়া যে কোন সময়েই ইহুদিদের পক্ষ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। মহিলা ও শিশুদের শহরের এক কেল্লার মধ্যে রাখা হয়েছিল। বনী কুরাইজাদের পক্ষ থেকে ঐ দুর্গে আক্রমণের আশঙ্কাও ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু সৈন্যকে কেল্লা পাহারা দেয়ার কাজে নিয়োজিত রাখলেন। যাদের কাজ ছিল সারা মদীনা শহরে ঘুরে ফিরে শত্রুদের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং কেল্লার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

ইহুদিদের চুক্তিভঙ্গের কথা মুসলমানরা সর্বতোভাবে অবগত ছিলেন। আর তারাও চাচ্ছিল মুসলমানদের দুর্বলতম জায়গাটি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে যাতে তাদের উপর আক্রমণ চালানো সহজ হয় এবং তা ব্যর্থ না হয়।

এ আশায় ইহুদিদের একটি দল মুসলমাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তেই যথারীতি সে খবর মুসলমানদের কাছে পৌঁছে গেল। তাঁরা তাদের পিছু ধাওয়া করতেই ইহুদিরা পালিয়ে গেল।

মহিলা ও শিশুরা যে দুর্গে অবস্থান করছিলেন, সেটি বনী কুরাইজাদের নিকটবর্তী স্থানেই অবস্থিত ছিল। বনী কুরাইজারা চিন্তা করল– 'মুসলমান বাহিনী তো শত্রুদের মোকাবিলায় ব্যস্ত। এটাই উপযুক্ত সুযোগ। বিলম্ব না করেই দুর্গটি অধিকার করে নেওয়া যাক। এ উদ্দেশ্যে এক ইহুদি মুসলমানদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য দুর্গের কাছে এসে চারিদিকে চক্কর মারতে লাগল। দুর্গে হযরত সাফিয়াও (রাঃ) ছিলেন। তিনি ছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ফুফু। ইহুদিটি তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারল না। মহিলাদের পাহারা দেয়ার জন্য হযরত হাসসানকে (রাঃ) নিয়োজিত রাখা হয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট কবি। তিনি কবিতার মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষ থেকে শত্রদের কুৎসামূলক কবিতার জবাব দিতেন। ইহুদিকে দেখে সাফিয়া (রাঃ) ঘাবড়ে গেলেন। তিনি বিলম্ব না করেই হাসসানকে (রাঃ) তা জানিয়ে দিতে গিয়ে বললেন ঃ 'দেখুন, এখানে একটা ইহুদি সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছে। ওকে এক্ষুণি হত্যা করুন। নইলে সে পালিয়ে গিয়ে শত্রুদের খবর দিয়ে দেবে। মুসলমানরা তো যুদ্ধে লিপ্ত। সে যদি বেঁচে যায় তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

হযরত হাসসান (রাঃ) ছিলেন ভীরু প্রকৃতির লোক। তিনি বললেন ঃ 'আবদুল মুত্তালিবের কন্যা! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তুমি জানো যে, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই!'

এবার আর কোন উপায় ছিল না। হযরত সাফিয়া (রাঃ) তাঁবু থেকে একখানি লাঠি উপড়ে নিয়ে চুপিচুপি নীচে নেমে এলেন। তারপর সুযোগ বুঝে ইহুদিটির মাথায় এমন জোরে মারলেন যে, তার মাথা ফেটে গেল।

তিনি দুর্গে ফিরে এসে হযরত হাসসানকে (রাঃ) বললেন ঃ 'ও পুরুষ মানুষ, আমি ওই কাজে হাত দেয়াটাকে ভালো বলে মনে করিনি। এখন যান, তার অস্ত্রশস্ত্রগুলো খুলে নিয়ে চলে আসুন।'

হযরত আসসান (রাঃ) বললেন ঃ 'আবদুল মুত্তালিবের কন্যা! যেতে তো দাও, ঐ জিনিসগুলোর তো কোন প্রয়োজন আমার নেই।'

হযরত সাফিয়া (রাঃ) বললেন ঃ 'আচ্ছা যান। তার মাথাটা কেটে ময়দানে ফেলে দিয়ে আসুন যাতে ইহুদিরা ভয় পেয়ে যায়।'

হযরত হসসান (রাঃ) এ কাজটি করার জন্যও প্রস্তুত ছিলেন না। বাধ্য হয়ে এ কাজটিও হযরত সাফিয়াকে (রাঃ) করতে হল। ইহুদিরা বুঝল যে, দুর্গের মধ্যেও কিছু সৈন্য মোতায়েন রয়েছে। ফলে, তারা দুর্গে আক্রমণ চালাতে সাহস পেল না।'

যতই দিন যেতে লাগল অবস্থা ততই খারাপ হয়ে পড়তে লাগল। কষ্টের পর কষ্ট বেড়েই চলল। রাতে ঘুমানোও পর্যন্ত হারাম হয়ে গেল। প্রতি মুহূর্তেই বিপদের সম্ভাবনা ছিল। ইসলামী বাহিনীর মধ্যে কপটচারীরাও (মুনাফিক) ছিল। এমতাবস্থায়, তারা কীভাবে এ কষ্ট নীরবে সয়ে যেতে পারে ? তারা বারবার এসে এসে মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে বাড়ি চলে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করতে লাগল। তারা বারবার বলতে লাগলঃ 'আমাদের বাড়ি-ঘর সুরক্ষিত নেই। বাল-বাচ্চারাও বিপদের সম্মুখীন। আমাদের শহরে ফিরে যেতে দিন।' তারা নিজেরাও যেমন, তেমনই মুসলমানদেরও বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য উসকে দিতে লাগল। তারা তাঁদের মধ্যে হতাশা ও মৃত্যুভয় ঢুকিয়ে দিতে লাগল। বলতে লাগল, মুহম্মদ তো আমাদের জন্য খুবই করলেন। খুব ভালো ভালো বাগ-বাগিচা দেখালেন। বললেন, কায়সার ও কিসরার সহায়-সম্পদ তোমরা পেয়ে যাবে। অথচ আজ অবস্থা এতই খারাপ যে, দানা-পানি পর্যন্ত পাচ্ছি না। আর জীবন তো মুঠোর মধ্যে এসে গেছে।'

বনী কুরাইজাদের বিশ্বাসঘাতকতার পর কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। কুরাইশ বাহিনী অস্থির হয়ে উঠল। তাদের প্রস্তুতির জন্যই তারা এতদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষমাণ ছিল। তারা শুধু রাস্তাটি পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল যাতে সে পথ দিয়ে মুসলমানদের দুর্গে আক্রমণ চালিয়ে তাদের বহু দিনের আকাঙ্ক্ষা পুরো করতে পারে। কিন্তু সে মুহূর্তেই তা সম্ভব ছিল না। প্রতিবন্ধক ছিল পরিখা। তা অতিক্রম করতে বারবারই তারা ব্যর্থ হচ্ছিল। সে জন্য বাইরে থেকে তারা পাথর ও তীর বর্ষণ করতে লাগল।

পরিখা এক জায়গায় কিছুটা সংকীর্ণ ছিল। সেখানে পাহারাও ছিল দুর্বল। শত্রুরা সে জায়গাটি দিয়ে পরিখা অতিক্রম করে মুসলমানদের উপর হামলা করতে চাইল। তারা অতিদ্রুত অগ্রবর্তী হল। ঘোড়া লাফ দিয়ে পরিখার অপর পারে চলে গেল। তারা উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে আবু জেহেলের পুত্র ইকরামা এবং জিরারও ছিল। সেই সাথে আরবের বিখ্যাত বীর আমর বিন আবদূদও ছিল। তাকে এক হাজার অশ্বারোহীর সমকক্ষ বলে মনে করা হত। সে প্রথমেই অগ্রসর হয়ে চীৎকার করে বলল ঃ 'আমার মোকাবিলায় কে এগিয়ে আসতে চায় ?'

হযরত আলি (রাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ 'আমি।' কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে থামালেন। হযরত আলী (রাঃ) বসে পড়লেন। আমর আবার চীৎকার করল। অন্য কেউ সাহস করল না। হযরত আলি (রাঃ) পুনরায় বললেন ঃ 'আমি।' তৃতীয় বারের মাথায়ও একই কথার পুনরাবৃত্তি হল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'সে আমর। তোমার কী জানা আছে ?' হযরত আলী (রাঃ) বললেন ঃ 'হাঁ। আমার খুব ভালো জানা আছে যে, সে আমর।' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে অনুমতি দিয়ে তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে তাঁর মাথায় পাগড়ি বেঁধে দিয়ে তাঁর হাতে তলোয়ার তুলে দিলেন। হযরত আলী (রাঃ) এবার আমরের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হলেন। আমর তাঁকে দেখে হেসে বলল ঃ 'কী ভাইপো! আমার মন যে চাচ্ছে না আমি তোমাকে মারি।' হযরত আলী (রাঃ) জবাব দিলেন ঃ 'কিন্তু আমি চাচ্ছি তোমাকে নিঃশেষ করে দিই।'

আমর ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। সে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে তলোয়ার চালাল। হযরত আলী (রাঃ) তা ঢাল দিয়ে রক্ষা করে প্রচণ্ড আঘাত হানলেন আমরের প্রতি। লোকেরা দেখল, আমর রক্তমাখা দেহ নিয়ে ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। মুসলমানরা 'নারায়ে তকবীর, আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিয়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুললেন। এ ধ্বনিই মুসলমানদের বিজয় ঘোষণা করল। কিছুক্ষণ ধরে আমরের সাথীরা মোকাবিলা করল। কিন্তু অবশেষে সবাই পালিয়ে যেতে লাগল।

এ আক্রমণে শত্রুরা ব্যর্থ হল, কিন্তু পরিখা অতিক্রম করাটা তাদের জন্য কম আনন্দের ব্যাপার ছিল না। তারা এবার অগ্রসর হয়ে মুসলমানদের সাথে জীবনপণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল এবং পরিখার অপর পারে অবস্থানরত মুসলমানদের মোকাবিলা করতে চাইল।

সূর্য ডুবে গিয়েছিল। সাথে সাথে অন্ধকারও ঘনিয়ে এলো। শত্রুদের একটা দল পরিখার দিকে অগ্রসর হল। সবার আগে ছিল বিখ্যাত বীর নৌফেল।

পরিখার কাছে পৌঁছেই সে ঘোড়া ছোটালো যাতে এক লাফে অপর পারে গিয়ে পৌঁছাতে পারে। কিন্তু ঘোড়া লাফিয়ে পার হতে না পেরে পরিখার মধ্যে পড়ে গেল। নওফেলের মাথা পরিখার মধ্যে ঘোড়ার দেহের চাপে পিষ্ট হয়ে গেল। এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে সাথীদের অগ্রসর হওয়ার সাহস আর থাকল না। বাধ্য হয়ে তারা উল্টো পথে ফিরে গেল।

আবু সুফিয়ান মুসলমানদের কাছে বলে পাঠালঃ 'প্রাণমূল্যের বিনিময়ে নওফেলের মাথা ফিরিয়ে দেয়া হোক।' প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব পাঠালেন ঃ 'তোমরা একে উঠিয়ে নিয়ে যাও। তার প্রাণমূল্যের কোন প্রয়োজন নেই আমাদের। তার লাশও নাপাক, তার প্রাণমূল্যও নাপাক।' শত্রুরা তার লাশ উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল, কিন্তু তবুও তারা যুদ্ধের মনোবাঞ্ছা ত্যাগ করল না। দিনরাত তারা পরিখা অতিক্রম করার চেষ্টা করতে লাগল। সেজন্য তারা সৈন্যদের ছোট ছোট দলেও ভাগ করে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দিয়ে তাদের পরিখা পার করানোর চেষ্টা চালাতে লাগল। এভাবে একটি দল ব্যর্থ হয়, আর একটি দল চেষ্টা করতে থাকে। এভাবে তারা চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল।

এভাবে মুসলমানদের উপর দিয়ে কয়েকটি বিনিদ্র রজনী অতিক্রান্ত হয়ে গেল। ঘরে ঘরে মহিলারা বড়ই উদ্বেগের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। সেই সাথে শিশুরাও। সত্যিই এ দুঃসহ অবস্থার কথা ভাবতেও কষ্ট হয়। আরো কষ্ট হয় এই আনসার বাহিনীর দুঃখকষ্টের কথা ভাবতে। শত্রুপক্ষ অনবরত তীর বর্ষণ করতে লাগল। আর তাঁরা জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে সত্যের পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে রাখতে জীবনের কর্তব্য পালন করে চললেন।

সময় ছিল বড়ই খারাপ। সমগ্র আরবের ইসলাম-বিরোধী শক্তি একতাবদ্ধ হয়েছিল ইসলামের নাম-নিশানা দুনিয়া থেকে চিরকালের জন্য মিটিয়ে দেয়ার জন্য। এমতাবস্থায় তাঁর একমাত্র ভরসা ছিলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ। তিনি একাগ্রচিত্তে আল্লাহর সাহায্য কামনা করে চললেন। দু'হাত তুলে আকুলচিত্তে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে দোয়া করে চললেন। ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য দু'হাত তুলে দোয়া করতে লাগলেন।

সামনেই মৃত্যু যমদুতের মতোই দাঁড়িয়ে ছিল। শত্রুরা শুধু তক্কে তক্কে রইল মুসলমানরা সামান্য গাফিল হলেই আক্রমণ চালিয়ে নির্মূল করে দেয়ার জন্য। এ দুরবস্থার মধ্যেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বীরত্বের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে চললেন। তিনি পরিখার বিভিন্ন অংশে সেনা মোতায়েন রাখলেন যাতে শত্রুদের হামলা হওয়ামাত্রই তার মোকাবিলা করতে পারে। একটা অংশ তিনি নিজেই রক্ষা করে চলেছিলেন। তিনি তীর দিয়ে শত্রুবাহিনীকে প্রাণপণে রুখে চললেন। এক মুহূর্তও কর্তব্যে অবহেলা করতেন না। সেখান থেকে সামান্য

সময়ের জন্য চলে গেলেও সেখানে দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে নিয়োজিত রাখতেন। একদিকে তিনি যেমন সাথীদের সাথে দায়িত্বশীলতার চূড়ান্ত করে যাচ্ছিলেন অন্যদিকে তেমনই মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন তিনি পেশ করে চলেছিলেন।

যুদ্ধের শেষ দিনটি কাঠিন্যের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়ে গেল। সারাটি দিন ধরে শত্রুদের সাথে চূড়ান্ত মোকাবিলা করে যেতে হল। শত্রুদের পাকা-পোক্ত তীরন্দাজরা পরিখা পরিবেষ্টন করে রেখেছিল। সেই সাথে অনবরত তীর বর্ষণ করে যাচ্ছিল। মুসলমানরা নাজেহাল হয়ে পড়েছিলেন। ক্ষুৎ-পিপাসায় তারা কাতর হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু নিজেদের স্থানে তাঁরা ছিলেন পাহাড়ের মতো সুদৃঢ়, অটল, অনড়। বিন্দুমাত্র পিছু হটেননি।

এ লড়াইয়ে মুসলমানদের পক্ষে বেশি জীবনহানি হয়নি। কিন্তু আনসারদের মধ্য থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি শহীদ হয়ে গেলেন। আউস গোত্রের নেতা হযরত সাদ বিন মাআজ (রাঃ) বড়ই বীরত্বের সাথে লড়াই করছিলেন। শত্রুরা তক্কে তক্কে ছিল। সুযোগ পেতেই তারা তাঁরা হাতে তীর মারল। ফলে হাতের রগ কেটে গেল। তা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। সে সময় সা'দ (রাঃ) আকাশের পানে দু'হাত তুলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উদ্দেশে মর্মস্পর্শী ভাষায় দোয়া করলেন ঃ 'হে আল্লাহ! কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ এখনো বাকী। তুমি আমাকে জীবিত রাখো। যে জাতির লোকেরা তোমার মনোনীত নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, যারা তাকে দেশছাড়া করেছে, তাদের চেয়ে বেশি লোকের সাথে লড়াই করার ইচ্ছা আমার নেই। কিন্তু তাদের সাথে যুদ্ধ যদি আর না হয় তাহলে তুমি আমাকে এ আঘাতেই শাহাদত দাও আর যতক্ষণ পর্যন্ত বনী কুরাইজাদের বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম না দেখতে পাই ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে মৃত্যু দিও না।'

সা'দের (রাঃ) উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক...। আর সর্বনাশ হোক বিশ্বাসঘাতক বনী কুরাইজার ইহুদিদের, যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে বেঈমানী ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে....। তারা যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করত, এ পরিস্থিতিতে ধোকা না দিত তাহলে এমন ভয়ানক পরিস্থিতি কখনোই সৃষ্টি হত না।

মুসলমানরা এক দুঃসহ অবস্থা অতিক্রম করছিলেন। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় তাদের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছিল। চোখে তাঁরা অন্ধকার দেখছিলেন। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিলেন। ওদিকে কপটচারিরা (মুনাফিক) ক্ষোভে ও ক্রোধে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তারা অত্যন্ত নির্লজ্জের মতো বলতে লাগল ঃ 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদের ধোকা দিয়েছেন।' তারা সর্বত্রই হতাশা ছড়াতে লাগল। মুসলমানদের মধ্যে উদাসীনতা দেখা যেতে লাগল। এমন অবস্থাতেও

পবিত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তাঁর দুটি চোখে অভূতপূর্ব উজ্জ্বলতা ফুটে উঠতে লাগল যা গভীর পরিতৃপ্তি ও আত্মবিশ্বাসের পরিচয় বহন করছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন বিজয়ের ফিরিশতা তাঁর সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন....!!

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ চেহারা দেখে মুসলমানদের মধ্যেকার সমস্ত উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা দুরিভূত হয়ে উঠল। তাদের মধ্যে আনন্দ ও খুশি ঝলমলিয়ে উঠল। তারা এখন আর উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নয়। তারা এখন সম্পূর্ণভাবে দুশ্চিন্তামুক্ত। তাদের চেহারা এমন আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠল যে, দেখলে মনে হবে তাদের মধ্যে আল্লাহর করুণার ধারা প্রবাহিত হয়ে গেছে। এখন আল্লাহর সাহায্যের সময় এসে গেল।

৩

নুয়াইম বিন মাসউদ (রাঃ) প্রিয়নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছ থেকে ফিরে এসে অনবরত চিন্তা করতে লাগলেন, এখন কী করা যায় ? কীভাবে শত্রুদের হতবল করে দেয়া যায় ? কীভাবে তাদের দুরাকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ করে দেয়া যায়। তিনি শুধু চিন্তাই করতে লাগলেন। সে চিন্তার যেন শেষ নেই। সবশেষে তাঁর বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন শত্রুদের ঐক্য বিনাশ করে দেবেন। এ ছাড়া আর কোন উপায় তিনি দেখলেন না।

নুয়াইম তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। তারপর অতি দ্রুত বনী কুরাইজাদের কাছে চলে গেলেন। প্রথম থেকেই বনী কুরাইজারা তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখত। সেখানকার ইহুদিরা তাঁকে খুব মান দিত। তাঁর কথাবার্তা তারা খুব মনোযোগের সাথে শুনত। তাঁর সঙ্গ লাভ করাটাকে তারা খুব মর্যাদার ব্যাপার বলে মনে করত। নুয়াইম (রাঃ) তাদের কাছে পৌঁছাতেই তারা খুব সম্মানের সাথে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। তারা তাঁকে মর্যাদার সাথে বসালেন। ইহুদিদের সমস্ত নেতাই তাঁর কাছে এসে জমা হল। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল নুয়াইমের বাক্যালাপ। নুয়াইম (রাঃ) কিছুক্ষণ ধরে আশকথা-পাশকথা বললেন। তারপর আসল কথায় এলেন। বললেন ঃ 'সুপ্রিয় ভাইরা আমার! তোমরা জানো যে, তোমাদের সাথে আমার সুসম্পর্ক কত দিনের। তাছাড়া তোমাদের আমি কত ভালোবাসি তা-ও তোমরা জানো।'

সবাই একসাথে বলে উঠল ঃ 'হাঁ, হাঁ। তা তো আমরা ভালোই জানি।'

নুয়াইম বললেন ঃ 'তোমরা তো মুহম্মদের সাথে চুক্তিভঙ্গ করে কুরাইশ ও গাতফানদের সাথে যোগ দিয়েছো কিন্তু এর পরিণাম কী ভেবে দেখেছো ? জিতে গেলে কোন সমস্যা থাকবে না। কিন্তু হেরে গেলে ? তখন কী অবস্থা হবে ? তারা তো নিজের নিজের পথ বেছে নেবে আর তোমরা একেবারেই নিঃসঙ্গ হয়ে

পড়বে। তখন তো মুহম্মদের সাথে একাই তোমাদের মোকাবিলা করতে হবে। সে সময় তো তোমাদের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়বে। তখন তো বনী কায়নুকা ও বনী নজীরদের মতো দুর্ভাগ্য তোমাদেরও বরণ করে নিতে হবে।'

লোকেরা উদ্বেগের সাথে সমস্বরে বললঃ 'তাহলে এখন আমরা কী করব, ভাই নুয়াইম ?'

নুয়াইম বললেন ঃ 'ভাইসব! আমার তো মনে হয় আগে তাদের কিছু লোক তোমাদের কাছে জামিনস্বরূপ রেখেই তবে তাদের সাথী হওয়া উচিত। লোকদের উচ্চবংশজাত হতে হবে। এভাবে তাদের উপর তোমাদের বিশ্বাস থাকবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মুহম্মদকে মেরে না ফেলবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ফিরে যেতে পারবে না।' লোকেরা এ যুক্তি শুনে আনন্দে উদ্বেলিতে হয়ে উঠল। তারা বল ঃ 'বাহ্ ভাই নুয়াইম! তোমার যুক্তি একেবারেই সঠিক। আমরা এখন এটাই করব।' নুয়াইম বললেন ঃ আচ্ছা, আমি এখন যাই। তবে সাবধান। একথা কখনো কাউকে বলবে না।' লোকেরা বলল ঃ 'না, না, কখনোই বলব না। তুমি পূর্ণ আস্থা রাখো। আমরা কারো সাথেই বলব না।'

নুয়াইম ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু এরা তখনো পর্যন্ত নুয়াইমের প্রশংসা করতে লাগল এবং বলতে লাগলঃ 'নুয়াইম কত সাবধানী লোক! তিনি কত চিন্তাশীল! তিনি আমাদের প্রতি কতটা খেয়াল রাখেন!'

এরপর নুয়াইম (রাঃ) আবু সুফিয়ানের কাছে গিয়ে পৌঁছালেন। সেখানে কুরাইশদের অন্য নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। নুয়াইম (রাঃ) বললেন ঃ 'ভাইসব! তোমরা তো জানো আমি তোমাদের কত ভালোবাসি! আমি একটা কথা জানতে পারলাম। তাই সে খবরটা তোমাদের পৌঁছে দেয়াটা জরুরি মনে করে তোমাদের কাছে ছুটে এলাম। যাতে তোমরা সাবধান হয়ে যাও।'

লোকেরা হতভম্ব হয়ে গেল। সমস্বরে বলল ঃ 'ভাই নুয়াইম! কী হয়েছে ? কী ব্যাপার ?'

নুয়াইম (রাঃ) বললেন ঃ 'আমি জানতে পারলাম যে, বনী কুরাইজারা মুহম্মদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। তারা মুহম্মদের কাছে মিটিয়ে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছে। তারা বলেছে, আমরা কুরাইশ ও গাতফানদের কাছ থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আপনার কাছে পাঠাব। আপনি তাদের হত্যা করবেন। তো দেখো ভাইসব! সাবধান থেকো। যে কোন বাহানায় তারা তোমাদের কাছে লোক চাইলে মনের ভুলেও যেন তা না দাও।'

একথা বলে নুয়াইম (রাঃ) বেরিয়ে পড়লেন। কুরাইশ নেতারা তাঁর অনেক প্রশংসা করলেন এবং তাঁর প্রতি অনেক শুকরিয়া জানালেন।

সেখান থেকে নুয়াইম (রাঃ) গাতফানদের কাছে গেলেন। তাদের সাথেও তিনি ঐ একই কথা বললেন।

নুয়াইমের এ কথায় কুরাইশ ও গাতফানরা খুবই হতবিহ্বল হয়ে পড়লেন। সমস্ত নেতা একত্রিত হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন ঃ 'বনী কুরাইজাদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেয়া যায় ? লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন মত দিল। সবশেষে সিদ্ধান্ত হল ঃ 'দু'গোত্রের কিছু নেতা সেখানে যাক। গিয়ে বলুক, ভাই, এখানে আমাদের অনেক দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর বেশিদিন এখানে অবস্থান করার ইচ্ছা আমাদের আর নেই। এ ব্যাপারে একটা ফায়সালা হয়ে যাওয়া উচিত। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তোমরাও আমাদের সাথে মিলে যাও। সবাই মিলে আমরা একসাথে বড় রকমের একটা আক্রমণ চালিয়ে দিই।'

কুরাইশ ও গাতফানদের একটা দল বনী কুরাইজাদের কাছে গিয়ে এসব কথা বললে তারা বলল ঃ 'আগামীকাল তো শনিবার। শনিবার আমাদের যুদ্ধবিগ্রহ করা নিষেধ। অন্য কোন দিন ঠিক করো। হ্যাঁ। আর একটা কথা আছে। আমরা তোমাদের সাথে এক হয়ে লড়তে রাজি আছি তবে আমাদের কাছে তোমাদের কিছু লোককে জামিন স্বরূপ রাখতে হবে। যাতে আমাদের বিশ্বাস জন্মায় যে, মুহম্মদের সাথে যুদ্ধে পরাজয় হলে তোমরা আমাদের ছেড়ে পালিয়ে যাবে না।'

কুরাইশ ও গাতফানদের নুয়াইমের (রাঃ) কথার প্রতি আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। তাদের পূর্ণ বিশ্বাস জন্মাল যে, বনী কুরাইজাদের উদ্দেশ্য সত্যিই খারাপ। ওদিকে এ লোকেরা জামিন হিসেবে তাদের কাছে কাউকে রাখার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন বনী কুরাইজাদেরও নুয়াইমের (রাঃ) কথার প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকল না। এর ফলে, দু'পক্ষের মধ্য বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল। ফলে, এত বিশাল লোকবল সত্ত্বেও শত্রুরা সাহস হারিয়ে ভগ্নমনোরথ হয়ে পড়ল।

৪

যতই দিন যাচ্ছিল, শত্রুদের অবস্থা ততই খারাপ হয়ে পড়ছিল। তাদের মনোবল ভেঙে পড়েছিল। দশ হাজার সৈন্যের পানাহার ঠিকমতো পৌঁছানো অত সহজ ব্যাপার ছিল না। তা ছাড়া তাদের নিজেদের মধ্যেও প্রচণ্ড বিভেদ ছড়িয়ে পড়েছিল। অতি দ্রুত সম্পর্কের অবনতি ঘটছিল। শীতের মওসুম ছিল তাই খোলা ময়দানে অবস্থান করা তাদের জন্য অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সবই আল্লাহর ইচ্ছা। ঐ সময়ে একদিন রাতে প্রচণ্ড ঝড় উঠল। সেই সাথে নামল বৃষ্টি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবহাওয়া ভয়ংকর রূপ ধারণ করল। প্রচণ্ড বৃষ্টি, ঝড়, বিদ্যুচ্চমক—একসাথে শত্রুদের তন-মন-প্রাণ যেন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে লাগল। মুহূর্মুহূ তারা তাদের তাঁবুর দিকে ছুটে যেতে লাগল, কিন্তু আবহাওয়া বড় নির্মম

আর বড়ই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। ঝড় তুফান অনবরত বেড়েই চলল। ঝড়ের সাঁ-সাঁ আওয়াজে ভয়ে তাদের প্রাণপাখি উড়ে পালিয়ে যেতে চাইছে। তাদের তাঁবুর দড়ি ছিঁড়ে কুঁড়ে একাকার হয়ে যেতে লাগল। সমস্ত জিনিসপত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। চুলা ও হাঁড়িপাতিল সব ওলটপালট হয়ে গেল। ঝড় শুধু একা আসেনি। সাথে বালি আর কাঁকর সমানে উড়ে এসে শত্রুদের চোখমুখ অন্ধকার করে দিতে লাগল। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। প্রচণ্ড ভয়ে তারা চীৎকার করে আর্তনাদ করতে লাগল– 'হায় সর্বনাশ।....হায় হায়!! সব শেষ হয়ে গেল!!'

এভাবে আবু সুফিয়ানের কণ্ঠস্বরও শোনা গেল। সে বলছে ঃ 'কুরাইশ ভাইসব! আল্লাহর কসম! এখানে আর এক মুহূর্তও থাকা ঠিক নয়। দেখো, সমস্ত উট-ঘোড়া ধ্বংস হয়ে গেছে। বনী কুরাইজারাও ধোকা দিয়েছে। আবহাওয়াও ভালো নয়। চলো, এখান থেকে পালিয়ে চলো। আমি তো চললাম।' আবু সুফিয়ান অতি দ্রুত তার উটের পিঠে চড়ে রওয়ানা দিল। স্বয়ং নেতার যখন এ অবস্থা তখন কে আর এখানে থাকতে পারে ? কুরাইশদের সমস্ত লোক রওয়ানা হয়ে গেল। তা দেখে বাধ্য হয়ে গাতফানরাও ফিরে চলল। এভাবে মদীনার এলাকা কুড়ি বাইশ দিন পর একেবারে সাফ হয়ে গেল।

শনিবার এসে গেল। এদিন শত্রুদের দ্বারা বড় রকমের একটা আক্রমণ হতে পারত। কিন্তু দেখা গেল সমস্ত এলাকা একেবারেই একটা জনহীন প্রান্তরে পরিণত হয়েছে। ভয়ঙ্কর বাতাসও তাদের পিছু ছাড়েনি।

'আর আল্লাহ ভয়ংকর ক্রোধের সাথে কাফেরদের ফিরিয়ে দিলেন। তাদের হাত কোন কাজ এলো না এবং আল্লাহ তাদের মুসলমানদের সাথে লড়াই করার কোন সুযোগ দেননি।' –কুরআন।

প্রিয়নবী এবার মদীনায় ফিরে এলেন। তিনি তাঁর সাথীদের বললেন ঃ 'কুরাইশরা তোমাদের সাথে আর কখনো লড়াই করতে আসবে না। এবার তোমরাই লড়াই করতে যাবে।'

পরদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন ঃ 'তোমরা এবার বনী কুরাইজাদের ওখানে গিয়ে আসরের নামাজ পড়ো।'

মুসলমানরা খুবই ক্লান্ত ছিলেন। কিন্তু সে ক্লান্তির কোন পারোয়া না করেই হুকুম করার সাথে সাথে সবাই এগিয়ে চললেন। তারা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। প্রচণ্ড উৎসাহে এগিয়ে চলেছিলেন তাঁরা। কেননা, তাঁরা বনী কুরাইজাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছিলেন। সেই বনী কুরাইজা যারা শত্রুদের পক্ষ নিয়ে মুসলমানদের নির্মূল করার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছিল। মুসলমানদের আসতে দেখেই তারা তাদের দুর্গের কপাট বন্ধ করে দিল।

মুসলমানরা এক মাস যাবৎ দুর্গ অবরোধ করে রাখলেন। অবশেষে তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তারা মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে পড়ল। এবার তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল। তাদের নেতা কা'ব বলল ঃ 'পথ একটাই আছে তা হল মুসলমান হয়ে গিয়ে মুহম্মদের নেতৃত্ব মেনে নেয়া। এভাবে জানমাল সবই বাঁচবে এবং সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।'

লোকেরা কঠোরভাবে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করল। বলল ঃ 'তওরাত আমরা কখনোই ছাড়তে পারব না। সবকিছু সম্ভব হলেও এটা সম্ভব হবে না।'

কা'ব বলল ঃ 'তাহলে আমরা আমাদের নারী ও শিশুদের প্রথমেই হত্যা করি। তারপর আমরা বাইরে গিয়ে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করি। যদি আমরা সবাই মরে যাই তাহলে কোন কথা নেই। আর যদি বেঁচে যাই তাহলে পুনরায় বিয়েশাদি করে বাল-বাচ্চা পয়দা করব।'

ইহুদিরা এ প্রস্তাবেও রাজি হল না। কেউ তা পছন্দ করল না। সবাই বলল ঃ 'এ বেচারিদের হত্যা করার পর বাঁচার আনন্দ আর কী থাকল ?'

আলাদা আলাদা প্রস্তাব আসতে লাগল এবং সবশেষে সিদ্ধান্ত হল– 'মুহম্মদের কাছে গিয়ে আমরা সিরিয়ার দিকে চলে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করি। বনী কায়নুকা ও বনী নজীরদের ক্ষেত্রেও তো তাই হয়েছিল।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রস্তাবে রাজি হলেন না। তিনি বললেন ঃ 'আউস গোত্র তোমাদের সহমর্মী। তাদের কাছ থেকে কিছু একটা বেছে নাও।ওরাই তোমাদের ফায়সালা করবে। তারা যা করবে আমরা তা মেনে নেবো। তোমাদেরও মানতে হবে।' দুর্ভাগ্যবশত তাদের দৃষ্টি পড়ল সাদ বিন মাআজের উপর।

সাদ (রাঃ) ফায়সালা করলেন ঃ 'যারা যুদ্ধ করার যোগ্য, তাদের হত্যা করা হোক। মহিলা ও শিশুদের বন্দী করা হোক। সহায় সম্পত্তি মুসলমানদের মধ্যে বিলি-বণ্টন করে দেয়া হোক।'

এ ফায়সালা শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'সাদ! এ ফায়সালা আল্লাহরও।'

মদীনায় বিশাল গর্ত খোঁড়া হল। অপরাধীদের সেখানে নিয়ে গিয়ে এক এক করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে সেই গর্তে ফেলে দেয়া হল। সবার আগে যাকে হত্যা করা হয়েছিল, সে ছিল সেই কুখ্যাত 'হুই'।

হযরত সাদের (রাঃ) সাধ পূর্ণ হল। তাঁর দু'চোখ শীতল হল। বনী কুরাইজাদের দুঃখজনক পরিণাম তিনি স্বচক্ষে দেখলেন। এরপর তিনি আর বেশিক্ষণ বাঁচলেন না। সেই পূর্বের আঘাতে আহত সা'দ শাহাদতের অমৃতসুধাপান করে পরম পরিতৃপ্তিতে দু'চোখ বন্ধ করলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

এবং ... মূর্তি চূর্ণ হল

১

মক্কা ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিজের মাতৃভূমি। তাঁর পূর্বপুরুষদেরও মাতৃভূমি ছিল মক্কা। মক্কার প্রতিটি ধূলিকণার প্রতি ছিল তাঁর গভীর ভালোবাসা। সেখান থেকে চলে যাওয়াটা তাঁর জন্য ছিল বড়ই মর্মপীড়াদায়ক ব্যাপার। বেদনাভারাক্রান্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠেন। কিন্তু অতি দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন সূচিত হল। সময়ের চলমান ধারায় লোকেরা দেখল তিনি সেই শহরে গিয়েই উপস্থিত হয়েছেন যেখানে তিনি স্বদেশ ও স্বজাতীয়দের দ্বারা নিপীড়িত ও অত্যাচারিত হয়েছিলেন। মজলুম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদের অত্যাচারে দেশত্যাগী হয়েছিলেন, এখন তিনি সেখানেই বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেন। এ ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। জীবনের মহৎ কর্তব্যের তাড়না। এবার তাঁর কাজ হবে সেখানকার সমস্ত মূর্তিরই মূলোৎপাটন করা। ঈমানের কেন্দ্রে আবারো ঈমানের আলো জ্বালিয়ে দেয়া। দেশত্যাগের পর মাতৃভূমিতে ফেরার আনন্দ ভুক্তভোগী ছাড়া আর কে-ইবা এমন করে উপলব্ধি করতে পারে ?

হিজরতের পরে কয়েকটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনাতেই অবস্থান করতে লাগলেন। মুসলমানদের সাথে নিজের কাজ করে যেতে লাগলেন। লোকদের ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে লাগলেন। এরই মধ্যে কুরাইশদের সাথে তাঁর কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে গেছে।

একদিন রাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্ন দেখলেন তিনি তাঁর সাথীদের নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করছেন। তিনি খুবই আনন্দের সাথে শয্যা ত্যাগ করলেন। ফযরের নামাযের সময় ছিল। তিনি মসজিদে গিয়ে সাথীদের নিয়ে নামায পড়লেন। ফযর নামাযের শেষে তিনি প্রত্যহ সাথীদের নিয়ে বসতেন এবং কিছুক্ষণ যাবৎ প্রয়োজনীয় আলাপালোচনা করতেন। আজও বসলেন এবং তাঁর সাথীদের সেই স্বপ্নের কথা শুনিয়ে বললেন ঃ 'আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা খুব সত্বরই নির্বিবাদে কাবায় প্রবেশ করবে।'

মক্কা ছিল মুহাজিরদেরও প্রিয় মাতৃভূমি। তাদের সেখান থেকে জোর করে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এ জন্য তাঁদের খুব দুঃখ ছিল। একথা তাঁরা কখনোই ভুলতে পারতেন না। হযরত বিলালকে (রাঃ) মক্কায় কী নির্মমভাবে নির্যাতন করা

হয়েছিল! কিন্তু তা সত্ত্বেও মক্কার কথা মনে এলে তিনি কেঁদে ফেলতেন। অনেক মুহাজির প্রাণভয়ে মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁদের সন্তানাদি ও বংশের লোকেরা সেখানেই রয়ে গিয়েছিল।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখনিঃসৃত এ সুখসংবাদ শোনার পরে সবার মধ্যে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। সাথে সাথে বাড়ি গিয়ে তাঁরা মক্কায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু করলেন। কাবার প্রতি তাঁদের ছিল আত্মার টান। সেখানে গিয়ে তাঁরা পশু কুরবানিরও আয়োজন করলেন।

এ ছিল হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষের জীকাদা মাসের কথা। মুসলমানরা মদীনা থেকে কাবার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। মুসলমানরা পরম আবেগে অগ্রসর হতে লাগলেন। মদীনার মুনাফিকরাও সে দলে যোগ দিল। তারা তাদের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যগত আচরণ শুরু করল। নানা রকমের টালবাহানা করতে করতে তারা বলল ঃ 'আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য তো একেবারেই শেষ। আমরা এখন সেখানে কেমন করে যাবো ?'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কথার তেমন গুরুত্ব দিলেন না। এবার তারা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার একটা সুযোগ পেল। দুর্বলচেতা মুসলমানদের কাছে গিয়ে তারা বলল ঃ 'কুরাইশ নেতারা বেঁচে থাকতে তোমরা কীভাবে সেখানে পৌঁছাবে ?

'মুসলমানরা বললেন ঃ 'প্রিয়নবী কুরাইশদের চেয়ে বেশি ক্ষমতা রাখেন।'

কপটচারীরা বলল ঃ 'তোমাদের বিচারবুদ্ধি একেবারেই লোপ পেয়ে গেছে। সেখানে একবার গিয়ে দেখো কী অবস্থা হয়।'

কপটচারীদের এ কথা মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। হযরত উমর (রাঃ) একথা শুনে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন।

তিনি (রাঃ) বললেন ঃ 'আল্লাহর রসূল! এ বদমাইশদের মুণ্ডু উড়িয়ে দেয়া হোক।' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাতে রাজি হলেন না। তাদের এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাথীদের মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার আদেশ দিলেন। মুসলমানরা অগ্রসর হলেন। এদের সংখ্যা ছিল এক হাজার চার শ'।

মুসলমানরা চলতে চলতে উসফান গিয়ে পৌঁছালেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা তাঁবু ফেললেন। সাথের জানোয়ারদের বেঁধে রেখে রান্নাবান্নার জন্য আগুন জ্বালাতেই দেখলেন দূরে প্রচণ্ড ধূলো উড়ছে। এক অশ্বারোহী অতি দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। সকলের দৃষ্টি সেদিকেই নিবদ্ধ হল। তারা মক্কা থেকে আসছিল। মক্কার খবরাখবর জানার জন্য মুসলমানরা অপেক্ষা করছিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই অশ্বারোহী মুসলমানদের কাছে এসে পৌঁছাল। সে বনী খুজাআ গোত্রের লোক। তার নাম বিশর বিন সুফিয়ান। সে প্রিয়নবীর সেবায় উপস্থিত হয়ে সবিনয়ে নিবেদন করলঃ 'কুরাইশরা আপনার আগমনের খবর জানতে পেরেছে। তারা খুবই ক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে। খালিদ বিন ওয়ালিদ বড় একটা অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে মক্কার উপকণ্ঠে লুকিয়ে রয়েছে। আপনারা সেখান পৌঁছালেই আচমকা আক্রমণ চালাবে।'

প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা পুরোপুরি বিশ্বাস করলেন। এ সংবাদে সন্দেহ থাকার কোন কারণ ছিল না। কেননা, বিশর বনী খুজাআ গোত্রের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। আর কুরাইশরা ছিল তাদের শত্রু। মুসলমানদের সাথে তাঁর সুসম্পর্কও ছিল। বিশরের কথা শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বড়ই দুঃখ হল। অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে তিনি বললেন ঃ 'বড়ই আফসোস কুরাইশদের জন্য। তারা আবারো যুদ্ধ চায়। তারা আমাদের উপরে জয়ী হলেই তবে তাদের সাধ পূর্ণ হতো। আর আমি জয়ী হলে তো তারা সবাই ইসলামে এসে যেতো। তারপর অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললেন ঃ 'আল্লাহর কসম! সাথে যা এনেছি, তাই দিয়েই তাদের সাথে যুদ্ধ করব। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা জয়ী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত।

'হে আমার সম্প্রদায়! কুরাইশরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে বেরিয়েছে। যদি আমরা পথেই অগ্রসর হই তাহলে অবশ্যই তাদের সাথে সাক্ষাৎ হবে এবং যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে। অনেক খুন-খারাবি হবে। আমরা তা চাই না। তোমরা এমন কেউ আছো, যে অন্যপথ দিয়ে নিয়ে যেতে পারবে ?'

আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি বলল ঃ 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আছি।' এ ব্যক্তিটি মরুভূমির রাস্তাঘাট সম্পর্কে খুব ভালো খবর রাখত।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তুমি আগে আগে চলো, আমরা তোমার পিছে পিছে চলছি।'

সে ব্যক্তিটি তার উটের নাকাল ধরে কুরাইশদের রাস্তা বাঁচিয়ে সম্পূর্ণ অন্য পথ দিয়ে চলল। এটি ছিল মালভূমি ও পাহাড় বেষ্টিত একটি দুর্গম পথ। এই কঠিন রাস্তা অতিক্রম করে কী মুসীবতের মধ্য দিয়ে হুদাইবিয়া[১] পৌঁছে গেল। এটি মক্কার নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। সেখানে পৌঁছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উটটি বসে পড়ল।

লোকেরা অনেক চেষ্টা করল উটটিকে ওঠানোর জন্য কিন্তু কিছুতেই সে উঠল না। অবস্থা দেখে মনে হল যে, হয় সে খুবই ক্লান্ত নতুবা ঐ মাটির সাথে সে বাঁধা পড়ে গেছে।

---

১. এটি মক্কার নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি কুঁয়া। ঐ জায়গাটিও ঐ কুঁয়ার নামে বিখ্যাত হয়ে গেছে। এটিই হুদাইবিয়া।

তিনি চাইলে অন্য কোন উটের পিঠে চড়ে মক্কায় পৌঁছাতে পারতেন। মক্কা নিকটেই ছিল। এমন কী অতটুকু রাস্তা পায়ে হেঁটেও পৌঁছে যেতে পারতেন। কিন্তু তাঁর মনে হল, এখানে উটের এভাবে বসে যাওয়ার মধ্যে কোন রহস্য আছে– যা আমি জানিনা। এরকম অবস্থায় সাধারণত তিনি কোন সিদ্ধান্ত নিতেন না; বরং আল্লাহর তরফ থেকে অহী অবতরণের জন্য অপেক্ষা করতেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়ার ময়দানে তাঁবু ফেলার জন্য নির্দেশ দিলেন। লোকেরা যথারীতি তা পালন করল। কিন্তু আনন্দে উচ্ছ্বসিত চেহারায় যেন উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। সবাই উদ্বেগাকুল হয়ে ভাবতে লাগল এর রহস্য কী ? এ ওকে জিজ্ঞেস করতে লাগল ঃ 'ভাই, এ কোথায় এসে থেমে গেলাম ? আমরা তো মক্কার দোরগোড়ায় এসে পৌঁছে গেছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কায় যাওয়ার কথা বলেছিলেন। কাবা জিয়ারতের সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন। কিন্তু এ কী হল ?'

সে সময় মুসলমানরা আশা ভঙ্গের মতো অবস্থায় পৌঁছে গেলেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাঁরা আল্লাহর করুণা হতে বঞ্চিত হননি।

২

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীদের মক্কায় আসার সংবাদ পেয়ে খোদাদ্রোহীদের বেঁহুশ হয়ে যাবার যোগাড় হল। তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কার সীমা-পরিসীমা রইল না। এমতাবস্থায় তারা খালিদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। তারা মনে করেছিল, মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীদের রুখে দেয়ার জন্য খালিদই যথেষ্ট। তাতেই তাদের জীবন রক্ষা পেয়ে যাবে। সে তাদের একমাত্র ভরসা বলে প্রতীয়মান হল। ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ থেকে খালিদই তাদের রক্ষা করবে। সে তাদের মান-সম্মান বাঁচাবে।

এমতাবস্থায় খালিদ মক্কায় ফিরে এসে বললো যে, মুহম্মদ হুদাইবিয়ায় অবস্থান করছেন। তাঁর উপরে আক্রমণের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেছে। এখন কী করা যায় ?

যে মুহম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তারা তাঁর মাতৃভূমি মক্কা থেকে বের করে দিয়েছিল, তিনিই মক্কার উপকণ্ঠে এসে হাজির হয়েছেন। তাও একা নয়। সাহাবীদের বিরাট একটা বাহিনী তাঁর সাথেই রয়েছে। তাঁরা মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য যে কোন মুহূর্তে, যে কোন অবস্থায় জীবন দিতে প্রস্তুত। খোদাদ্রোহীরা উহুদের যুদ্ধে তাদের পরাজিত করেছিল ঠিকই, তবে সে সাথে তারা স্বীকারও করে নিয়েছিল যে, মুসলমানরা লোহার মতো কঠিন। তারা স্পষ্টতই বুঝে গিয়েছিল যে, তারা জীবন দিতে প্রস্তুত কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। ধর্ম তাদের জীবনের চেয়েও প্রিয়।

কুরাইশ নেতারা পুনরায় 'দারুননাবা'য় (মন্ত্রণাগৃহ) একত্রিত হলেন। প্রত্যেকেই হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। প্রত্যেকের চেহারায় উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

মুসলমানরা যদি এখন মক্কায় প্রবেশ করেন তাহলে কুরাইশদের সমস্ত অহংবোধ ধূলায় মিশে যাবে। অন্যের দৃষ্টিতে তাদের আর কোন গুরুত্ব থাকবে না। এসব কথা ভেবে হঠাৎ তাদের অহংবোধ জেগে উঠল এবং ক্রোধ ও আবেগের বশে তারা শপথ করে বসলঃ 'আমাদের দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতেও মুহম্মদকে আমরা মক্কায় প্রবেশ করতে দেবো না।'

সবাই মাথা ঝুঁকিয়ে কপালে হাত রেখে গোল হয়ে বসে পরামর্শ করতে লাগল কী করা যায় ? মুহম্মদ মক্কার বাইরে থেকে আমাদের উদ্দেশ্যে হুমকি ছাড়ছেন। কুরাইশদের মধ্যেও অনেকেই তাঁকে নবী বলে স্বীকার করেন এবং সেখানেও তাঁর অনেক শুভানুধ্যায়ী রয়েছেন। এখন তো মুহম্মদ আমাদের জন্য বিরাট এক হুমকিস্বরূপ। মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হলে তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে তারা একসাথে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমাদের জন্য সর্বনাশের নামান্তর হবে।

একজন বলল ঃ 'মুহম্মদ বলছেন যে, তিনি যুদ্ধ করতে আসেননি। তাই যদি হয় তাহলে তাঁর সাথে আমাদের কঠোর ব্যবহার করা ঠিক হবে না। কোন রকমে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে দেয়াই ভালো হবে। আর যদি উদ্দেশ্য খারাপ হয় তাহলে তো সেই ভয়ে আমাদের পালিয়ে যাবার প্রশ্নই উঠে না। তার মোকাবিলা তো যুদ্ধক্ষেত্রেই হবে। যুদ্ধবিগ্রহ করাই তো আমাদের আসল কাজ। উহুদের মারটা নিশ্চয়ই তারা ভোলেনি।'

এক কুরাইশ নেতা উদ্বেগের সাথে বললেন ঃ 'তাহলে এখন কী করা উচিত?'

এ কথার উত্তরে ঐ ব্যক্তি বলল ঃ 'আমার প্রস্তাব যে, বনী খুজাআ গোত্রের কিছু লোককে সেখানে পাঠানো হোক। তারা গিয়ে জেনে আসুক মুহম্মদ আসলে কী চান? আর যেভাবেই হোক তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরে যাবার জন্য রাজি করাক।'

এবার ঐ কুরাইশ সরদার বললেন, 'বনী খুজাআদের পাঠিয়ে লাভ কী ? তাদের দিক থেকেও তো আমাদের বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। তারা তো মুহম্মদের শুভানুধ্যায়ী ও বন্ধু!'

ঐ ব্যক্তি বললঃ 'এ ব্যাপারে একেবারেই নিশ্চিন্ত থাকো। মক্কায় তাদের জমি-জায়গা, বউ-বাচ্চা সবই রয়েছে। তারা কীভাবে আমাদের সাথে বেঈমানী করে রেহাই পাবে ?' সে তাদের এভাবেই বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করল।

এ প্রস্তাব সকলের পছন্দ হল। প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বনী খুজাআ গোত্রের কয়েকজন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা হল। বুদাইল খুজাইকে তাদের নেতা করে পাঠানো হল। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য রওয়ানা হল।

তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গেলে তিনি তাঁদের সাদরে গ্রহণ করলেন। বুদাইল আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করল।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'মুসলমানরা কাবা জিয়ারতের জন্য এসেছেন। কাবার প্রতি তাদের হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রয়েছে। কুরাইশরা যদি আমাদের সাথে কোন রকমের ঝামেলা না পাকায় তাহলে আমরা কাবা তওয়াফ করে নীরবে চলে যাবো।'

প্রতিনিধিবর্গ মক্কায় ফিরে গিয়ে কুরাইশদের কাছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বার্তা শোনালেন। তারা সে কথা মেনে নেয়ার জন্য তাদের পরামর্শ দিলেন।

এবার খোদ কুরাইশদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হল। কেউ বলল ঃ 'মুহম্মদের সাথে এ ব্যাপারে আলাপালোচনা করা হোক এবং তওয়াফ ও জিয়ারতের জন্য রাস্তা খুলে দেওয়া হোক।' কিছু লোক এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করল।

কুরাইশদের এক সরদার বলল ঃ 'তোমরা কী চাও যে, শত্রুরা মক্কায় প্রবেশ করে তোমাদের জমীনকে ওলট্-পালট করে দিয়ে যাক আর তোমরা পরাজয়ের গ্লানি মাথায় করে বয়ে নিয়ে বেড়াও ?'

সব লোক সমস্বরে বলে উঠল ঃ 'তাহলে কী করবেন ?'

কুরাইশী সরদার বলল ঃ 'আমার প্রস্তাব যে, হুলাইস বিন আলকামাকে মুহম্মদের কাছে পাঠানো হোক। সে কবাইলিয়াদের নেতা। কবাইলিয়াদের দোর্দণ্ডপ্রতাপের কথা নিশ্চয়ই সবার জানা আছে। প্রত্যেকেই তাদের ভয় করে। তাদের প্রতাপে লোকেদের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। তার কথা মেনে নিয়ে মুহম্মদ যদি ফিরে যায় তাহলে আমাদের শান্তি ফিরে আসবে। এক বড় বিপদ থেকে আমরা রেহাই পেয়ে যাবো। কিন্তু মুহম্মদ যদি তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে তাহলে পরিণাম ভালো হবে না। তারপর তারা আমাদর সাথে যোগ দিয় মুহম্মদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।'

হুলাইস বেছে বেছে কয়েকজন সাথীকে সঙ্গে নিয়ে মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে চলল। তা দেখে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথীদের বললেন ঃ 'দেখ, সেই হুলাইস আসছে। তার সম্প্রদায়ের লোকেদের জীবন দানের বড়ই শখ হয়েছে। আমাদের সঙ্গেকার পশুগুলোকে ওদের দিকে হাঁকিয়ে দাও যাতে তারা দেখে বুঝতে পারে যে, আমরা

তাওয়াফ ও জিয়ারতের জন্য এসেছি যুদ্ধ করার জন্যে নয়।' মুসলমানরা 'লাব্বাইক' ধ্বনি উচ্চারণ করে তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁদের কুরবানীর পশুগুলোকে তাদের কাছে ডাক দিলেন। তারা দেখল যে, উটের একটা দল আসছে। তাদের গলায় লোহার নাল লাগানো আছে। বেশিদিন যাবৎ নালগুলি উটের গলার সাথে লাগানো থাকার কারণে সেগুলি তাদের গলায় বসে গিয়েছিল। জুলুম ও বে-ইনসাফীর এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে তাদের প্রাণ কেঁদে উঠল। দু'চোখ ফেটে অশ্রু ঝরতে লাগল। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে আর সাক্ষাৎও করল না। সোজা মক্কায় ফিরে গিয়ে কুরাইশদের বলল ঃ 'আল্লাহর কসম! আমরা তোমাদের সাথে এ ব্যাপারে কোন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইনি যে, যারা আল্লাহর ঘর জিয়ারত ও তাওয়াফ করতে এসেছে তাদের তোমরা রুখে দেবে আর আমরা সে কাজে তোমাদের সহযোগিতা করবো।

আরবের সমস্ত গোত্রের লোকেরা কাবায় এসে হজ্জ করবে আর আবদুল মুত্তালিবের বেটা তা থেকে বঞ্চিত হবে। বংশগত অহংকার ও ঔদ্ধত্যেরও তো একটা সীমা থাকা উচিত!

এখন যদি তোমরা মুহম্মদকে কাবায় আসতে বাধা দাও তাহলে জেনে রাখো, আমরা তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে যাবো এবং মুহম্মদের পক্ষ নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবো।'

কুরাইশ সরদারদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল। তারা ভাবল, কী চাইলাম আর কী হল। কিন্তু তারা এবার অন্য চক্রান্ত করল। তারা হুলাইসকে বোঝাবার উদ্দেশ্যে বলল ঃ 'ভাই! এটা একান্তভাবে আমাদের নিজস্ব ব্যাপার। এ ব্যাপারটা আমাদের উপরেই ছেড়ে দাও। আমরা এমন একটা সিদ্ধান্ত নেবো যে, তাতে সবারই ভালো হবে।'

হুলাইস তাদের ব্যাপারে কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিল।

কুরাইশরা কবাইলিয়াদের দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। রাতের আঁধারে মুসলমানদের শিবিরে হামলা করার জন্য কুরাইশরা পঞ্চাশ বীরকে নিয়োগ করল।

তারা রাতের অন্ধকারে হুদাইবিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করল। তারা মুসলমানদের তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছানোর পূর্বেই চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। মুসলমানরা তাদের গ্রেফতার করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে নিয়ে চললেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁবু ছেড়ে বাইরে এলেন। তাঁকে দেখেই বন্দীদের হৃৎকম্প উপস্থিত হল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

তাদের বললেন ঃ 'বল, মৃত্যুদণ্ড থেকে এখন কে তোমাদের রক্ষা করবে। তোমরাই তো প্রথম আক্রমণকারী।'

শত্রুরা বললঃ 'আমরা আপনার সহনশীলতা, করুণা, সহানুভূতি ও ক্ষমার মুখাপেক্ষী।'

মহানবী বললেন ঃ 'আমি তোমাদের ক্ষমা করলাম। এখন তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে বলো, মুহম্মদ খুন-খারাবির জন্য আসেননি। যাতে তাদের হুঁশ ফিরে আসে।'

তারা ফিরে নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষ থেকে তাদের আশ্বাস দিলেন, কিন্তু তারা তা-ও মানল না। তাদের আশা ছিল যে, এবার তাদের সম্প্রদায় তা মেনে নেবে। তা ছাড়া এত বড় অপরাধ সত্ত্বেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তাদের ক্ষমা করবেন তা ছিল তাদের কল্পনারও অতীত।

এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উসমানকে (রাঃ) পাঠালেন কুরাইশ নেতাদের সাথে আলাপালোচনা করে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত পাওয়ার জন্য।

মক্কায় হযরত উসমানের (রাঃ) এক চাচাত ভাই ছিলেন। তাঁর নাম ছিল অবান বিন সঈদ। হযরত উসমান (রাঃ) তাঁরই সহায়তায় মক্কায় কুরাইশদের সাথে সাক্ষাৎ করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বার্তা শোনালেন এবং বললেন ঃ 'এবার মাত্র দুটি পথ খোলা আছে। হয় তাওয়াফ করার সুযোগ দাও নতুবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।'

কুরাইশরা বলল ঃ 'তুমি তওয়াফ করে নাও। কেবলমাত্র আমরা তোমাকেই সুযোগ দিতে পারি এবং অন্য মুসলমানদের তওয়াফ না করেই ফিরে যেতে হবে।'

হযরত উসমানের (রাঃ) তো এ প্রস্তাবে রাজি হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তিনি বললেন, 'এ তো কিয়ামত পর্যন্তও হবে না। সমস্ত মুসলমানকে তাওয়াফ করার সুযোগ দিতে হবে।'

তারা বলল ঃ 'আচ্ছা, তোমার ইচ্ছা। আর হ্যাঁ, এটাও জেনে রাখো যে, এখন তুমি বন্দী। এখান থেকে তুমি ফিরে যেতে পারবে না।' হযরত উসমানকে (রাঃ) কুরাইশরা বন্দী করে রাখল।

মক্কায় ছড়িয়ে পড়ল যে, উসমানকে (রাঃ) হত্যা করা হয়েছে। ঝড়ের বেগে তা মুসলমানদের কানেও পৌঁছে গেল। তাঁরা ক্ষোভে ও ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'উসমানের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া ফরজ।' একথা বলেই এক বাবলা গাছের নীচে বসে পড়লেন।

সমস্ত মুসলমান জান বাজি রেখে প্রতিজ্ঞা করল। আবু সিনান আসাদি (রাঃ) অগ্রসর হলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে হাত রেখে শপথ (বাইয়াত) নিলেন। তাঁর পর পর্যায়ক্রমে সমস্ত মুসলমান শপথ নিলেন।

নাঙ্গা তলোয়ার হাতে তাঁরা বেরিয়ে এলেন। ঘোষণা হয়ে গেল যুদ্ধের জন্য সবাই প্রস্তুত হয়ে যাও।

জীবন বাজি রেখে করা এ প্রতিজ্ঞা আল্লাহর দরবারে সাদরে গৃহীত হল। পবিত্র কুরআনেও তার প্রশংসা করা হয়েছে। সেজন্য তা 'বাইয়াতে রিজওয়ান' (প্রসন্নতার প্রতিজ্ঞা) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

৩

মুসল্মমানরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে জান বাজি রেখে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এ খবর মক্কায় পৌঁছাতেই কুরাইশরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তারা বলল– এ ব্যাপারটা মিটিয়ে নেয়া উচিত। এটাই ভালো হবে। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। খোদাদ্রোহীদের মধ্যে সুহাইল বিন আমর নামে এক ব্যক্তি ছিল। সমাজের একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসেবে তার পরিচিতি ছিল। তার যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যকে সবাই শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করত। লোকেরা তাকে 'খতীবে কুরাইশ' (কুরাইশদের অভিভাবক) খেতাবে ভূষিত করেছিল। তারা মীমাংসার জন্য তাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে পাঠালেন।

সুহাইল এসে দেখল মুসলমানরা ব্যাপকভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এসব দেখে সে ঘাবড়ে গেল। সে দ্রুত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বললঃ 'উসমান জীবিত। তাকে হত্যা করা হয়নি। আমি আপনার কাছে মীমাংসার জন্য এসেছি। আপনার সাথীরা যুদ্ধ করার জন্য শপথ নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করছে আর ওদিকে কুরাইশরা শপথ নিয়েছে তারা আপনাদের মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। আমি কিছু শর্ত নিয়ে এসেছি। এটা আমাদের উভয় পক্ষের জন্যই মঙ্গলজনক হবে। আপনি যদি তা মেনে নেন তাহলে বিরাট রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধকে এড়ানো যাবে। এর ফলে, অগণিত প্রাণ বেঁচে যাবে এবং এক সফল ও পুণ্যজনক কাজের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা আপনিই প্রাপ্ত হবেন।'

মহানবী ঃ 'কী কী শর্ত ?'

সুহাইল ঃ 'এ বছর আপনি কাবা তাওয়াফ না করেই ফিরে যান। আগামী বছর আসুন এবং মাত্র তিন দিন অবস্থানের পর চলে যাবেন। তলোয়ার ছাড়া আর কোন অস্ত্র সাথে আনবেন না; এবং তা কোষেই আবদ্ধ থাকবে।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ 'আর ?'

সুহাইল ঃ 'কুরাইশদের কোন ব্যক্তি মুসলমান হয়ে মদীনায় পালিয়ে গেলে তাকে ফেরত দিতে হবে এবং কোন মুসলমান মদীনা ত্যাগ করে মক্কায় ফিরে এলে আমরা তাকে মদীনায় ফেরত পাঠাতে বাধ্য থাকব না।'

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। মঙ্গলবার্তা (অহী) অবতীর্ণ হওয়ার সময় তিনি সাধারণত এ অবস্থায় পতিত হতেন। এদিকে মুসলমানরা এ অন্যায় শর্ত আরোপের জন্য ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয় উঠছিলেন। কিন্তু তাঁরা ধৈর্য ধারণ করলেন। তারপর তিনি চোখ খুললেন এবং বললেন ঃ 'তারপর ?'

সুহাইল ঃ 'দশ বছর পর্যন্ত এ চুক্তি বলবৎ থাকবে। এতে সকলেই নিরাপদ থাকবে। কেউ কারো সঙ্গে সংঘাতে অবতীর্ণ হবে না।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ 'তারপর ?'

সুহাইল ঃ 'আরবের প্রত্যেকটি গোত্র যার যার ইচ্ছামতো পক্ষ অবলম্বন করে চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারবে। চুক্তি ভঙ্গ হবার আগেই এ বিষয়ে আপনি চিন্তা করে নিন। লোকেরা আপনার বিচক্ষণতা ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।'

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব শর্ত মেনে নিলেন। তারপর হযরত আলীকে (রাঃ) চুক্তিপত্র লেখার নির্দেশ দিলেন।

এসব শর্ত মুসলমানদের পছন্দ হল না। হযরত উমর (রাঃ) সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি উঠে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন ঃ 'আপনি আল্লাহর রসুল নন ?'

প্রিয়নবী ঃ 'হাঁ, অবশ্যই।'

উমর (রাঃ) ঃ 'আমরা মুসলমান নই ?'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ 'হাঁ। অবশ্যই আমরা মুসলমান।'

উমর (রাঃ) ঃ 'তারা পৌত্তলিক নয় ?'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ 'হাঁ। এতে সন্দেহ নেই।'

উমর (রাঃ) ঃ 'তাহলে আমাদের ধর্মের উপরে এ অন্যায় আরোপ কেন আমরা সহ্য করব? এতটা নতি স্বীকার করে কেন আমরা চুক্তিতে আবদ্ধ হব ?'

প্রিয়নবী ঃ 'উমর! আমি আল্লাহর বান্দা ও রসূল। এ তাঁরই ফায়সালা। তিনি কিছুতেই আমাদের সর্বনাশ হতে দেবেন না।'

হযরত উমরের (রাঃ) দু আঁখি অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। তিনি উঠে হযরত আবুবকরের (রাঃ) কাছে চলে গেলেন এবং তাঁর সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেনঃ 'তিনি আল্লাহর রসূল। তিনি আল্লাহর হুকুম মতোই সবকিছু করে থাকেন।'

চুক্তিপত্র লেখা শুরু হল। হযরত আলী (রাঃ) কলম হাতে নিয়ে লেখা শুরু করলেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লিখতে বললেন ঃ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম'– 'সর্বশক্তিমান , কৃপাবান আল্লাহর নামে আরম্ভ।'

সুহাইল ঃ 'আমাদের মধ্যে ঐ বাক্যটির কোন রেওয়াজ নেই। এর সাথে আমাদের কোন পরিচয়ও নেই। 'বিসমিকাল্লাহুমা' (হে আল্লাহ তোমার নামে) লেখা হোক।'

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা মেনে নিয়ে হযরত আলীকে (রাঃ) তাই লিখতে বললেন।

তারপর তিনি আলীকে বললেন ঃ 'লেখো, আল্লাহর রসূল মুহম্মদ সুহাইল বিন আমরের সাথে এ চুক্তি সম্পাদন করছেন।'

সুহাইল আলীকে (রাঃ) তা লিখতে বাধা দিয়ে বলল ঃ 'এটা করবেন না। কুরাইশরা যদি তাঁকে রসূল বলে স্বীকার করত তাহলে তো কোন ঝগড়াই থাকত না। আপনি শুধু তাঁর আর তাঁর পিতার নামটাই লিখুন।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! তুমি স্বীকার না করলেও আমি আল্লাহর রসূল।' তারপর হযরত আলীকে (রাঃ) বললেন ঃ 'লেখো, আবদুল্লাহর পুত্র মুহম্মদ সুহাইল বিন আমরের সাথে এ চুক্তি সম্পাদন করছেন।' তারপর চুক্তির[১] শর্তগুলি লেখা হল এবং দু'পক্ষের কিছু লোক তাতে স্বাক্ষর করলেন।

যে সময় চুক্তিনামা লেখা হচ্ছিল তখন হঠাৎ একটি ঘটনা ঘটে যায়। এক ব্যক্তি আর্তনাদ করে এসে মুসলমানদের মধ্যে এসে পড়ে গেল। তার হাতে ছিল হাতকড়া আর পায়ে ছিল বেড়ি। তার সমস্ত চেহারায় নির্যাতনের চিহ্ন। আঘাতে আঘাতে সে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। এ নির্যাতিত ব্যক্তিটি ছিল কুরাইশদের লোক। তিনি ছিলেন সুহাইল বিন আমরের পুত্র আবু জিন্দাল। মক্কায় বাস করা তাঁর জন্য অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। কেবলমাত্র এ কারণেই যে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আল্লাহর বান্দা হয়ে গিয়েছিলেন। না জানি কুরাইশদের অত্যাচার থেকে চিরতরে রেহাই পাওয়ার জন্য কত কষ্ট করে তিনি এখানে এসে পৌঁছেছিলেন।

আবু জিন্দালকে দেখে সুহাইল ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। সে মহানবীকে (রাঃ) বলল ঃ 'এ আমার পুত্র। আমি তার অভিভাবক। তাকে এখানে প্রশ্রয় দিলে চুক্তির খেলাপ হবে।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ 'এখনো তো চুক্তি সম্পাদিত হয়নি।'

সুহাইল ঃ 'তাহলে চুক্তিও মানব না।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ 'আচ্ছা, তাকে এখানেই ছেড়ে দাও।'

---

১. *এ চুক্তি হুদাইবিয়ায় সম্পাদিত হয়েছিল বলে তা 'সুলহে হুদাইবিয়া' বা হুদাইবিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত।*

সুহাইল ঃ 'তা কখনোই হতে পারে না।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বার বার অনুরোধ করলেন। তা সত্ত্বেও সে তাতে রাজি হল না। সে জিদ ধরে রইল। কিছুক্ষণ যাবৎ মাথা ঝুঁকিয়ে চিন্তিত চিত্তে বসে রইলেন। তারপর তিনি আবু জিন্দালকে (রাঃ) ফিরে যেতে বললেন এবং দরদ ভরা কণ্ঠে বললেন ঃ 'আবু জিন্দাল! একটু ধৈর্য ধরো। আল্লাহ তোমার এবং অন্যান্য নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য একটা শান্তিপূর্ণ পথ বের করে দেবেন। আমরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারি না।'

সুহাইল তাঁর ঘাড় ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। আবু জিন্দাল (রাঃ) মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আর্তচীৎকার করতে লাগলেন। অত্যন্ত বেদনাহত কণ্ঠে বলতে লাগলেন ঃ 'মুসলমান ভাইসব! তোমরা আমাকে নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য ইসলামত্যাগী অবস্থায় দেখতে চাও ? তোমরা কেন আমাকে কাফেরদের হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছ ?'

মুসলমানরা এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে অস্থির হয়ে উঠলেন। হযরত উমর (রাঃ) এ দৃশ্য দেখে থাকতে না পেরে অস্ত্র হাতে নিয়ে আবু জিন্দালকে (রাঃ) রক্ষার জন্য অগ্রসর হয়ে তার হাতে অস্ত্র তুলে দিতে চাইলেন যার সাহায্যে ঐ দশা থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু আবু জিন্দালের সাহস হল না। তাকে জোর করে মক্কায় ধরে নিয়ে যাওয়া হল। এদিকে মুসলমানরা ক্ষোভে ও ক্রোধে ফুঁসতে লাগলেন।

৪

হুদাইবিয়ায় পৌত্তলিকদের সাথে সন্ধি করার পর মুসলমানরা মদীনায় ফিরে এলেন। কিন্তু এ অন্যায় ও অসম্মানজনক সন্ধির কথা মনে করে মুসলমানরা মানসিকভাবে খুবই অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিলেন। এদিকে আবু জিন্দালের দুঃখজনক ঘটনাটিও তাঁদের মনের মধ্যে বারবার ভেসে উঠছিল। সেজন্য তাঁদের অন্তরের শান্তি ও চোখের ঘুমও হারাম হয়ে যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় কুরাইশদের অন্য এক ব্যক্তি মক্কা থেকে পালিয়ে এসে মুসলমান হওয়ার কথা ঘোষণা করল এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে আশ্রয় চাইল। ইনি ছিলেন হযরত আবু বসীর (রাঃ)। তিনি ছিলেন খুবই সত্যবাদী ও পুণ্যাত্মা মুসলমান। তিনি খোদাদ্রোহীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য মদীনায় পালিয়ে এসেছিলেন। তার পিছু নিয়ে মক্কা থেকে দু ব্যক্তিও মদীনায় এসে পৌঁছাল। এ দু ব্যক্তি তাকে ফেরত দেওয়ার জন্য দাবি জানাল।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই বিপন্ন বোধ করছিলেন। তিনি হৃদয়ে পাষাণ চাপিয়ে ব্যথাহত হৃদয়ে বেচারা আবু বসীরকে (রাঃ) তাদের হাতে তুলে দিলেন। তারা দুজনে মুসলমানদের সামনেই তাকে বন্দী করে নিয়ে মক্কার

পথে রওয়ানা হল। মুসলমানরা অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। অনেক কষ্টে তাঁরা ধৈর্য ধারণ করলেন।

এ দু ব্যক্তি আবু বসীরকে (রাঃ) নিয়ে জুলহুজাইফা নামক স্থানে পৌঁছাতেই আবু বসীর (রাঃ) এদের একজনকে হত্যা করে আর একজনকে মারাত্মকভাবে আহত করে পালিয়ে মদীনায় মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সেবায় উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন ঃ 'হুজুর! আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এখন আমার প্রতি আপনার আর কোন দায়িত্ব নেই।' এ কথা বলেই তিনি মদীনা ত্যাগ করে মরুভূমির পথে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সমুদ্রতটবর্তী এলাকায় গিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। কুরাইশদের কোন কাফেলা ঐ পথ অতিক্রম করলেই তিনি তাদের উপর হামলা চালিয়ে হাতে যা পেতেন তাই নিয়ে পালিয়ে যেতেন। মক্কায় বহু মুসলমান রয়ে গিয়েছিলেন। কুরাইশরা তাদের উপর অনবরত নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিল। সন্ধির কারণে তাঁরা মক্কায় চলে যেতে পারছিলেন না। পরে যখন তারা নতুন একটা স্থানের ঠিকানা জানতে পারলেন তখন তাঁরা পালিয়ে পালিয়ে সেখানে এসে আশ্রয় নিতে লাগলেন। এবার একটা শক্তিশালী দল তৈরি হয়ে গেল। কুরাইশদের জন্য তাঁরা বড়ই মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁরা তাদের সমস্ত সহায়-সম্পদ লুট করে পাহাড়ি উপত্যকায় পালিয়ে যেতে লাগলেন।

অনেক চেষ্টা করেও কুরাইশরা তাদের কাবু করতে পারল না। তারা ভীষণ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তারা নিরুপায় হয়ে আল্লাহর রসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে বলে পাঠালঃ 'আমরা সন্ধির শর্ত শিথিল করতে চাই। সমুদ্রতটবর্তী স্থানে যত মুসলমান আছে তাদের আপনার কাছে ডেকে নিন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমস্ত মুসলমানকে মদীনায় ডেকে নিলেন।

মুসলমানরা অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে, সন্ধিতে যেসব অন্যায় শর্ত কুরাইশরা আরোপ করেছিল, তারাই সেই শর্তগুলি প্রত্যাহার করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। মুসলমানরা কুরাইশদের এ নৈতিক পরাজয় দেখে মনে মনে খুবই আনন্দিত হলেন। অথচ তারা এ সন্ধির শর্তগুলোর বিরোধী ছিলেন। তারা বুঝতে পারলেন যে, আপাতদৃষ্টিতে হুদাইবিয়ার সন্ধি মুসলমানদের জন্য পরাজয় মনে হলেও এর গভীরে ছিল মুসলমানদের বিজয়ের ইঙ্গিত। হুদাইবিয়ার সন্ধির সুফল তারা এবার স্বচক্ষে দর্শন করে মনে মনে খুবই প্রীত হলেন।

পরের বছরে মুসলমানরা মক্কায় গেলেন। সেখানে তিনদিন অবস্থান করে তাওয়াফ ও জিয়ারতের কাজ সম্পন্ন করে মদীনায় ফিরে এলেন। কুরাইশরা যথারীতি তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করল। ফলে, মুসলমানদের সাথে তাদের এবার আর কোন দ্বন্দ্ব হল না।

হিজরতের অষ্টম বর্ষ শুরু হল। এ বছর বহু সংখ্যক অমুসলমান ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে আশ্রয় নিল। কুরাইশদের দলে ব্যাপক ভাঙন সৃষ্টি হল। এমন কী সে দল ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ইসলামের ছায়াতলে এসে আশ্রয় নিতে লাগল। খালিদ বিন অলীদ (রাঃ) ও আমর বিন আসের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণও এ যুগের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

হযরত খালিদ (রাঃ) কুরাইশ বাহিনীর সবচেয়ে বড় সেনাপতি ও হযরত আমর বিন আস (রাঃ) 'আরবের মস্তিষ্ক' বলে সুপরিচিত ছিলেন। এরা এবার আরো অগ্রসর হয়ে ইসলামী বাহিনীর দু দিকপাল সেনাপতির মর্যাদা লাভ করলেন। এদের একজন সিরিয়া বিজয়ী ও অন্যজন মিশর-বিজয়ী সেনানায়করূপে ইতিহাসে অমর হয়ে রইলেন।

খুজাআ ও বকর নামে আরবে দুটি বিখ্যাত গোত্র ছিল। বহু কাল ধরে তাদের মধ্যে শত্রুতা চলে আসছিল। ইসলামের উত্থান যখন তাদের কাছে বিপজ্জনক বলে প্রতীয়মান হল তখন তারা শত্রুতা ভুলে গিয়ে পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলল এবং ইসলামকে সমূলে বিনাশ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর বকর-গোত্র চিন্তা করল ইসলামের বিপদ অচিরেই কেটে যাবে। তাই শত্রদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। তারা খুজাআদের উপর আক্রমণ চালিয়ে দিল। হুদাইবিয়ার সন্ধির কারণে কিছু লোক মক্কাবাসীদের ও কিছু লোক মদীনাবাসীদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। মুসলমানদের প্রতি খুজাআদের সহানুভূতি ছিল। তাঁরা মুসলমানদের এবং তাদের শত্রু বকররা কুরাইশদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। কুরাইশদের দলভুক্ত কিছু গোত্র মুসলমানদের উপরে হামলা চালিয়ে হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেছিল। আর বকররা খুজাআদের উপর হামলা করেছিল। এসব ঘটনা সন্ধির শর্তাবলী ভঙ্গের নামান্তর। তা শুধু এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না। কুরাইশরাও বকরদের সহযোগিতা করল। তাদের বীর পুরুষেরা ছদ্মবেশ ধারণ করে বকরদের উপর অস্ত্র চালাল। খুজাআ'রা বাধ্য হয়ে কাবাগৃহে গিয়ে আশ্রয় নিল। অত্যাচারীরা কাবাগৃহেরও অবমাননা করল। তারা সেখানে প্রবেশ করে খুজাআদের রক্তে কাবাগৃহকে রঞ্জিত করল। কিছু লোক পালিয়ে মদীনায় গিয়ে মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে অভিযোগ করল। খুজাআদের রক্তরঞ্জিত হৃদয়বিদারক কাহিনী শুনে তিনি বড়ই দুঃখ পেলেন। সন্ধির শর্তানুসারে তাদের সহযোগিতা করতে তিনি অপারগ ছিলেন। তিনি অনতিবিলম্বেই মক্কায় লোক পাঠিয়ে কুরাইশদের উপর তিনিটি শর্ত আরোপ করে বললেন, এ তিনটি শর্তের মধ্যে যে কোন একটা শর্ত মঞ্জুর করো ঃ

১। খুজাআদের যে কয় ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে তাদের প্রাণমূল্য আদায় করো।

২। বকরদের থেকে পৃথক হয়ে যাও।

৩। ঘোষণা করে দাও যে, হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করা হয়েছে।

কুরাইশদের এক নেতা সবার পক্ষ থেকে ঘোষণা করলেন, 'তৃতীয় শর্ত মঞ্জুর। এখন থেকে আর কোন সন্ধি রইল না।' ঘোষণা যা করার তা তো করেই ছিল, কিন্তু মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর লোক চলে যাওয়ার পরে তারা দুশ্চিন্তায় পতিত হল। ফলে, বিলম্ব না করেই আবু সুফিয়ানকে প্রতিনিধি করে মদীনায় পাঠানো হল যাতে চুক্তি নবায়ন করার জন্য মুহম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার রাজি করানো যায়।

আবু সুফিয়ানের এক কন্যার নাম ছিল উম্মে হাবীবা (রাঃ)। ইনি প্রিয়নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরম শুভাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন এবং তিনি তখন মদীনায় থাকতেন। আবু সুফিয়ান প্রথমেই তাঁর কাছে গেলেন যাতে কন্যার তার পিতার চেহারা দেখে পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি জন্মায়। কিন্তু যার হৃদয় ইসলামের আলোয় আলোকিত সে হৃদয়ে পৌত্তলিকের প্রতি ঘৃণা জন্মানো স্বাভাবিক। তাই কন্যা পিতার প্রতি কোন রকমেই মনোযোগিনী ও সহানুভূতিসম্পন্না হতে পারলেন না। আবু সুফিয়ান নিরাশ হল। সে বুঝতে পরল যে, তার মুসলমান কন্যা পৌত্তলিক পিতাকে কোন সহযোগিতা করতে পারে না। সে এবার মহানবীর (সঃ) কাছে পৌঁছে কুরাইশদের বার্তা শোনাল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুই বললেন না। এবার সে আবুবকরের (রাঃ) কাছে গিয়ে সবকিছু বলতে চাইল, কিন্তু তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং খুবই অসন্তুষ্ট হলেন।

সেখান থেকে নিরাশ হয়ে সে এবার হযরত উমরের কাছে গিয়ে হাজির হল। কিন্তু সেখানে গিয়ে সে সবচেয়ে বেশি নিরাশ হল। উমর (রাঃ) তার একটি কথাও শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না।

সে এবার হযরত ফাতিমার (রাঃ) কাছে গিয়ে পৌঁছাল। হযরত হাসান (রাঃ) তখন ছিলেন শিশু। ফাতিমা (রাঃ) কোলে বসিয়ে তাঁকে আদর করছিলেন আর তাঁর মুখে চুমু খাচ্ছিলেন। আবু সুফিয়ান বলল ঃ 'এ বাচ্চাকে শুধু এতটুকুই বলে দাও 'আমি দু'পক্ষের মধ্যে মীমাংসা করতে এসেছি। সে যদি এতটুকুই বলে দেয় তাহলে সারা আরব দেশ তাকে নেতৃত্বে বরণ করে নেবে। বলো, এতটুকু করতে পারবে ?'

হযরত ফাতিমা (রাঃ) বললেন ঃ আবু সুফিয়ান! এই এতটুকু বাচ্চা তোমার জন্য কী করতে পারে তা তোমার জানা আছে ? একমাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া কে তোমাকে আশ্রয় দিতে পারে ?'

এখানে কোন সুবিধা না হওয়ায় সে এবার হযরত আলির (রাঃ) কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে সহযোগিতা চাইল। তিনি বললেন ঃ 'মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এ ব্যাপারে আমি কী করতে পারি ? শুধুমাত্র একটাই পথ আছে তুমি মসজিদে গিয়ে ঘোষণা করে দাও , 'আমি হুদাইবিয়ার সন্ধি বহাল করছি।' এ কথা বলেই সে মক্কায় ফিরে গেল। মক্কায় পৌঁছানোর পর লোকেদের মনপূতঃ তো হলই না; বরং উল্টো সবাই তাকে যাচ্ছেতাই করে গালাগালি করল। লোকেরা বলল ঃ 'এ তো কিছুই হল না। হযরত আলি (রাঃ) তো তোমার সাথে তামাশা করেছেন– তুমি এতটুকু বোঝার মতো জ্ঞানগম্মিও রাখো না ? এভাবে কেউ সন্ধি চুক্তি বহালের কথা স্বীকার করে ?'

এবার কুরাইশ দলপতিরা আবার পরামর্শ-সভায় মিলিত হল এবং সিদ্ধান্ত নিল যে, খুজাআদের সাথে মীমাংসা করা হোক। তাদের যে দুব্যক্তি নিহত হয়েছে, তাদের প্রাণমূল্য দিয়ে দেয়া হোক যাতে মুহম্মদ মক্কা আক্রমণ করলে তারা তাঁকে সহযোগিতা না করে।

সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গেল। বুদাইল মক্কাতেই থাকতেন। তিনি খুজাআ গোত্রের একজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। আবু সুফিয়ান তাঁর সাথে কথা পাকা করে নিলেন। যারা নিহত হয়েছিল তাদের প্রাণমূল্য পাঠিয়ে দেয়া হল। সাথে খুজাআদের কাছে দুটি লোক পাঠানো হল যাতে চুক্তি মোতাবেক সবকথা ঠিকঠাক থাকে।

৫

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার আদেশ দিয়ে ইসলামী গোত্রগুলোর প্রতি যুদ্ধে প্রস্তুতির জন্য বলে পাঠালেন, 'আল্লাহ ও পরকালের প্রতি যারা ঈমান রাখে তারা যেন রমজান মাসের প্রথম দিনেই মদীনায় চলে আসে।'

মুসলমানরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দলে দলে মদীনায় উপস্থিত হতে লাগলেন। হিজরি অষ্টম বর্ষের রমজান মাসের দশ তারিখে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশ হাজার বীর মুসলমানের এক বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে তাঁর চাচা আব্বাসের (রাঃ) সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সপরিবারে মক্কা থেকে মদীনায় চলে আসছিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে দেখেই স্বাগত জানালেন। বড়ই মর্যাদার সাথে তাঁকে গ্রহণ করলেন, তাঁর বাচ্চাদের আদর যত্ন করলেন এবং সসম্মানে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন।

ইসলামী বাহিনী খুজাআদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে এসে পৌঁছাল। সেখানে পৌঁছে বড় একটা ময়দানে এসে তাঁবু ফেললেন। রাত্রি নেমে আসতেই সর্বত্রই অন্ধকার

ঘনিয়ে এলো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিটি গোত্রকেই আলাদা আলাদা ভাবে আগুন জ্বালিয়ে রাখার নির্দেশ দিলেন যাতে শত্রুরা তাদের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। লোকেরা তাইই করলেন।

রাত্রে পাহারাদারদের মধ্যে হযরত আব্বাসও (রাঃ) ছিলেন। তাঁরা এক উঁচু পাহাড়ি টিলার উপরে দাঁড়িয়ে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পাহারা দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় অতি নিকটবর্তী স্থানে তাঁরা দুজন ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। তাদের কথাবর্তাও তাঁদের কানে আসতে লাগল।

প্রথম ব্যক্তি ঃ 'বুদাইল! দেখছো। এরকম আগুন আমি তো আর কখনো দেখিনি!'

দ্বিতীয় ব্যক্তি ঃ 'আবু সুফিয়ান! আল্লাহর কসম! এ খুজাআদের আগুন। আমার মনে হচ্ছে এ তাদের যুদ্ধের প্রস্তুতি।'

আবু সুফিয়ান ঃ 'কিয়ামত পর্যন্ত খুজাআদের দ্বারা তা সম্ভব হবে না। এ আগুন বন পুড়িয়ে খাক করে দিতে পারে, সাগর শুকিয়ে মরুভূমি করে দিতে পারে।'

হযরত আব্বাস (রাঃ) আর থাকতে পারলেন না। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন ঃ 'আবু সুফিয়ান! আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আব্বাস বলছি। এ হল আবদুল্লাহর পুত্র মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগুন।'

আবু সুফিয়ান চমকে উঠল। ভীত-বিহ্বল কণ্ঠে বলল ঃ 'মক্কা থেকে এত পথ একলা কী করে এসেছো ?'

আব্বাস ঃ 'আল্লাহ আমাকে সুমতি দান করেছেন। এখন আমি ইসলামী বাহিনীর সৈনিক।'

দু'জন কাছে এসে হযরত আব্বাস (রাঃ) কে বলল, 'খুজাআদের সাথে কুরাইশদের শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এখন তুমি মুহম্মদের কাছে গিয়ে কুরাইশদের জন্য একটু সুপারিশ করে দাও।'

আব্বাস (রাঃ) ঃ 'আগে তোমরা দু'জন ইসলাম গ্রহণ করো।'

বুদাইল ঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই; মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল।'

বুদাইল ঐ সময়েই ইসলাম গ্রহণ করল কিন্তু সে ভয়ে ভীষণ কাঁপতে লাগল। হযরত আব্বাস (রাঃ) তাকে বারবার কলেমা পড়িয়ে অভয় দিতে লাগলেন। তারপর আল্লাহ তাকে সাহস দিলেন। এবার তার হৃদয় প্রসারিত হল। এবার সে সমস্ত জড়তা ও দ্বিধা-সঙ্কোচ কাটিয়ে উচ্চেস্বরে বলতে লাগল ঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, হযরত মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রেরিত নবী ও রসূল।'

হযরত আব্বাস (রাঃ) তাদের দুজনকে নিয়ে মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেবায় উপস্থিত হয়ে তাদের কথা শোনালেন। একথা শুনে তিনি খুবই আনন্দিত হলেন এবং দু'জনকে শুভেচ্ছা জানালেন।

মক্কা মুসলমানদের সামনেই দেখা যাচ্ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৈন্যদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দিলেন। প্রত্যেকটি দলেরই একজন করে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। তিনি সবাইকে ভিন্ন ভিন্ন পথে শহরে প্রবেশ করতে বললেন এবং শত্রুদের আক্রমণের পূর্বে কাউকে আক্রমণ করতে নিষেধ করলেন।

মহানবী দেখলেন আবু সুফিয়ান অত্যন্ত চিন্তিত চিত্তে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন ঃ 'কী ব্যাপার আবু হানজালা (আবু সুফিয়ান)! তুমি আমাদের সাথে পরামর্শে শরীক হবে না ?'

আবু সুফিয়ান (রাঃ) ঃ 'আল্লাহর রসূল! কুরাইশরা এখন আপনার অনুকম্পা প্রার্থী। আপনার সৈন্যদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা প্রতিশোধ স্পৃহায় আগুনের মতো জ্বলছে। আপনার কাছে আমার অনুরোধ বিজয়ের শেষে শত্রুদেরকে অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করবেন না।'

প্রিয়নবী ঃ 'না, না, আবু সুফিয়ান! এ ব্যাপারে তুমি পূর্ণ আস্থা রাখো। মক্কায় তো মুসলমানদেরও আত্মীয়-স্বজন আছে। মুহাজিরদের বাপ-চাচারা আছে। সেখানেই রয়েছে পবিত্র ও সম্মানিত গৃহ (কাবা) যা ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) এর ঘর।

আবু সুফিয়ান! তুমি তোমার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যাও। গিয়ে বলো ঃ মুহম্মদ মক্কায় তোমাদের এক ভাইয়ের মতোই এসে উপস্থিত হবেন। আজ কেউ বিজয়ী নয়; কেউ পরাজিতও নয়; কেউ বিজয়ী নয়, কেউ বিজিতও নয়। আজ প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের দিন। আজ সুখ, শান্তি ও আনন্দের দিন। আবু সুফিয়ানের গৃহে যে আশ্রয় নেবে, সে নিরাপদ, যে নিজের ঘরে আশ্রয় নেবে, সে নিরাপদ, যে কাবাগৃহে আশ্রয় নেবে সেও নিরাপদ। সবাইকে নিরাপত্তা দেয়া হল।

আবু সুফিয়ান এ গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ আশ্বাসবাণী শুনে ভাববিহ্বল হয়ে পড়লেন। তিনি অতি দ্রুত মক্কায় পৌঁছে এ সুসংবাদ মক্কাবাসীদের শোনালেন। এ সুসংবাদ সমগ্র শহরে মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। মুহম্মদের আগমনভয়ে ভীতিবিহ্বলচিত্ত শান্তির পরম আশ্বাসে নিরুদ্বিগ্ন ও শান্ত হয়ে উঠল।

পৌত্তলিকরা অস্ত্র সমর্পণ করল। যার সেই গৃহমধ্যে আশ্রয় নিয়ে কেউ বা ছাদ থেকে, কেউ বা জানালা থেকে গভীর আগ্রহ ভরে মুসলমানদের আগমনের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে লাগল। ইসলামী বাহিনী ইসলামের কেন্দ্রভূমিতে সুশৃঙ্খলভাবে প্রবেশ করতে লাগলেন।

মুসলমানরা অত্যন্ত সতর্কভাবে পরম প্রশান্তি ও বিশ্বাসের সাথে শহরে প্রবেশ করলেন। অস্ত্রও চলল না, রক্তও প্রবাহিত হল না।

যখন পরিপূর্ণভাবে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হল তখন মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবা গৃহে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এটা সেই কাবাগৃহ যা আল্লাহর বন্ধু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নির্মাণ করেছিলেন। এটা সেই কাবাগৃহ যা অতীতের নবী-রসূলদেরও মূর্তিশূন্য উপাসনাগার ছিল। সেই কাবাগৃহে তখন তিন'শ ষাটটি মূর্তি অবস্থান করছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবাগৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর হাতে একটি হাতুড়ি। তিনি প্রত্যেকটি মূর্তিকে আঘাত দিয়ে দিয়ে ভাঙতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ 'সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত। নিঃসন্দেহে মিথ্যা অপসৃত হওয়ার যোগ্য।'

তারপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাবাগৃহের চাবি চেয়ে নিয়ে দরজা খোলার নির্দেশ দিলেন। ভিতরে প্রবেশ করে দেখলেন, যে নবী ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) এই কাবাগৃহ নির্মাণ করেছিলেন এবং যাঁরা আজীবন মূর্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গিয়েছেন তার মধ্যে তাঁদেরও ছবি। তিনি সে ছবিও উৎপাটন করার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন ঃ 'আল্লাহ সেই অত্যাচারীদের নির্মূল করুন যারা খোদ আল্লাহর পয়গাম্বরদের মূর্তি স্থাপন করেছে।' হযরত উমর (রাঃ) কাবা গৃহে প্রবেশ করলেন। সেখানে যত ছবি ছিল সব ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। আল্লাহর ঘর প্রতিমামুক্ত হয়ে পাকপবিত্র হয়ে গেল। হযরত বিলাল (রাঃ) ও হযরত তালহাও (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে সেখানে তিনি নামায পড়লেন এবং কয়েকবার তকবীর দিলেন।

কাবা শরীফের সামনে মক্কাবাসীদের ভীড় জমে গিয়েছিল। লোকেরা তাদের পরিণাম সম্পর্কে জানার জন্য উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করছিল। সে সময় তাঁর কণ্ঠ দিয়ে নিসৃত হল এই চিরস্মরণীয় বাণী ঃ 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন অংশী নেই। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং তাদের উপর করুণা বর্ষণ করেছেন। আর শুনে রাখো, সমস্ত গর্ব ও অহঙ্কারের বস্তু, হত্যার প্রতিশোধ আর সম্পদের ক্ষতিপূরণ এ পর্যন্ত সবই আমার অধীন। তবে, কাবা শরীফের দেখা-শোনা ও হাজীদের পানি পান করানোর ব্যাপারটা এর অধীন নয়।

কুরাইশ লোকসকল! এখন অজ্ঞতাজনিত আচরণ আর বংশগত শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান আল্লাহ নির্মূল করে দিয়েছেন। সমগ্র মানবকুল আদমের বংশধর আর আদম মাটি থেকে সৃষ্ট হয়েছে।

তারপর তিনি পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

'লোকসকল! এক নারী ও এক পুরুষ হতে তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তোমাদের বিভিন্ন গোত্র ও বংশে বিভক্ত করা হয়েছে যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পারো। আল্লাহর কাছে সম্মানিত সে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে পরহেজগার, আল্লাহ্ তোমাদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি খবর রাখেন এবং তিনি সবচেয়ে বেশি অবগত।'

তারপর তিনি ঘোষণা করলেন ঃ 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল মদ কেনাবেচা নিষিদ্ধ ঘোষণা করছেন।'

তারপর দয়ার নবী মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দিকে ইঙ্গিত করে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন ঃ 'কুরাইশ লোকসকল! তোমরা আমার কাছ থেকে কী ব্যবহার আশা করতে পারো ?'

সবাই একসাথে বলে উঠলঃ 'সবচেয়ে সেরা ব্যবহার। আপনি আমাদের শ্রেষ্ঠ ভাই এবং শ্রেষ্ঠ সন্তান।'

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'আজ তোমাদের প্রতি আমার আর কোন অভিযোগ নেই। যাও, তোমরা সবাই মুক্ত।'

যাদের উদ্দেশ্যে মহানবী একথা বললেন, তারা কারা ? হ্যাঁ, এরা তারাই যারা করুণার প্রতিমূর্তি মহানবীর সাথে শত্রুতা করেছিল। এরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর প্রচারিত ধর্মকে দুনিয়া থেকে নির্মূল করার জন্য সর্বক্ষণ চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। এদের মধ্যে তারাও ছিল যারা মহানবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হত্যার জন্য উদ্যত হয়েছিল। যারা তাঁর চলার পথে বিষাক্ত কাঁটা বিছিয়ে দিত, তারাও ছিল। যারা নির্মমভাবে পাথর বর্ষণ করে তাঁকে রক্তাক্ত করেছিল, তারাও ছিল। যাঁরা তাঁর প্রিয় সাথীদের উপর নির্মম অত্যাচার করে মরুভূমির বালুতে শুইয়ে অত্যাচার করেছিল, লোহা গরম করে তাঁর সাথীদের পিঠে দাগিয়ে দিয়েছিল তারাও ছিল। এক কথায় কোনওঅত্যাচারীই এর বাইরে ছিল না।

তাঁর সে ক্ষমা ও করুণার কথা ইতিহাস কোনদিন ভুলতে পারবে না। ক্ষমা ও দয়ার প্রতিমূর্তি মহানবীর প্রতি নিবেদিত এ কবিতার মর্মবাণী তাই যথার্থ ঃ

'আল্লাহর নবী! সাগরের সম তোমার করুণা মায়া।
নাইকো কোথাও তুলনা তার নাইকো তাহার ছায়া।।'

চতুর্দশ অধ্যায়

জীবনের অন্তিম দিনগুলি

— প্রিয়নবীর (সাঃ) বিদায় হজ্ব

— আরাফাতের ঐতিহাসিক ভাষণ

— সত্যধর্মের পূর্ণতালাভ

— আল্লাহর রসূলের অসুস্থতা

— রোগ বৃদ্ধি

— অত্যন্ত নাজুক অবস্থা

— মানবতার মহাদূতের (সাঃ) অন্তিম ভাষণ

— প্রিয়নবীর (সাঃ) অন্তিম বাক্য

— পবিত্রাত্মা আল্লাহ্‌র সন্নিধানে মিলিত হলেন

— নিবেদিত প্রাণদের বুকভাঙা কান্না

— হযরত আবুবকরের হৃদয়স্পর্শী ভাষণ

— খলীফা নির্বাচন

— প্রিয়নবীর অন্তিম দর্শন

— কাফন-দাফন।

চতুর্দশ অধ্যায়

জীবনের অন্তিম দিনগুলি

১

হিজরতের দশম বর্ষে মহানবী (সাঃ) লক্ষাধিক বীর মুজাহিদকে সাথে নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় রওয়ানা হলেন। এই হজ্জ বিশ্ব ইতিহাসে 'হিজ্জাতুল বিদা'-আখিরী হজ্জ বা শেষ হজ্জ রূপে অমর হয়ে আছে। কারণ, এই হজ্জ ছিল তাঁর জীবনের শেষ হজ্জ। এরপরে মক্কা, কাবা ও আরাফাতের জিয়ারত তিনি আর করতে পারেন নি।

কেউ কেউ এ হজ্জকে 'হাজ্জাতুল বালাগ' নামে অভিহিত করে থাকেন। কারণ, সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ থেকে যে পয়গাম বিশ্বমানবের দরবারে পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনি আদিষ্ট হয়েছিলেন এখানেই তা পূর্ণতা লাভ করেছিল।

এ পয়গাম ছিল, ইসলামের– পৃথিবীতে যা ইসলাম ধর্ম নামে পরিচিত।

হজ্বের সময় মহানবী (সাঃ) মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এক যুগান্তকারী ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণ ইসলামের জন্য ছিল এক তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ।

ভাষণের শুরুতেই বললেন ঃ

'প্রিয় ভাইসব! আমি যা কিছু বলি, তা গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনো। কেননা, ভবিষ্যতে এখানে তোমাদের সাথে আমি আর কখনো মিলিত না-ও হতে পারি।'

এরপর তিনি মুসলমানদের উদ্দেশে শেষ অসিয়ত ঘোষণা করলেন। তার সংক্ষিপ্ত মর্মবাণী এইরূপ ঃ

'আল্লাহয় কিতাব ও রসূলের সুন্নাতকে কঠিনভাবে আঁকড়ে থাকবে। মানুষের জান, মাল ও সম্মানের প্রতি লক্ষ রাখবে।

কারো গচ্ছিত সম্পদ আত্মসাৎ করবে না।

খুন-খারাবি করবে না এবং সুদ খাবে না।'

মহানবী ভাষণ দিতে গিয়ে একথাও বললেন যে, মুসলমানরা পরস্পরের মধ্যে শিকলের মতো শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে অবস্থান করবে। অন্য মানুষদের সাথেও সুন্দর আচরণ করবে। তিনি সাম্য ও স্বাধীনতার উপরও গুরুত্ব দিলেন। উচ্চ-নীচ ও জাত-পাতের ভেদাভেদের শৃঙ্খল ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিলেন। তিনি (সাঃ) বললেন ঃ

'লোক সকল, তোমাদের পিতা একজন মাত্র পুরুষ। সমস্ত মানুষই আদমের সন্তান এবং আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে।

শুনে রাখো, একজন আরবের উপর একজন অনারবের এবং একজন অনারবের উপর একজন আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র অবলম্বন হল খোদাভীতি (অর্থাৎ আল্লাহর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষাকারী ব্যক্তি)।

ভাষণ শেষে মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ

'হে আল্লাহ! আমি কী তোমার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি ?' এক লক্ষ কণ্ঠ হতে এক সাথে উচ্চারিত হল ঃ

'অবশ্যই, হে আল্লাহর রসূল!'

প্রিয়নবী (সাঃ) সর্বশক্তিমান আল্লাহর উদ্দেশে তিনবার বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।'

ভাষণ শেষ হওয়ার পর হযরত বিলাল (রাঃ) অতি মধুর ও উদাত্ত কণ্ঠে আযান দিলেন। মহানবী (সাঃ) একসাথে জোহর ও আসরের নামায আদায় করলেন। যে সময় তিনি শেষ ফরজ আদায় করছিলেন, ঠিক সেই সময় আল্লাহর পক্ষ হতে মঙ্গলবার্তা (ওহী) বার্তা আবতীর্ণ হল ঃ

'আজ আমি তোমার জন্য তোমার দ্বীনকে পুরো করে দিলাম এবং আমার নিয়ামত তোমার উপর পুরো করে দিলাম এবং ইসলামকে একমাত্র ধর্ম বলে মনোনীত করলাম। —আল-কুরআন, সূরা-মায়েদা।

মহানবীর (সাঃ) কণ্ঠনিসৃত এ আয়াত শুনে হযরত আবুবকর (রাঃ) কেঁদে উঠলেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, দুনিয়া থেকে মহানবীর (সাঃ) বিদায়ের ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। তারপর, যখন পরবর্তী সূরাটি অবতীর্ণ হয় তখনো হযরত আবুবকর (রাঃ) সমানে অশ্রুপাত করছিলেন ঃ

'যখন আল্লাহর সাহায্য আসতে থাকবে এবং বিজয়প্রাপ্ত হতে থাকবে তখন দেখবে লোকেরা দলে দলে আল্লাহর ধর্মে আগমন করছে; তখন আল্লাহর প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করো এবং তাঁর কাছে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করো। তিনি তো তাঁর দাসের অনুশোচনা গ্রহণকারী।' —আল-কুরআন, সূরা-নসর।

হযরত আবুবকর (রাঃ) এ সব আয়াত শ্রবণ করে সন্দেহাতীতভাবে বুঝতে পারলেন যে, মহানবী (সাঃ) যে দায়িত্ব ও কর্তব্য সমাপনের জন্য পৃথিবীতে আগমন করছিলেন। এখন সে কাজ তাঁর সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন তিনি আমাদের জন্য ক্ষণেকের অতিথি মাত্র। একথা চিন্তা করে তিনি খুবই মর্মাহত হয়ে পড়লেন; আর তাঁর দু'চোখ বেয়ে তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

হযরত আবুবকর (রাঃ) সবচেয়ে বেশি ব্যথিত ও মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন। এর কারণ ছিল। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন মহানবী (সাঃ)। যদিও প্রতিটি মুসলমানই মহানবীর জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তাঁর সামনে তাঁদের জীবনকে

তাঁরা অতি তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। সহায়সম্পদ ও সন্তানাদিরও কোনো পরোয়া করতেন না।

২

হাজ্জাতুল বিদা বা বিদায় হজ্জে পর কয়েক দিন অতিক্রান্ত হতে না হতেই মহানবী (সাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এরকম অসুস্থ তিনি আর কখনো হননি।

প্রচণ্ড জ্বরে তিনি এতটা কাবু হয়ে গেলেন যে, তাঁর চোখের ঘুম চলে গেল। গভীর রাতে মহানবী (সাঃ) শয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়লেন। ঘর থেকে বেরিয়ে মুসলমানদের কবরস্থানের দিকে চললেন। সেখানে পৌঁছে তিনি কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ

'হে কবরবাসিগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।'

মহানবী (সাঃ) তাঁদের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করলেন। তারপর ঘরে ফিরে এলেন।

রোগাক্রান্ত হওয়ার পর মহানবীর (সাঃ) সর্বপ্রথমে নিজের কবরস্থানের কথা মনে এলো। এর কারণ ছিল তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর জীবনসন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে তাই সে স্থানটি নির্দিষ্ট করা।

প্রিয়নবী (সাঃ) নিয়ম করে প্রত্যেক বিবির কাছে পর্যায়ক্রমে অবস্থান করতেন। অসুস্থতার দিনগুলোতেও এর কোনো ব্যতিক্রম হল না। পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক স্ত্রীর গৃহে দিনাতিবাহিত করতে লাগলেন। পাঁচ দিন পর্যন্ত এভাবে চলল। এরপর অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেল। তাঁর আর চলা-ফেরার শক্তি রইল না।

তিনি তাঁর সমস্ত স্ত্রীদের আহ্বান করে তাঁর অন্তিম দিনগুলোতে আয়েশার (রাঃ) ঘরে অবস্থানের জন্য অনুমতি চাইলেন। সব স্ত্রীই স্বেচ্ছায় তাতে সায় দিলেন।

দুর্বলতার কারণে চলাফেরার মতো অবস্থা ছিল না। হযরত আলি (রাঃ) ও হযরত আব্বাস (রাঃ) দু'জনে ধরে তাঁকে হযরত আয়েশার (রাঃ) গৃহে নিয়ে গেলেন। মাথার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন তাই তাঁর মাথায় একখানি পট্টি বেঁধে রাখা হয়েছিল।

মুসলমানরা বড়ই অসহায় বোধ করতে লাগলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁরা দিনাতিবাহিত করতে লাগলেন। সে সময় প্রচণ্ড কাতর অবস্থায় তিনি বিছানায় শুয়ে ছিলেন। অসুস্থতা মুহূর্মুহূ বেড়ে চলেছিল। এর পূর্বে এরকম কষ্টদায়ক ব্যাধিতে তিনি আর কখনো আক্রান্ত হননি; তাই বড়ই নিরাশ ও অসহায়বোধ করছিলেন।

হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে তাঁর একবার অল্প একটু জ্বর হয়েছিল। দু'চার দিন বেছে-গুছে চলার পরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন।

সাত বছর আগে এক ইহুদি রমণী তাঁকে (সাঃ) বিষ মেশানো মাংস খেতে দিয়েছিল। বিষের প্রভাবে তিনি ক'দিন খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে চিকিৎসাদির পর তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন।

জীবনে মাত্র এই দুবার তিনি এরকম কষ্টে পড়েছিলেন। এছাড়া তিনি আর কখনো রোগপীড়ায় কষ্ট পাননি; এর বাইরে তিনি ছিলেন পাকা-পোক্ত ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এক পূর্ণাঙ্গ মানুষ। এর বাইরে কোনো রোগপীড়া তাঁকে আর কখনোই স্পর্শ করেনি।

মহানবী (সাঃ) খুব বেশি ক্ষুধার্ত না হলে খেতেন না এবং কখনোই পেট ভরে খেতেন না।

এক সময় মিসরের রাজা উপহার স্বরূপ তাঁকে (সাঃ) মধু, দু দাসী (মারিয়া ও সীরিন) ও একজন হেকিম প্রেরণ করেন। মহানবী (সাঃ) মধু ও দাসী দুটিকে গ্রহণ করেন এবং হেকিমকে এই বলে ফেরত পাঠিয়ে দেন যে, লোকেরা ক্ষুধায় কাতর না হলে যেখানে খায় না এবং আধপেটা খেয়ে বেঁচে থাকে সেখানে রোগ তাদের কোথায় আক্রমণ করবে?'

এছাড়া তিনি সদাসর্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেন। দিনে অন্তত পাঁচবার ওজু করতেন। কাপড়-চোপড় পরিষ্কার রাখতেন। নোংরা ও অপবিত্রতাকে তিনি নিজেই ঘৃণা করতেন এবং অন্যকে পাক-পবিত্র থাকার উৎসাহ যোগাতেন এবং বলতেন ঃ

'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।'

তিনি (সাঃ) কখনোই বেকার সময় কাটানো পছন্দ করতেন না এবং অলসতাকে কখনোই প্রশয় দিতেন না। সর্বদাই নির্মল চিত্ত ও সতর্ক থাকতেন, কখনো বা উপাসনার মধ্যে সময় অতিবাহিত করতেন। কখনো বা মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণের জন্য নিজে ছোটাছুটি করতেন এবং তাদের ভালোর জন্য দিন-রাত এক করে ফেলতেন।

তিনি কখনোই ভোগ ও বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেননি; মনে কখনোই দুরাকাঙ্ক্ষাকে প্রশ্রয় দেননি। তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই ছিল আল্লাহরই অধীন। খারাপ এবং অমঙ্গলজনক যে কোন কিছু থেকে তিনি যোজন-যোজন দূরে অবস্থান করতেন।

এরকম বহু নিয়ম-কানুন ব্যক্তি জীবনে মেনে চলতেন যে কারণে শান্তি, স্থিতি ও সুস্বাস্থ্য তাঁর পায়ে এসে লুটিয়ে পড়ত।

এমন সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ মহৎ জীবনখানি এভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ায় পরিবার-পরিজনসহ সকলেই বড় অসহায় এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।

৩

প্রিয়নবীর (সাঃ) শারীরিক অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়ল। জ্বর একবার বাড়তে লাগল একবার কমতে লাগল।

যতক্ষণ পর্যন্ত চলার শক্তি ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি (সাঃ) মসজিদে গিয়ে নামাযে ইমামতি করে গেলেন। সর্বশেষ নামায ছিল মাগরিবের নামায। ইশার নামাযের সময়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'নামায হয়ে গেছে?' সাথীরা বললেন ঃ 'না কেবল আপনারই অপেক্ষায়। তিনি পাত্রে পানি ভরিয়ে নিয়ে গোসল সমাপন করলেন। উঠতে গেলেন কিন্তু পারলেন না; অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার চৈতন্য ফিরে এলো। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'নামায হয়ে গেছে?' সঙ্গীরা আবার বললেন ঃ 'আপনারই অপেক্ষা। তিনি আবার গোসল করলেন এবং উঠতে চাইলেন। এবারও অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য ফিরে এলে আবারো জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'নামাজ হয়ে গেছে?' আবারো জবাব এলো ঃ 'আপনারই অপেক্ষা।' তিনি আবারো শরীরে পানি ঢাললেন। আবার উঠতে গেলেন কিন্তু পারলেন না। আবারো অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। এবার চৈতন্য ফিরলে বললেনঃ

'আবুবকরকে নামায পড়াতে বলো।'

হযরত আয়েশা (রাঃ)ঃ 'আল্লাহর রসূল! তাঁর কণ্ঠস্বর বড়ই মৃদু ; কুরআন পড়তে গেলেও খুব বেশি পরিমাণে কাঁদতে থাকেন। লোকেরা তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে না।'

প্রিয়নবী (সাঃ) রোগ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বিরক্ত হয়ে জোরালো আওয়াজে বললেন ঃ 'আবুবকরকে বলো। তিনিই নামায পড়াবেন।'

হযরত আবুবকর (রাঃ) আদেশ পালন করলেন এবং কয়েকদিন যাবৎ নামায পড়াতে লাগলেন।

মহাপ্রয়াণের চার দিন পূর্বে রোগযন্ত্রণা থেকে তিনি কিছুটা স্বস্তি পেলেন। জোহর নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল। সাত মশক পানি দিয়ে গোসল করলেন। তারপর কাপড় পরে মাথায় পাগড়ি বেঁধে হযরত আলি ও হযরত আব্বাসের সাহায্যে মসজিদে গেলেন। নামায হচ্ছিল। হযরত আবুবকর (রাঃ) ইমামতি করছিলেন। মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন বুঝতে পেরে পিছু হটতে চাইলেন কিন্তু তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা রুখে দিয়ে নামাযে বসে গেলেন। নামাজের শেষে তিনি ছোট্ট একটা ভাষণ দিলেন ঃ 'মুসলমানগণ! আমি বুঝতে পারছি যে, তোমরা তোমাদের নবীর (সাঃ) মৃত্যুর আশঙ্কায় খুবই ভীত হয়ে উঠেছো। আমার পূর্বে যত নবী এসেছেন তাঁরা সকলেই

মৃত্যুর অমৃতসুধা গান করে জীবনের পরপারে চলে গিয়েছেন। এবার তাঁদের মতো আমাকেও চলে যেতে হবে।

শুনে নাও! যারা প্রথমে হিজরত করেছে, তাদের সাথে সর্বদাই সদ্ব্যবহার করবে। মুহাজিররাও যেন তেমন ব্যবহার করে। আর হাঁ, আনসারদের সাথেও সদ্ব্যবহার করবে। যে আনসার ভালো ব্যবহার করে তার সাথেও ভালো ব্যবহার করবে। যে খারাপ করবে তাকে ক্ষমা করে দেবে।'

তারপর তিনি বললেন ঃ

'সাধারণ মুসলমানদের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়তে থাকবে। কিন্তু আনসারদের সংখ্যা সাথে সাথে কমে যেতে থাকবে যেমন খাওয়ার সময় লবণের পরিমাণ কমতে থাকে। আমার শরীর ক্ষীয়মান। আমার পরে যে মুসলমানদের খলীফা হবে, আমি তাকে অসিয়ত করছি, সে যেন তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে।'

তারপর তিনি বললেন ঃ 'আমি সেই বস্তুই হালাল করেছি আল্লাহ যা হালাল করেছেন। আমি সেই বস্তুকেই হারাম করেছি আল্লাহ যা হারাম করেছেন।'

'মুসলমানগণ! আমি যদি কাউকে আঘাত দিয়ে থাকি, আমি হাজির, আমার পিঠ উন্মুক্ত সে প্রতিশোধ নিক। আমি যদি কথার দ্বারা কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকি, সে তা করে প্রতিশোধ নিক। আমি যদি কারো কাছ থেকে কিছু নিয়ে থাকি, সে তা নিয়ে নিক।'

এক মুসলমান দাঁড়িয়ে বলল ঃ 'আল্লাহর রসূল! আপনার কাছে আমার তিনটি দিরহাম গচ্ছিত আছে।'

তিনি তাকে তিনটি দিরহাম দিলেন। পুনরায় বললেন ঃ

'হে আল্লাহর রসূলের কন্যা ফাতিমা!

হে আল্লাহ্‌র রসূলের ফুফু সফিয়্যাহ্‌!

তোমরা আল্লাহর কাছে যাওয়ার জন্য পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করে নাও। আমি তোমাদের আল্লাহর কাছ থেকে রক্ষা করতে পারব না।

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে বায়তুল মালের সাতটি আশরফি ছিল। রোগাক্রান্ত হওয়ার পর তিনি এই ভেবে আশঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন যে, হঠাৎ যদি মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে তা তাঁর অধিকারে রয়ে যাবে। সেজন্য তিনি সেগুলোকে গরীবদের বিলিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু তাঁর রোগাক্রান্ত অবস্থায় সকলেই তাঁর দেখা-শোনার কাজে ব্যস্ত থাকায় সে কথা কারো স্মরণ থাকে নি।

মহাপ্রয়াণের একদিন পূর্বে সে কথা তাঁর স্মরণে আসতেই তিনি বললেন ঃ 'সে আশরফিগুলোর খবর কী?'

হযরত আয়েশা (রাঃ) ঃ 'আল্লাহর রসূল! তা ঘরেই আছে।'

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেগুলো চাইলে আয়েশা (রাঃ) তা এনে তাঁর হাতে দিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেগুলি হাতে নিয়ে বললেন ঃ 'মুহম্মদ যদি এগুলি তার গৃহে রেখেই প্রয়াত হয়ে যায় তাহলে তার প্রভুর কাছে কী জবাব দেবে?'

তারপর তিনি সেগুলোকে গরীব মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

কষ্ট বেড়ে চলল। জ্বর এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যেন মনে হচ্ছে তাঁর শরীর আগুনের মতো তপ্ত হয়ে উঠেছে। প্রিয় কন্যা ফাতিমা (রাঃ) প্রতিদিনই পিতার সেবায় উপস্থিত হতেন। তাঁকে দেখে মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদর-স্নেহ খুবই বেড়ে যেতো। পাশে বসিয়ে আদর করতেন, কপালে চুমু খেতেন। আজ তাঁর শারীরিক ক্ষমতা খুবই কমে গেছে। হযরত ফাতিমা (রাঃ) এলে তিনি উঠে তাঁকে আদর-যত্ন করতে পারলেন না। তিনি কাছে এলেন। তিনি স্বয়ং তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চুমু খেলেন এবং পাশে বসে পড়লেন।

জ্বর খুব বেড়ে যাওয়ায় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বার বার অচেতন হয়ে পড়ছিলেন। একটি পাত্রে ঠাণ্ডা পানি ছিল। তিনি তা তাঁর হাতে ঢেলে নিয়ে নিজের চোখে মুখে দিতে লাগলেন। খুবই কষ্ট ও অস্বস্তির মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত হচ্ছিল। এমন সময় তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হল এই বাক্যটিঃ

'ইহুদি ও ঈসায়ীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে সিজদা গৃহে পরিণত করেছে।'

সোমবার রাতে তাঁর জ্বর অকেটা কমে গেল। দেখে মনে হচ্ছিল যে, তিনি সুস্থ হয়ে উঠছেন। অস্বস্তি কেটে গিয়েছে। শরীর পূর্ণরূপে সুস্থ। যেই দেখছে তার মনে হচ্ছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একেবারেই সুস্থ। চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ক্লান্ত দেহমন যেন ঝলমলিয়ে উঠেছে।

মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গৃহ ছিল মসজিদ সংলগ্ন। প্রভাত হলে পর্দা উঠিয়ে তিনি দেখলেন তাঁর প্রিয় অনুচররা মসজিদে ফযরের নামাযের জন্য সমবেত হয়েছেন। তা দেখে তিনি খুবই আনন্দিত হয়ে উঠলেন এবং হাসতে হাসতে বললেনঃ 'আল্লাহর দুনিয়ায় এবার আল্লাহর নাম নেয়ার এবং তাঁর নবীর শিক্ষা মেনে চলার মতো একটি দল অবশেষে সৃষ্টি হয়েছে।' তাঁর সাথীরা নামাযের মধ্যেই তাঁর আগমন অনুভব করে খুবই আনন্দিত হলেন এবং ভাবলেন নামায ভেঙে দিয়ে তাঁর ইমামতিতেই নামায পড়ি। হযরত আবুবকর (রাঃ)

ইমাম ছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন যে, পিছু হটে যান, কিন্তু তিনি (রাঃ) ইঙ্গিতে নিষেধ করলেন। তারপর গৃহে প্রবেশ করে পর্দা নামিয়ে দিলেন। দুর্বলতা এত বেশি ছিল যে, পর্দা পুরো নামতে পারেনি। দুপায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে থাকার মতো শক্তি তাঁর ছিল না; কিন্তু অনুচরদের আনন্দিত দেখে তিনিও যারপরনাই আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন।

প্রতি মুহূর্তেই দুর্বলতা বেড়ে চলেছিল। মহাপ্রয়াণের ক্ষণ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাত্র ভর্তি ঠাণ্ডা পানি চাইলেন। অবিলম্বে পানি আনা হল। তিনি বার বার তাতে হাত ডুবিয়ে পানি নিয়ে সারা গায়ে দিতে লাগলেন। সাথে সাথে মুখেও দিতে লাগলেন। চাদর একবার মুখের উপর টেনে দিতে লাগলেন একবার সরিয়ে নিতে লাগলেন। সে সময় তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুখ দিয়ে অনবরত উচ্চারিত হতে লাগল ঃ

'হে আল্লাহ! তুমি মৃত্যুযন্ত্রণা সহজ করে দাও।'

প্রিয় পিতার এ দুঃসহ যন্ত্রণা দেখে কন্যা ফাতিমা (রাঃ) খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তিনি (রাঃ) কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ 'উহ! আমার আব্বার কী কষ্ট!' এ কথা শুনে তিনি বললেন ঃ 'এরপর তোমার আব্বা আর কোনো দিন কষ্ট পাবেন না।'

বিকেল বেলা শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গিয়েছিল। এরই মধ্যে তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হল ঃ 'নামায বান্দার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পাথেয়।'

তারপর উপরে হাত ওঠালেন। তিনি আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করলেন সেই মহাসত্তার প্রতি। তারপর বললেন ঃ 'এখন আর কেউ নয়। তিনিই আমার সবচেয়ে বড় সাথী।'

একথা বলতে বলতে হাত নেমে এলো। দুই আঁখি মুদে এলো। তাঁর অমর আত্মা মহান প্রভুর উদ্দেশে অনন্তে যাত্রা করল।

রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখ সোমবার। হিজরতের একাদশ বর্ষে মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহাপ্রয়াণ ঘটল। জানিসারদের চোখে অন্ধকায় ঘনিয়ে এলো আর মনের আকাশে শোকের ছায়া নেমে এলো। নিঃসন্দেহে আমরা আল্লাহরই এবং আমরা পুনরায় তাঁর কাছেই ফিরে যাবো। হে আল্লাহ! শান্তি বর্ষিত হোক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর, তাঁর সন্তানদের উপর এবং তার সমস্ত অনুচরদের উপর।

মহাপ্রয়াণের সময় তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর।

৪

মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহাপ্রয়াণ হয়েছে? যে মুসলমানই এ খবর শোনেন, তার মনের অজান্তেই সাথে সাথে এই প্রশ্ন বেরিয়ে আসে।

এটা কী করে সম্ভব? কিছুক্ষণ আগেই তো তাঁকে দেখেছিলাম। তাঁর সাথে আলাপও করেছিলাম!

এ কী বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ?

তিনি তো আল্লাহর প্রিয় বন্ধু। আল্লাহ তো তাঁকে নবী মনোনীত করেছেন। অসংখ্য লোক তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন।

এটা কী করে সম্ভব?

তিনি তো ঐশীশক্তিরই প্রকাশ। তিনি তো সারা দুনিয়াকেই নাড়া দিয়ে গিয়েছেন। এত বড় বিপ্লব (ইনকিলাব) তিনি সৃষ্টি করে গিয়েছেন যে, পৃথিবী কখনোই ভুলতে পারবে না।

এ কী করে সম্ভব?

তিনি তো মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে গিয়েছেন। তিনি তো বিপথগামী মানুষদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন।

এ কী করে সম্ভব?

তাঁর মৃত্যুর পরে তো ওহী আসা বন্ধ হয়ে যাবে, যা পূর্ববর্তী নবীদের প্রয়াণের পর বন্ধ হয়নি।

এ খবর শোনার পর হযরত উমরের (রাঃ) পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেল। তিনি ছুটতে লাগলেন হযরত আয়েশার (রাঃ) গৃহের পানে যাতে এখবরের সত্যতা যাচাই করতে পারেন। সেখানে পৌঁছে তিনি দেখলেন মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিথর পবিত্র দেহ কাপড়ে ঢাকা আছে।

হযরত উমর (রাঃ) মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে দিলেন। দেখলেন স্পন্দনহীন মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পবিত্র চেহারা। এতে সন্দেহের কী অবকাশ ছিল? মৃত্যুখবর স্বীকার করতে হল। নীরব, নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন উমর (রাঃ)। তারপর আকাশ ভেঙে পড়ার মতো কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তাঁর সমস্ত অনুভূতি যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে লাগল।

তারপর মসজিদে গেলেন। সেখানে দেখলেন লোকেরা শোকে ম্রিয়মান। কাঁদতে কাঁদতে তারা বেহাল হয়ে গেছে। কেউ প্রবোধ মানে না। কে কাকে প্রবোধ দেবে? কার অশ্রুধারা কে রোধ করবে? এ দুঃখ, এ শোক, এ তাপ কে

ভোলাবে? কে দেবে সান্ত্বনা? আজ পর্যন্ত কোনো মানুষের শোকে এরকম বেহাল অবস্থা তো আর কখনো দেখা যায়নি!

এ দুঃসংবাদ হযরত আবুবকরের (রাঃ) কানে গিয়েও পৌঁছাল। শুনতেই শিশুর মতো কেঁদে উঠলেন। তিনি অতি দ্রুত মসজিদে গিয়ে পৌঁছালেন। সেখানে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রিয়সাথীরা ভীড় করে অবস্থান করছিলেন। সকলেই শোকে মুহ্যমান কেউ করো মুখের পানে তাকাতে পারছিলেন না। তিনি কাউকে কিছু না বলে সরাসরি আয়েশার (রাঃ) গৃহে উপস্থিত হলেন। মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শরীর চাদর দিয়ে ঢাকা ছিল। মুখ থেকে চাদর সরিয়ে দিলেন। কপালে চুমু খেলেন। তারপর বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত হন। জীবনেও যেমন মরণেও তেমন আপনি ভালো থাকবেন।'

পুনরায় মসজিদে গেলেন। গিয়ে দেখলেন হযরত উমরের (রাঃ) ভাষণ চলছে। তিনি লোকেদের বোঝাচ্ছিলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) আওয়াজ দিলেনঃ

'উমর! একটু থামো। আমাকে কিছু বলতে দাও।'

তারপর তিনি মুসলমানদের মনোযোগ আকর্ষণ করে সেই বিখ্যাত ভাষণটি দিলেন। বললেন ঃ

'লোক সকল! কেউ যদি মুহম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপাসনা করে থাকেন তাহলে জেনে রাখুন, মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন। আর যদি আল্লাহর উপাসনা করে থাকেন, তাহলে জেনে রাখুন, তিনি আছেন। তিনি থাকবেন। তাঁর মৃত্যু নেই।

তারপর পবিত্র কুরআন থেকে উচ্চারণ করলেন ঃ

'এবং মুহম্মদ তো আল্লাহর রসূল ছাড়া কিছু নন। তাঁর পূর্বে বহু নবী চলে গিয়েছেন। যদি তাদের মৃত্যু হয় আল্লাহর জন্যে তাহলে তোমরা কী ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে? যদি কেউ যায় তাহলে সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এবং আল্লাহ বিশ্বাসীদের উপযুক্ত বদলা দেবেন।'

—আল্-কুরআন। সুলা-আলে-ইমরান।

এই গভীর বিশ্বাস তপ্ত আন্তরিকতাপূর্ণ ভাষণ শোনার পর মুসলমানদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেল এবং এর প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে তাঁরা সজাগ হয়ে উঠলেন। সবারই মনে হল যেন এই আয়াত এইমাত্র অবতীর্ণ হয়েছে। প্রত্যেক মুসলমান এখন এই আয়াতের প্রতি মনোনিবেশ করল।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি মুসলমানদের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কোনো সীমা পরিসীমা ছিল না। তাই এই মৃত্যুসংবাদ তাঁদের কাছে বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে তারা শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছিলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) এই আয়াত পাঠ করার পর তাদের সম্বিৎ ফিরে আসে।

হযরত উসমান (রাঃ) এ খবর শুনে এতটাই শোকস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর বলেন ঃ 'একথা বোঝা উচিত যে, আমাদের চোখের উপরের পর্দাটি সরে গিয়েছে।'

মুসলমানদের এই শোকস্তব্ধ অবস্থাকে ভেঙে দিয়েছিল হযরত আবুবকরের (রাঃ) ভাষণ। তাঁরা স্পষ্টতই অনুভব করেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যি সত্যিই ইহলোক ত্যাগ করে আল্লাহর সন্নিধানে চলে গিয়েছেন।

হযরত আবুবকর (রাঃ) ছিলেন ভদ্রতা, নম্রতা, উদারতা, ধৈর্য ও সহনশীলতার মূর্তিমান প্রতীক। বর্তমান দুরবস্থায় তিনিই ছিলেন সবার জন্য আদর্শ স্বরূপ।

হযরত আবুবকরের (রাঃ) মহানবীর (রাঃ) প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা ভালোবাসা খুব কম ছিল না। জানিসারিদের মধ্যে দায়িত্বশীলতার ক্ষেত্রে তিনি কারো চেয়ে কম ছিলেন না। প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পাঠ করেন ঃ 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমার দীনকে পুরো করে দিলাম এবং আমার নিয়ামত তোমার উপর পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে আমি মনোনীত করলাম।'

তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন এবং যখন এই সূরা অবতীর্ণ হল ঃ

'যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং বিজয়প্রাপ্ত হবে তখন তুমি দেখবে লোকেরা দলে দলে ইসলামে আগমন করছে; তখন তুমি তোমার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং মুক্তির জন্য প্রার্থনা করো। তিনিই তো সবচেয়ে বেশি অনুশোচনা গ্রহণকারী। —কুরআন, সুরা-নসর।

তখনো হযরত আবুবকর (রাঃ) অবলীলাক্রমে কেঁদে যাচ্ছিলেন এবং অনবরত অশ্রুপাত করছিলেন। কেননা, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মহানবীর জীবনের অন্তিম ক্ষণ ঘনিয়ে আসছে এবং সেই দুঃখজনক দিনটি দেখার জন্য তিনি মনে মনে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন।

এমতাবস্থায়, মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহপ্রয়াণের খবরে সর্বত্রই শোক ও কান্নার রোল পড়ে গেল। মুসলমানরা পাগলপারা হয়ে গেলেন, কিন্তু আবুবকর (রাঃ) ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতিমূর্তিরূপে মুসলমানদের সান্ত্বনা দিয়ে গেলেন।

আল্লাহর অসীম রহমতের দান পবিত্র ইসলাম মুসলমানদের জন্য এক মহা নিয়ামত। এ বড়ই আনন্দ ও খুশির কথা যে হযরত আবুবকর (রাঃ) এই দুঃসময়ে মুসলমানদের সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে রক্ষা করলেন।

প্রিয়নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পবিত্র শরীর কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। হযরত উমর (রাঃ) নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারছিলেন না। সমস্ত মুসলমান শোকে কাতর ও মূহ্যমান ছিলেন, আর হযরত আবুবকর (রাঃ) একাই তাঁদের বোঝাচ্ছিলেন যে, এটাতো আল্লাহরই ইচ্ছা। মুসলমানদের উচিত যে, ভালো-মন্দ সবকিছুর ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছাকে সানন্দে গ্রহণ করা; তাঁর সমস্ত ফায়সালাই নিজের জন্য মঙ্গল বলে মেনে নেয়া; সর্বদাই তাঁর ইচ্ছার উপর সন্তুষ্ট থাকা।

এমন সময় এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে বলল ঃ 'আবুবকর! উমর! সমস্ত আনসার একত্রিত হয়ে খলীফা নির্বাচিত করছেন। জলদি চলো। নইলে এক বিবাদ খাঁড়া হয়ে যাবে। মুসলমানরা খুনোখুনিতে লিপ্ত হয়ে পড়বে।'

হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উসমান (রাঃ) বিলম্ব না করেই দৌড়ে সেখানে পৌছে গেলেন। হযরত উবাইদাও ছিলেন। দেখেন যে, বাস্তবিকই সেখানে কিছু আনসার ও মুহাজির পরস্পরের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে লিপ্ত রয়েছে।

তাঁরা পৌছাতেই অবস্থা আয়ত্তে এলো। যুক্তি-তর্ক ও বুদ্ধি দিয়ে তাদের বোঝানো হল। অবশেষে সবাই পরামর্শ করে হযরত আবুবকরকে (বাঃ) খলীফা নির্বাচন করলেন। সব ঝগড়া থেমে গেল।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্পন্দন হীন পবিত্র দেহ আগের মতোই রাখা ছিল। পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজারা তাঁকে ঘিরে ছিলেন আর চোখের পানিতে শ্রদ্ধার্পণ করছিলেন।

খলীফা নির্বাচনের পর দাফন-কাফনের ব্যবস্থা হল। তাঁকে গোসল দিয়ে তিনটি কাপড় দিয়ে কাফন পরানো হল। তারপর মুসলমানরা সবাই তাঁকে শেষবারের মতো দেখে নয়ন জুড়াতে লাগলেন এবং সাথে সাথে দোয়া-দুরূদ পড়তে লাগলেন।

সকলের শেষ দেখার সময় উচ্চারিত হল এই কবিতার ক'টি ছত্র ঃ

'আল্লাহর নবী! হাজার দুরূদ, সালাম তোমার পরে।
খোদার করুণা শান্তির ধারা তোমার উপরে ঝরে।
সাক্ষ্য দিচ্ছি, প্রভুর বার্তা পৌঁছে দিয়েছো তুমি।
দ্বীনের জন্য যুদ্ধ করেছো, বিজয়ী হয়েছো তুমি।।

এ ছিল তাঁর হিজরতের পথে গুহার সাথী হযরত আবুবকরের কণ্ঠস্বর।

জানাজার পরে পুরুষদের, তারপর মহিলাদের তারপর শিশুদেরও শেষ দেখার সুযোগ দেয়া হল। অশ্রুসজল নেত্রে শেষবারের মতো সবাই একবার করে দেখে নিয়ে চিরতরে বিদায় দিলেন।

মহাপ্রয়াণের দু'দিন পরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কবরস্থ করা হল। তারপর কাল কিয়ামত পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করবেন ।

।।সমাপ্ত।।